অর্থনীতি কথা : শতবর্ষে

Arthaniti Katha @ Hundred Years

অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন অফ
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্ট
২০১৭

প্রকাশক:
সাধারণ সচিব
অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন অফ
ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্ট-এর পক্ষে
অর্থনীতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
৫৬এ, বি টি রোড
কলকাতা - ৭০০ ০৫০
ওয়েবসাইট: www.aacued.net

অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রক:
জ্ঞানের আলো
১এ, কালিবাড়ি লেন
কলকাতা - ৭০০ ০৫০
যোগাযোগ: ৯৮৭৪২৫৩৬৫৮

প্রকাশনা উপসমিতি:
সুদক্ষিণা গুপ্ত
অমিত দাশগুপ্ত
উত্তম ভট্টাচার্য (সম্পাদক)

প্রচ্ছদ:
অনুপম গুপ্ত

Dedicated
to
the Teachers,
associated with
the Department of Economics,
University of Calcutta.

The views expressed here are those of the individual authors. They do not necessarily reflect the views of the Alumni or the organizations with which the authors are associated.

The Editor is sincerely obliged to the President and the hon'ble members of the AACUED for giving him the opportunity and extending all necessary help to edit the present volume, on the eve of the celebration of 100 years of the Economics Department, University of Calcutta. The Editor alone is responsible for all the errors and ommissions that remain.

অর্থনীতি কথা: ২০১৭
সূচিপত্র

বিষয়: অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও অন্যান্য প্রসঙ্গে

প্রয়োজন ও স্বাধীনতা 11
তরুণ সান্যাল

দুর্নীতি: আমাদের আর কত দূর নিয়ে যাবে? 14
বিনায়ক রায়

নোট বন্দী 31
প্রবীরজিৎ সরকার

গ্রামীণ পর্যটন— পশ্চিমবঙ্গের ধারণক্ষম উন্নয়নের পথ 38
কাবেরী সরকার

বিষয়: অর্থনীতি বিভাগ: স্মৃতি ও বিস্মৃতিতে

অর্থনীতি বিভাগ— শতাব্দী পেরিয়ে 42
সুদক্ষিণা গুপ্ত

কাঁটাকল ও আমি 48
স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

কাঁটাকলের (অন্য) অর্থনীতি 53
অচিরাংশু আচার্য

কাঁটাকলের সেকাল 59
অনিশ মুখোপাধ্যায়

বিষয়: অর্থনীতি: পাঠ্য আর সিলেবাস

অর্থনীতির পঠন-পাঠন 67
বহ্নিবরণ ঘোষ

ইকনমিক্স পাঠ ও পাঠ্যবস্তু নিয়ে নানা পুরানো কথা 75
অনুপম গুপ্ত

বিষয়: আরও নানা কিছু

আমার আকাশ 99
মহানন্দা কাঞ্জিলাল

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও
ভারতবর্ষে জনসংখ্যা-অর্থনীতি চর্চা 103
মৌসুমী মান্না

"এখনো গেল না আঁধার..." 106
অনুরাধা মজুমদার গোস্বামী

বিষয়: পুনর্মিলন: সে দিন, এ দিন (সংক্ষেপিত পুনর্মুদ্রণ)

কাঁটাকলার কাঁদি 111
শুভেন্দু দাশগুপ্ত

কাঁটাকল— স্মৃতি সত্তা 113
মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

AACUED-এর জন্মকথা 114
সন্তোষ দাশগুপ্ত

Subjects: Economics, Society and Politics

The Misuse of Mathematics in
Neoclassical Economics 119
Amiya Kumar Bagchi

Dark Alleys of Development 127
Kalyan Ray

Competition Law and Corporate Control over Global Agri-Business: A Critique 143
Arup Ratan Mukhopadhyay

Inequality and Economic Growth — Dynamism of Capitalism in Oligarchic Market Structure 156
Dhiraj Kumar Bandyopadhyay

Some Challenges of Monetary Policy Formulation and Operations in India 169
Partha Pratim Mitra

The Role of Persuasion in Altering Consumer Demand for Abating Climate Change 176
Madhumati Dutta

Database of Indian Economy — Some Historical Perspectives 183
Mrinal Kumar Dasgupta

In Support of Democracy 199
Priyanthi Bagchi

Second Amlan Datta Memorial Lecture, 2016

Democracy, Dignity, and Development 204
Pranab Bardhan

শেষের কথা: মুখবন্ধের পরিবর্তে 225
উত্তম ভট্টাচার্য

সংযোজন

From The Past Records 229

Gems from The Past Publications 231

Economics Department
University of Calcutta
100 years

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে...

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিচিত্রা*, ১৩১২

We pay our rich tribute to
the Teachers
and
the Alumni of our Department
who are no more with us
on this happy occasion of
the 100 years of
Economics Department,
University of Calcutta.

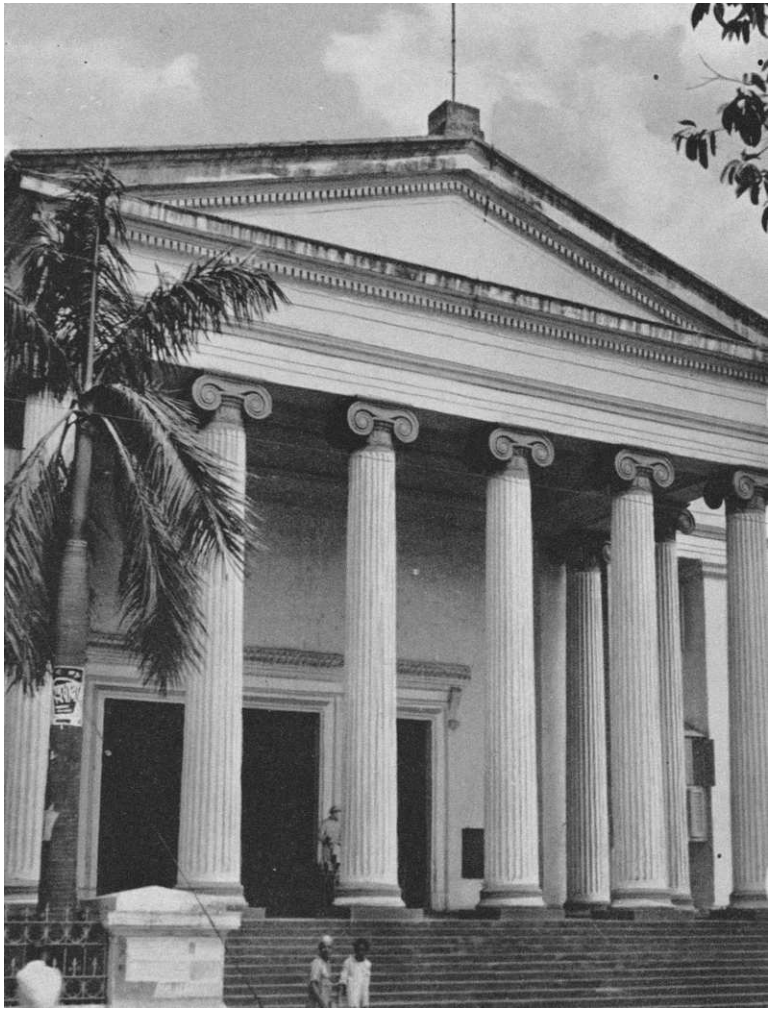

সিনেট হল

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষের করেনি শতধা; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাং ১৩০৮), *'নৈবেদ্য'* কাব্যগ্রন্থের ৭২ সংখ্যক কাব্য।

প্রয়োজন ও স্বাধীনতা

তরুণ সান্যাল

বর্তমান সমস্যাটা হয়ে উঠেছে প্রয়োজনের সঙ্গে স্বাধীনতার সমন্বয়। অর্থাৎ যেন প্রয়োজন বা নেসেসিটি-র সঙ্গে স্বাধীনতা বা ফ্রিডমের পিরামিড সম্পর্ক আছে। স্পিনোজা থেকে কান্ট হয়ে মার্কস পর্যন্ত, এই দুটি বিষয় নিয়ে ঢের বিতর্ক হয়েছে। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেমন রামযশ কলেজেও চলছে স্বাধীনতার দাবিতে প্রয়োজনকে কাজে লাগানো।

মনে রাখা উচিত প্রয়োজন ও স্বাধীনতা এক নয়। প্রয়োজনকে ভেঙে স্বাধীনতার কার্যকলাপ। যে সমাজ আমরা দেখি তার গঠনে বহু বিচিত্র স্তর। যেমন ভারতের হিন্দু সমাজে বহু স্তর আছে এবং বিরোধিতা আছে, তেমনি মুসলমানদের মধ্যেও শেখ, সৈয়দ, পাঠন, মোগলদের মত আশরাফদের বিরোধিতায় রয়েছে আতরাপ সমাজ। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী ক্ষমতা রাখবার জন্য, অন্যতর সমাজের সমৃদ্ধি ছলে বলে কৌশলে কেড়ে নিতে চায়।

এর বিরোধিতাও আছে। উচ্চ সমাজ সংবিধান গড়েছে। আইন প্রণয়ন করেছে। এইভাবে নিম্নবর্ণের অধিকার রক্ষার চেষ্টা হয়েছে। মেকলে প্রবর্তিত আইনে শাস্তি দেওয়ার ধারা উপধারা ছিল প্রয়োজনে। ইংরেজ শাসনে আইন, এই প্রয়োজনকে সাহায্য করেছে। অপর দিকে হিন্দু সমাজেও উচ্চবর্ণরা সতীদাহ রদ করা এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। ইংরেজ শাসক এই সামাজিক আন্দোলন মেনে নিয়েছে। আদতে উচ্চ সমাজ পশ্চিমের সভ্যতার ধারণার সাথে সহমত হতে সভ্যতার উপকরণগুলি এদেশে কার্যকর করতে চেয়েছেন। মেকলে সাহেবের প্রয়োজন ছিল এ দেশে নিজেদের প্রয়োজন কার্যকর করা। অন্য দিকে হিন্দু সমাজও পশ্চাৎপদ জাতিগুলির

ছাত্র: ১৯৫৪-৫৬

বিরোধিতার মধ্য দিয়ে আগ্রাসন সহ্য করেও স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ শাসক সমাজ অথবা তাদের সমর্থক দেশীয় সমাজ আপন প্রয়োজন মত আইন করেছে। প্রশাসনের 'ল অ্যান্ড অর্ডার' তৈরি করেছে। আর তার বিরোধিতায় সিধু, কানহু, তিতুমীর, রামমোহন, বিদ্যাসাগর স্বাধীনতার জন্য লড়েছেন।

আজকে তথাকথিত হিন্দুত্বকে কাজে লাগিয়ে নির্বাচনে প্রাধান্য পেতে চাইছে যে রাজনৈতিক দল, তাদের সমর্থনেও বহু ছাত্র সংযুক্ত হয়ে বিদ্যার্থী পরিষদ গড়েছে। তারা উচ্চ ধনী সমাজেও বহু ছোট বড় ঐক্য গড়ে তুলেছে— হোক না তা রামমন্দির গড়া বা কবরখানার প্রান্তরে শ্মশান সৃষ্টি করা। এগুলি সব শাসক শোষকদের প্রয়োজন মেটাবার উপায়। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রভৃতিতে প্রবেশ করে তথাকথিত জাতীয়তাবাদ তুলে ধরছে। এগুলি সমাজকে বন্দী করার জন্য, শাসকদের নেসেসিটি বা প্রয়োজন। অন্যপক্ষে এই বন্দীদশা থেকেও মুক্ত হওয়ার জন্য মানুষ লড়ছে।

ভারতে স্বাধীনতার লড়াই ছিল মুখ্যত বিদেশি পুঁজির হাত থেকে মুক্তি। তাদেরও এই লড়াইয়ে বিভিন্ন প্রয়োজন হয়েছিল। স্বাধীনতা ও প্রয়োজন তখন মিলে যায় একই ফ্রন্টে দুই ইচ্ছা কার্যকরী করায়। মহাত্মা গান্ধী, সূর্য সেন, ভগত সিং এরাও নতুন কাম্য সমাজের প্রয়োজনের সাথে স্বাধীনতার শর্ত মিলিয়েছিলেন। আন্তেনিও গ্রামশি মনে করতেন সব মানুষেরই বুদ্ধি আছে। কিন্তু সেই বুদ্ধি সচেতনভাবে বহন করে কেউ প্রয়োজনের পক্ষে লড়াই করে, কেউ বা স্বাধীনতার সপক্ষে। যারা প্রয়োজনের পক্ষে বুদ্ধি কাজে লাগায় তারা প্রথাসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী (ট্রাডিশনাল ইনটেলেকচুয়াল)। আর যারা সমাজের বন্ধন মুক্ত করে স্বাধীন সমাজ গড়তে চায় তারা জৈব বুদ্ধিজীবী (অরগ্যানিক ইনটেলেকচুয়াল)। ইটালি ও জার্মানিতে একচেটিয়া পুঁজি জাতিবৈরিতা সৃষ্টি করেছে। আবার সেখানেই উল্টো দিকে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে। এইভাবে তথাকথিত বিদ্বান সমাজ তৈরি হয় যার মধ্যে জৈব বুদ্ধিজীবীগণ বিপ্লবে শামিল হন। মুসোলিনি ও হিটলার প্রথাসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের নিকেশ করেছেন। কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্পে, জেলখানায় তৈরি হয়েছেন অজস্র জৈব বুদ্ধিজীবী। অন্য দিকে প্রথাসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি তৈরি করার জন্য রাষ্ট্র বহু ব্যয় করেছে।

আয়ান মির্দল মনে করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মান অর্থনীতি

দ্রুত বেড়ে উঠেছে কেন না হিটলার নতুন এক প্রথাসিদ্ধ বুদ্ধিজীবী তৈরি করেছিলেন যারা এই বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছেন। হিটলার চেয়েছিলেন জাতীয় সমাজ গঠনের জন্য জাতীয় প্রথাসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের বিকাশ।

আমার তো মনে হয় ভারতের হিটলার মুসোলিনিরা বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। যে কারণে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় আক্রান্ত হচ্ছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা হচ্ছে। নয়া ফ্যাসিবাদের হাত ধরে। অন্য দিকে মুক্তিব্রতী ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষকেরা লড়াই করছেন স্বাধীনতার সপক্ষে। আমার এটাই শুধু বলার কথা যে শিক্ষাব্রতীরা রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যে এই বিকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়ান।

‘কার ইঙ্গিতে আসিছে ঝড়
তাণ্ডব নাচে আজি
সব অবহেলি ধরে থাকো হাল
নতুন যুগের মাঝি
ডাকুক সমুখে গুরু গুরু বাজ
ঢাকুক সূর্য আঁধারের মাঝ
আসুক দুঃখ দাও না আসিতে
দুঃসহ সাজে সাজি।

ঘোর দুর্যোগ ঘনাবে হয়তো
ভীম দুঃসহ রাতি
করিয়ো না ভয়, হবে হবে জয়
সমুখে আশার বাতি।
বজ্রমুঠিতে ধরে থাক হাল
নহে শাশ্বত এ নিশি ভয়াল
তিমির রাত্রি ঘুচিবে
হেরিবে নবীন সূর্যভাতি।’

নতুন যুগের মাঝি

(অনুলিখিত)

দুর্নীতি: আমাদের আর কত দূর নিয়ে যাবে?

বিনায়ক রায়

বিদগ্ধ পাঠক, যদি কোনও উন্নত দেশে এইরকম একটা শিরোনাম নিয়ে লেখা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়, তবে এটা মোটামুটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এবং সমাজবিজ্ঞানী মহলে এই নিয়ে ভয়ানক না হলেও বেশ কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত বা হবে। তবে ভারতবর্ষে এই বিষয় নিয়ে যে বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা যাবে না সেটাও মোটামুটিভাবে বলা যায়। যদিও বাস, মালবাহী গাড়ি বা ট্যাক্সির বাইরের বিজ্ঞাপন বলে যে ‘মেরা ভারত মহান’। এই বাণী অবশ্যই মনে করিয়ে দেয় অর্ধশতাব্দীর আগের একটি বিখ্যাত বাংলা গানের কলি “... একি অভিশাপ নাই প্রতিকার, মিথ্যারই জয় আজ সত্যেরই নাই তাই অধিকার...” এই রকম নানা ধরনের ধর্মীয় বাণী বা ধর্মীয় উৎসবের বর্ণময় প্রাবল্যে একজন বহিরাগতের পক্ষে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এখানে দুর্নীতির অবকাশ বোধহয় খুব বেশি হতে পারে না। কার্যত কি এটা সত্যি বা বিশ্বাসযোগ্য?

আমি একজন সাধারণ মানুষ এবং আমার মত সাধারণ মানুষেরা আজ ভয়ানকভাবে অস্থিরচিত্ত ও বিচলিত বা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ভবিষ্যতের কথা ভেবে। দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘ কর্মময় জীবনের প্রায় সবটাই বিদেশে কাটানো সত্ত্বেও ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান ও চর্চা করার সুবাদে এবং কিছুটা কার্যগত কারণে বিভিন্ন সময়ে গত দুই দশকে ভারতের চিন্তাশীল, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের

ছাত্র: ১৯৫৭-৫৯

সাথে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে। একদল হল বাসের পিছনের সেই মহান বাণীর সমর্থক। এদের মতে 'বোতলের অধিকাংশই পূর্ণ এবং বাকিটা অদূর ভবিষ্যতে পূর্ণ হবে', আর একদলের মত হল এর বিপরীত অর্থাৎ 'বোতল প্রায় ফাঁকা এবং বাকিটা ফাঁকা হতেও আর বেশি দেরি নেই।'

এই রকম একটা বিস্ফোরক বিষয়ে দুটি বিপরীতধর্মী মতামত থাকাটাই স্বাভাবিক। যেহেতু বাইরে থেকে প্রকৃত অবস্থাটা জানার চেষ্টা করছি, আমার মনে হয় আপেক্ষিকভাবে 'আমরা কোথায়' সেই মূল্যায়নটা অনেকটা নিরপেক্ষভাবে করতে সক্ষম হবে। আমার মূল্যায়নের সাথে হয়ত অনেক পাঠকই বিশেষভাবে না হলেও, কিছুটা অন্তত অসন্তুষ্ট হবেন, তাদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আর যারা আমার মতের সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির মিল খুঁজে পাবেন তাদের কাছে আবেদন 'আর দেরি নয়...' এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যে সময়টুকু হাতে আছে, তার মধ্যেই যেন তারা কিছু একটা করতে সচেষ্ট হন। কারণ, তা না হলে ভবিষ্যতের দুঃসময় অকল্পনীয়। বিশ্বায়নের যুগে শুধু অর্থনীতির বিশ্বায়ন হবে, আর অন্য কোনও কিছুর বিশ্বায়ন হবে না সেটা ভাবা বাতুলতা মাত্র।

দুর্নীতির সংজ্ঞা নিয়ে বিভিন্ন দেশের মত পার্থক্য রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। অনেকেরই ধারণা যে বিশ্বে ও ভারতবর্ষে দুর্নীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট হল, এটা একটা আধুনিক ব্যাধি। বাস্তবে এটা সত্য নয়, দুর্নীতি চলে আসছে আদিকাল থেকে, তবে সময়ের আবর্তনে তার রূপ পালটেছে। সে দিক থেকে দুর্নীতি অন্তহীন। দুর্নীতির আর একটি বিশেষ দিক হল তার জন্ম বহু যুগ আগে, ভারতের বহু পৌরাণিক কাহিনীতেই এর বিভিন্ন রূপের দেখা পাওয়া যায়। এর মৃত্যু নেই, ঠিক যেন অসুরের রক্তবীজ। একে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে এর রূপ পাল্টায়। একে পরিপূর্ণভাবে দমন করতে না পারলেও একটা সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা সম্ভব যাতে এই ব্যাধি সমাজের সামগ্রিক ক্ষতি করতে না পারে বা বলগাহীনভাবে এগিয়ে যেতে না পারে। এর প্রাচীনত্ব এবং চিরস্থায়িত্বর উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়।

সময়ের আবর্তনে দুর্নীতির রূপ পালটেছে, পরিধি বেড়েছে ও সুযোগের বিস্তার ঘটেছে। প্রাচীনকালে রাজারা যদিও দুর্নীতির আশ্রয় নিতেন এবং নিজেদের স্বার্থের জন্য অনেক সময়ই এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, সেটা

মূলত অবিসংবাদিত রাজক্ষমতা ও প্রতাপের বহিঃপ্রকাশ ছিল। পরবর্তীকালে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহিঃপ্রকাশ হল দুর্নীতির প্রাবল্যে। পলাশী যুদ্ধ থেকে মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি, উমিচাঁদ-রাজবল্লভ-জগৎ শেঠদের ব্যবসার বিস্তার প্রভৃতি বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের কলঙ্কিত অধ্যায়। এই সবের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভারত লুণ্ঠন। ইংরেজ লেখকদের বয়ানে "England's unbounded prosperity owes its origin to her connection with India,... from the middle of the eighteenth century to the present time,'... 'since the world began, no investment has yielded the profit reaped from the Indian plunder."[২] আর এক ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী লিখেছেন, "what was the extent of the wealth thus wrung from the East India? No one has been able to reckon adequately... Estimates... vary from £500,000,000 to nearly £1,000,000,000. Probably between Plassey and Waterloo the last-mentioned sum was transferred from Indian hoards to English banks."[৩] অর্থনৈতিক লুণ্ঠন ছাড়াও আধুনিক ভারতের সাম্রাজ্যবাদী দুর্নীতির অন্য এক উদাহরণ হল প্রত্যক্ষভাবে সাম্প্রদায়িকতায় উস্কানি আর অন্তিম ফল ভারত বিভাগ। ভারত ভাগের সময় শ্রীহট্ট জেলাতে যে গণভোটের ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ভোটে চা বাগানের শ্রমিকদের অংশগ্রহণ করতে না দেওয়াটাকেও রাজনৈতিক দুর্নীতির সংজ্ঞায় ফেলা যায়[৪]।

রাজনৈতিক দুর্নীতির জন্ম ও প্রসারের মধ্যে ধর্মীয় সংগঠন এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যোগাযোগ লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আফ্রিকান নেতা জোমো কেনিয়াট্টা থেকে শুরু করে বিশপ টুটুদের বক্তব্য এই ব্যাপারে ভীষণ পরিষ্কার। ওঁরা স্পষ্টতই বলেছেন (অবশ্যই নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে) যে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা আমাদের হাতে বাইবেল ধরিয়ে দিয়ে বললেন যে এটা মন দিয়ে পড়, কিন্তু যখন পড়া শেষ হল তখন দেখলাম যে আমাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে[৫]।

অতি সম্প্রতি আশির দশকে পোল্যান্ডে সরকার বিরোধী আন্দোলনে পোপ দ্বিতীয় পলের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় যে বিদেশি কোনও এক রাষ্ট্রীয় সন্দেহজনক সংস্থার মাধ্যমে এই আন্দোলনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল। এটাকে স্বচ্ছন্দে রাজনৈতিক দুর্নীতি বলা যেতে পারে, যদিও ঠাণ্ডা যুদ্ধের (cold war) পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই এর মধ্যে কোনও দোষ খুঁজে পাবেন

না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে প্রত্যক্ষভাবে হাত গুটিয়ে নিলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন অনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্বতন উপনিবেশগুলিতে তাদের ক্ষমতা বজায় রেখেছে। এশিয়াতে সুহার্ত ও মারকোস, আফ্রিকাতে মোবটুর মত নেতাদের উত্থানের পিছনে বা দক্ষিণ আমেরিকাতে পাপা ডক প্রভৃতির নাম কিংবদন্তীর মতই। এইসব নেতাদের উত্থান ও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় টিকে থাকার পিছনে আধুনিককালের সাম্রাজ্যবাদীদের মদত, সমর্থন ও সাহায্য ছিল, অন্তত ইতিহাস তাই বলে। আফ্রিকার মোবটু সম্বন্ধে এক ব্রিটিশ সাংবাদিক বলেছেন, "Nothing you know about Mobutu's venal reign... the long cooperation with the CIA, the assassination and the crushing of political life, prepare you for the interviews and achieve footage in Thierry Michel's film..."[৬]

বিশ্বময় দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান প্রাবল্যের ফলে জাতিসংঘ (ইউএনও) এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলি [যেমন বিশ্ব ব্যাঙ্ক (ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক) আন্তর্জাতিক অর্থ সংগঠন (আইএমএফ)] ক্রমশ শঙ্কিত হয়ে ওঠে। উন্নয়নের স্বার্থে এরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সাংগঠনিকভাবে জনমত তৈরি করার জন্য প্রশাসনিক উদ্যোগ নিতে সচেষ্ট হয়েছে।

জাতিসংঘ দুর্নীতির ব্যাপারে উদ্যোগ নেয় ১৯৮৯ সালে। নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় এক আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করে, যেখানে উন্নতিশীল দেশগুলির উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিরা যোগদান করেছিলেন। এরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলস্বরূপ দুর্নীতি যে একটা ভয়ানক ব্যাধি এবং তার প্রতিফলন যে সামগ্রিকভাবে সুশাসন ব্যবস্থার পক্ষে এক ভীষণ কলঙ্ক সেটা বিশ্বজনমত ক্রমশ উপলব্ধি করতে শুরু করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এই বিষয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এর পর লক্ষ্য করা গেছে[৭]। অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠন যেমন Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), Council of Europe, The European Union (EU), Organisation of American States (OAS) ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা যথা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করে সাফল্য লাভ করে ও জনমত জাগ্রত করতে সক্ষম হয়। জাতিসংঘ অনুমান করে যে দুর্নীতির পরিধি ভীষণভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। জাতিসংঘের গবেষণাকারীরা

মনে করেন যে বিশ্বে এমন কিছু দেশ আছে যাদের রাষ্ট্রপ্রধানদের আনুমানিক ৫০ লক্ষ ডলার দিয়ে কেনা যায়[৮]। ভারতের দুর্নীতি সম্বন্ধে যেসব বড় বড় অভিযোগ উঠেছে বা উঠছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপরিউক্ত অনুমান যথার্থ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

দুর্নীতির কোনও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞাও নেই। অভিধানের ভাষায় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা যদি অসদুপায়ে ও বেআইনিভাবে তাদের ক্ষমতা ব্যবহার করে সেই কাজকেই দুর্নীতিমুক্ত আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের মতে, যখন জনসাধারণ দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য, তখনই সেই কাজকে দুর্নীতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে: "abuse of public power for private gain"[৯]। এই মূল তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ইউরোপীয় দেশগুলির মন্ত্রীরা মাল্টাতে (Malta) ১৯৯৪ সালে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে দুর্নীতির যে সংজ্ঞা দেয় তা অনেকটাই বাস্তবসম্মত। সংক্ষেপে "... bribery and any other behaviour in relation to persons entrusted with responsibilities in the public or private sector which violates their duties that follow from their status as a public official, private employee, independent agent or other relationship of that kind and is aimed at obtaining undue advantages of any kind for themselves or others." এক কথায় দায়বদ্ধতার অভাব ও ক্ষমতার অপব্যবহারই নির্ণয় করে দুর্নীতির সংজ্ঞা। তবে এই সংজ্ঞা প্রচলিত রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে যে বৃহত্তর দুর্নীতির বীজ রয়েছে বা এর প্রকোপ বাড়িয়ে দিয়েছে সেটাকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়নি। অনেকেরই ধারণা এই জাতীয় দুর্নীতির গর্ভগৃহ রয়েছে 'একনায়কতান্ত্রিক' শাসন ব্যবস্থার দেশগুলিতে। এই ধারণা অনেকাংশে সত্য হলেও আধুনিককালে দেয়া যায় যে 'সৃষ্টিশীল চিন্তা'-কে (যাকে ইংরিজিতে বলা হয় 'ক্রিয়েটিভ থিংকিং') প্রয়োগ করে অনেক গণতান্ত্রিক দেশের নেতারা বা রাজনৈতিক দলগুলি আইনের অপপ্রয়োগ করে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে এবং অধিকার বাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। ভারতবর্ষেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, একজন সামান্য করণিকের দুর্নীতি যদিও সমর্থনযোগ্য নয় তবুও তা সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে যতটা ক্ষতিকারক তার চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক সমাজের নেতৃস্থানীয় বা উচ্চপদাধিকারীর দুর্নীতি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে দুর্নীতি কেন হয়? এর পিছনে অনেক কারণ আছে। মোটামুটিভাবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণেই বিভিন্ন রূপে দুর্নীতির জন্ম ও বিকাশে সাহায্য করে। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হল— অত্যধিক নিয়মের নিগড় ও আইনগত বাধানিষেধ। এর ফলে সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক নেতাদের সহায়তায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও সংগঠন অযৌক্তিক সুবিধা পেয়ে যায়। নেতাদের আদেশ পালনকারী অধিকর্তারা বিনিময়ে নিজেদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় করে নেয় যা অনেকাংশেই আইন বহির্ভূত।

আইনি বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে স্বচ্ছতার অভাব।

আইনি, প্রশাসনিক বা সামাজিক ও প্রচলিত দায়বদ্ধতার বাইরে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং অধস্তন কর্মীদের কাজের উপর যথেষ্ট নজর না দেওয়া, এর পিছনে অধিকাংশেই উচ্চপদস্থ কর্তৃপক্ষের বেআইনি স্বার্থের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযোগ বিদ্যমান।

প্রশাসনিক কর্মীদের সামান্য আয় ও পদোন্নতির সম্ভাবনা না থাকা।

চিহ্নিত দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক-সরকারি ও বেসরকারি কর্মী আইনি বন্ধনের বাইরে থাকলে সৎ কর্মীদের মনোবল ভেঙে পড়ে। সর্বজনস্বীকৃত সৎ নেতা ও কর্মীর অনুপস্থিতি অন্যায়কারী দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত উন্নতির পথ দ্রুত প্রশস্ত করে। অপর দিকে দুর্নীতির বিস্তার লাভের প্রধান কারণগুলি হল: উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা ও দুর্নীতির দমনের সাংগঠনিক ব্যবস্থার অভাব; অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা ও সুবিন্যস্ত সংগঠন থাকা সত্ত্বেও প্রয়োগ কর্তাদের ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ না করা; প্রতিষ্ঠিত আইনের বা সাংগঠনিক ব্যবস্থার যথার্থ প্রয়োগের অভাবে ব্যক্তিগত বা সাংগঠনিক দায়বদ্ধতার ক্রমশ অবলুপ্তি। এইসব কারণের সামগ্রিক পরিণতিতে অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে, ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব, প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ও ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্ব বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। এর ফলে ন্যায়নীতির অবক্ষয় ত্বরান্বিত হয় ও অন্য দিকে ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বিস্তার ঘটে।

উপরিউক্ত সংজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় বর্তমানে ভারতবর্ষে দুর্নীতি সামাজিক কর্কট রোগের রূপ ধারণ করেছে। সবচেয়ে বড় কথা হল দুর্নীতি আজ আর সামাজিক ক্ষেত্রে নয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যেও এর বিস্তার ঘটেছে। এ ব্যাপারে কয়েকটি উদাহরণ হল: ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামী

শ্রীপ্রকাশকে যখন চেন্নাইয়ের সাধারণ লোক প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করে স্বাধীনতা সংগ্রামের তহবিলে রাখার জন্য দেয়, তিনি সেই অর্থ ব্যক্তিগত তহবিলে রাখেন। ফলে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। জনরোষ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বশ্রী নেহরু, প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নিয়ে কংগ্রেস সংগঠন এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। তবে তাঁরা শ্রীপ্রকাশের কাজের কোনও অন্যায় খুঁজে না পেলেও জনসাধারণ এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি। এ ব্যাপারে দৈনিক 'দ্য হিন্দু' পত্রিকায় নানারকম প্রশ্ন তোলা হয়। অবস্থা ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মহাত্মা গান্ধী (যিনি জনসাধারণের অনুভব খুব ভাল উপলব্ধি করতে পারতেন) শ্রীপ্রকাশকে ওই টাকা দলীয় ভাণ্ডারে জমা দিতে বাধ্য করেন।

স্বাধীনোত্তর কালে পঞ্চাশের দশকে শ্রীমালব্য ও শ্রীকৃষ্ণমাচারী প্রমুখ মন্ত্রীদ্বয়ের কাজ সম্পর্কে বলা হয় যে এরা যথাযথ সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও সরকার প্রথমে কোনও তদন্ত করতে চায়নি যদিও শ্রীকৃষ্ণমাচারী নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীও তদন্তকারী কমিশনের রায় মেনে নিতে পারেননি, যদিও কমিশনের সভাপতির আইনগত দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে দেশের কোনও মহলেই কোনও সন্দেহ ছিল না। এই জাতীয় ঘটনা জনসাধারণের মধ্যে ভুল সংকেতই পাঠায়।

পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে রাজনৈতিক কারণে অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানের অপব্যাখ্যা করা হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যাকে 'রাজনৈতিক' দুর্নীতি বলে মনে করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই যে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে বর্তমান তামিলনাড়ু প্রদেশে কংগ্রেস দল কর্তৃক রাজ্য আইনসভার উচ্চকক্ষে নেতা রাজাগোপালচারীকে নেতা হিসাবে নির্বাচন করা এবং তা করা হয়েছিল সরকার গঠনের অল্প কয়েক দিন আগে। মহামান্য হাইকোর্টে এর বিরুদ্ধে আবেদন করার পর আদালত প্রথাগত কারণ দেখিয়ে এই আবেদনের বিচার করতে অসম্মত হয়। আদালতের বিবেচনা সঠিক থাকলেও শুরুতেই সংবিধানের রাজনৈতিক অপপ্রয়োগ বা অপব্যাখ্যা শুরু হয়েছিল। সংবিধানের সবচেয়ে বেশি অপপ্রয়োগ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রকৃত সত্যকে ও সংবিধানের ধারার মূল লক্ষ্যকে অস্বীকার করে অনেক সময়ই নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োগ। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল ১৯৫৯ সালে কেরলে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকারকে পদচ্যুত করে

রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রবর্তন। মজার কথা হল এই যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রয়োগের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করলেও কেন্দ্রে অবস্থিত সরকারের রাজনৈতিক দলের সভাপতি ২৫ জুলাই ১৯৫৯ সালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন ও কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসনের জোরালো দাবি করেন। সেখানে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হয়। একে রাজনৈতিক দুর্নীতি হিসাবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এরকমভাবে সংবিধানের বিভিন্ন ধারার অপপ্রয়োগ বিশেষ রাজনৈতিক দল দ্বারা প্রায়শই হয়েছে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট রেখক এবং সাংবিধানিক গবেষণাকারীরা বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করেছেন।[১০]

সাম্প্রতিক কালে দুর্নীতির উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যায়। উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে দুর্নীতির ব্যাপারে এক গবেষক তথ্য সংগ্রহ করে দেখতে পান বিহারের কোশী নদীর প্রকল্পের (১৯৭৯ সালে) দায়িত্বে থাকা সংগঠনকে প্রকল্পের মোট খরচের ৪০ শতাংশ প্রকল্পের পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীদের দিতে হয়।[১১]

আর এক গবেষক তথ্য দিয়ে দেখান যে দক্ষিণ ভারতের এক রাজ্যে সেচ বিভাগে বিশেষ বিশেষ জায়গায় বদলির জন্য নির্দিষ্ট অনুদান দিতে হয়। ওই গবেষক আরও প্রমাণ পান যে সরকারের সমস্ত বিভাগের মধ্যে এক 'আর্কাইভ' বিভাগেই বদলির জন্য কোনও অনুদান দিতে হয় না।[১২]

অতি আধুনিক কালের দুর্নীতিগুলির মধ্যে বোফর্স কামান বা সাবমেরিন কলঙ্ক, সার কেলেঙ্কারি ইত্যাদি উল্লেখনীয়। প্রশাসনের সর্বস্তরের দুর্নীতি এতটাই প্রবল যে বিভিন্ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলির প্রতিও জনগণের আস্থা আর নেই বললেই চলে। সম্প্রতি পাঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সভাপতি দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার হয় ও তার কাছ থেকে অসমঞ্জস এবং প্রচুর আয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে সব দেশেই সংগঠনের প্রতি আস্থা না থাকলেও সর্বোচ্চ আদালত বা বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের মোটামুটি আস্থা থাকে। এর অন্যতম কারণ হল আদালতের বিচারকেরা সব সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকলেও, জনসাধারণের মনে তাদের উজ্জ্বল নিষ্কলঙ্ক ভাবমূর্তি থাকে। তবে গত কয়েক দশকে এই ভাবমূর্তি ম্লান হয়ে এসেছে। হাইকোর্টের এক প্রধান বিচারপতি ভারতীয় পার্লামেন্টের ইমপিচ্‌মেন্টের শুনানীর সময় যেভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন অনেকের মতে আমাদের মত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাতে তাতে যথেষ্ট শঙ্কিত হওয়ার কারণ রয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা বিভিন্ন অভিযোগের

দায়ে পদত্যাগ করেছিলেন। অতি সম্প্রতি কর্ণাটকের সর্বোচ্চ আদালতের (হাই কোর্ট) প্রধান বিচারপতি নারীঘটিত কেলেঙ্কারির সাথে বিচার বিভাগীয় উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। অপর একটি ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পাটনা হাইকোর্টে মামলার রায় যাতে অনুকূলে যায় সেই জন্য নথিপত্রের রদলবদলও করা হয়েছে। এর সাথে আইনজীবী ছাড়াও আরও অনেকেই যুক্ত আছেন বলে সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে। অনেকের অনুমান এরকম হাজার ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৭২টি ঘটনা শনাক্ত করা গেছে। বিচার ব্যবস্থার মধ্যে দুর্নীতির কথা সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি কৃপাল First South Asian Regional Judicial Colloquium on "Access to justice"-এ এক ভাষণে স্বীকার করেছেন।[১৩]

এছাড়া আদালতের বিচারপতিদের উপর সমাজের উচ্চ প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চাপ তো আছেই। তবে এই চাপ বিচারপতিরা সহ্য করতে সক্ষম হতেও পারে আবার নাও পারেন। বিখ্যাত 'জৈন হাওলা কেস'-এর সময় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আদালতে সর্বসমক্ষে বলেছেন "All types of things began happening to me and the same things are happening to my brother Judges. We are getting all types of calls with some persons trying to reach us and influence us." তিনি আরও বলেন "I am under too much pressure on Hawla."[১৪]।

ভারতে দুর্নীতি বন্ধ করার প্রচেষ্টা যে একেবারেই হয়নি তা নয়। এ ব্যাপারে দুর্নীতি নিরোধ অধিকার (ভিজিল্যান্স কমিশন) গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্তরে। উচ্চতম আদালতের নির্দেশে অনুসন্ধানকারী বিভাগগুলির ক্ষমতাও কিছুটা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু এইসব প্রচেষ্টা এক কথায় 'সাগরে জলবিন্দু'। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এনজিও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির প্রকোপ নিয়ে গবেষণা করে। এই গবেষণায় দেখা গেছে ভারতের স্থান দুর্নীতিগ্রস্ত প্রথম কয়েকটি দেশের মধ্যেই রয়েছে এবং সময়ের সাথে এই স্থানের খুব একটা পরিবর্তনও হয়নি। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সমীক্ষায় মূলত আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্নীতি কত দূর ছড়িয়ে পড়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির অবস্থান (যেমন— বাসে কম পয়সা দিয়ে দীর্ঘ পথ যাওয়া, ঘুষ না দিলে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আইনি প্রাপ্য না মেলা

প্রভৃতি প্রতিচ্ছবি) তুলে ধরা হয়নি।

প্রধানত ভারতে দুর্নীতি রোধের জন্য কোনও সামগ্রিক পরিকল্পনা যেমন নেওয়া হয়নি তেমনি অন্য দিকে জাতীয় নেতৃত্বের চিন্তাধারার মধ্যে এই বোধের অভাব দেখা যায়। দুর্নীতি যেখানে সর্বগ্রাসী সেখানে সামগ্রিক পরিকল্পনা না নিলে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য প্রাক্তন এক অধিকর্তা বলেছিলেন যে দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসারদের ছবি সহ বিস্তৃত বিবরণ ইন্টারনেটে প্রকাশ করা হবে। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয় জনজীবনে Penetration of Computer Technology অতি সামান্য, এই পরিপ্রেক্ষিতে এই নীতি কতটা কার্যকরী হবে, স্বভাবতই তাতে সন্দেহ থেকে যাচ্ছে। আবার সরকারি কর্মচারীরা দুর্নীতির মধুভাণ্ডের এক সামান্য উপভোক্তা মাত্র, আসল চাবিকাঠি রয়েছে রাজনৈতিক নেতা ও দলের পরিচালকদের হাতে। তবুও যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যায় যে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের শাস্তি দিলেই দুর্নীতি দূর করা সম্ভব হবে সেক্ষেত্রে প্রথমে সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। আবার উচ্চপদস্থ কর্মচারী যারা দুর্নীতিগ্রস্ত হন তারা যে শুধু শিক্ষিতই হন তা নয় তারা সমস্ত দিক ভাল করে আইন বিবেচনা করেই না দুর্নীতির আশ্রয় নেন। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করার সুযোগও পাওয়া যায় না। এর উপর যদি নিয়োগকর্তার আগাম অনুমতি নিতে হয়, তা হলে এটা প্রায় নিশ্চিত যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে।

দুর্নীতি দমন কঠিন, তাই বলে কোনও সুস্থ সমাজই দীর্ঘকাল চুপ করে থাকতে পারে না। অনেকে মনে করেন যে 'দুর্নীতি' সমাজের ও দেশীয় অর্থনীতির বিভিন্ন অঙ্গে বিদ্যমান যেন এই কথা মেনে নিলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যদি ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী যুগ বর্তমানে জাপানের অবস্থা বা প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পাপুয়া নিউগিনির অর্থনৈতিক অবস্থা লক্ষ্য করেন তা হলে বুঝতে পারবেন যে দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও নিরাপত্তা কোনওটাই সম্ভব নয়।

দুর্নীতি দূর করার প্রথম পদক্ষেপ হল সার্বিক শিক্ষার বিস্তার ও জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ বজায় রাখা। এই দুই ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতের স্থান খুবই নিচে। বর্তমান ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিতের সূচক হল (১৫+ বছর) ৪৩.৫ শতাংশ ও প্রাপ্তবয়স্ক অশিক্ষিত নারীর সংখ্যা শতকরা ৫৫.৫ শতাংশ

[এই সংখ্যা সাহারার দক্ষিণে (সাব-সাহারান) আফ্রিকান দেশগুলির থেকে বেশি, সেখানে এই সূচক ৪৭.৪ শতাংশ]। সর্বোপরি ভারতের ৩৫ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে জীবন যাপন করলেও আন্তর্জাতিক সূচক অনুসারে শতকরা ৪৪.২ শতাংশ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে।[১৫]

এ ব্যাপারে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে প্রয়োজন ব্যবসা-বাণিজ্য নীতির সরলীকরণ, জনগণের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা, শাসন ব্যবস্থার সরলীকরণ, আইনরক্ষাকারী সংগঠনগুলির আধুনিকীকরণ ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা স্থাপন। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে চারটি জিনিসের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

প্রথমত দুর্নীতি রোধ করার জন্য যে সংগঠনের দায়িত্ব থাকবে সেটি হতে হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সংগঠন তার কার্যাবলির জন্য একমাত্র জাতীয় পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে এবং সংগঠনের প্রধানকেই সংগঠনের কাজের জন্য দায়ী থাকতে হবে। সংগঠনের প্রধান লক্ষ্য হবে সমগ্র সমাজের আস্থা অর্জন। জনসাধারণ হবে সংগঠনের রক্ষক-প্রহরী ও প্রচারক।

দ্বিতীয়ত প্রত্যেক সরকারকেই এর খরচা চালাবার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করতে হবে এবং সেই বাজেট যাতে চলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

তৃতীয়ত এই সংগঠনের দায়িত্বে থাকা সব ব্যক্তির অতীত ও বর্তমান কর্মজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে নিয়োগ করতে হবে। দুটি কারণে এর প্রয়োজন আছে—

১) যদি নিযুক্ত ব্যক্তি কলঙ্কযুক্ত হন তা হলে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এই সুযোগ পুরোপুরিভাবে নেবে।

২) পদাধিকারী ব্যক্তিরা সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য যাতে হয় তার জন্য তাদের মধ্যে থাকবে নিষ্ঠা ও সততা, এটি সংগঠনের ভাবমূর্তির পক্ষেও গুরুত্বপূর্ণ। আমার জানা একটি বিদেশি সংগঠনে নিযুক্ত মধ্য থেকে উচ্চ স্তরের সব ব্যক্তিরই নিয়োগের আগে ইন্টারপোলের মাধ্যমে তাদের সার্বিক চরিত্রের ছাড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।

চতুর্থত সংগঠনের সার্বিক ক্ষমতা থাকবে, যার ফলে কোথায়, কিভাবে দুর্নীতি দমন করা জন্য অনুসন্ধান চালাতে হবে বা কাকে আইনে অভিযুক্ত করা হবে এ ব্যাপারে সংগঠনের পরিচালক পর্ষদের মত হবে চূড়ান্ত এবং এই সিদ্ধান্তের জন্য তারাই দায়ী থাকবেন।

সর্বোপরি বিভিন্ন দেশের দুর্নীতি দমন বিষয়ের অভিজ্ঞতা ও তাদের

সফলতাকে সামনে রেখে ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি ও কর্মপদ্ধতি নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা প্রবাসী এক চীন বিশেষজ্ঞের 'গবেষিত' উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ "Mao, no doubt, was a Marxist believer, but he formed his radically revolutionary ideology within the Chinese traditional thinking on power, authority, the ruling and the ruled, and the role of law."[১৬]।

পরিশিষ্ট

সাম্প্রতিককালে দুর্নীতি দমনে ও প্রতিরোধে অনেক দেশই বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে, সেই দেশগুলির মধ্যে হংকং, তানজানিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কুইনসল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলসের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

হংকং: এই দেশের অর্থনৈতিক সাফল্য প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সকলের কাছেই এক বিস্ময়। কিন্তু মূলত ষাটের দশক থেকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ করে নগরপাল বিভাগের (পুলিশ ফোর্স) দুর্নীতির প্রাবল্য সর্বজনবিদিত। ১৯৭৪ সালে কার্যকরী রাষ্ট্রপ্রধান (গভর্নর জেনেরাল) দুর্নীতি দমনের জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করেন, (ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন এগেনস্ট কোরাপশন, আইসিএসি) এই সংগঠন একমাত্র রাষ্ট্র প্রধানের কাছে দায়বদ্ধ ছিল। এই সংগঠন প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও (বিশেষ করে নগরপাল বিভাগের পক্ষ থেকে) সফলতা পেয়েছিল তিনটি কারণের জন্য। সেগুলি হল—

১) সংগঠনের প্রধান যিনি হয়েছিলেন তার সততা ও নির্ভীকতা সম্বন্ধে আবালবৃদ্ধবণিতার স্বীকৃতি।

২) প্রথম থেকেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের দুর্নীতির কার্যকলাপের অনুসন্ধান করে অভিযুক্তদের বেআইনি দুর্নীতিমূলক কাজকর্মে যুক্ত থাকার সাক্ষ্য আদালতে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

৩) এই সংগঠনকে রাষ্ট্রপ্রধান সব দিক থেকে সাহায্য করেছিলেন।[১৭]

আইসিএসি-এর সফলতার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হল যে ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৪ সালের বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে হংকং-এর জনসাধারণের বর্তমান বিশ্বাস যে দুর্নীতির অস্তিত্ব অকিঞ্চিৎকর বা প্রায় নেই বললেই চলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে দুর্নীতি রোধের যে সামান্য চেষ্টা হয়েছে, তা

মোটামুটিভাবে ব্যর্থ এই কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে বললেই চলে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের রাজনীতিক, রাজনৈতিক সংগঠন, পুলিশ বাহিনী, সরকারি শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থা আজ সর্বজনস্বীকৃত ১৯৯৭ সালে এক সমীক্ষায় তা প্রমাণ হয়ে গেছে।[১৮]

তানজানিয়া: পৃথিবীর গরীব দেশগুলির মধ্যে অন্যতম এই দেশের দুর্নীতি দমনে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ অনেকের কাছেই আশ্চর্যজনক। এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রপতি Mkapa-এর অবদান। তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত হয়েই নিজের ও নিজের স্ত্রীর সমস্ত 'আর্থিক' ও অন্যান্য সম্পত্তির পরিমাণ ও মূল্য জনগণের কাছে ঘোষণা করেন। তিনি wariabs commission নামে একটি দুর্নীতি অনুসন্ধানকারী কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন রাষ্ট্রপতির হাতে একটি 'বিস্ফোরক' রিপোর্ট তুলে দেয়। এতে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও সংগঠনকে এবং রাজনৈতিক নেতাদের রাষ্ট্রের সামগ্রিক অবস্থার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হয়। তিনি (রাষ্ট্রপতি) এই রিপোর্ট সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে জনসমক্ষে প্রকাশ করে দেন। তিনি নিজে সমালোচনার সম্মুখীন হলেও পিছিয়ে আসেননি, বরং তার মন্ত্রীদের তিনি নির্দেশ দেন যে মন্ত্রীরা যেন এমনভাবে কাজ করেন যেন তাদের প্রতি জনসাধারণের আস্থা অটুট থাকে।[১৯] মূল কথা হল তিনি তাঁর এই অভিযানে দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও সংগঠন ছাড়া সমাজের সর্ব স্তরের সংগঠন ও মানুষের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর অধীনস্ত কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে স্বচ্ছভাবে কাজ করলেই চলবে না, তার সাথে জনসাধারণের আস্থাও অর্জন করতে হবে।[২০] ভারতের সেই প্রচলিত বাণী যার সার্থক প্রয়োগ হয়েছে বলা হলে, তা হল "আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও"। কুইনসল্যান্ড ও নিউ সাউথ ওয়েলস: অস্ট্রেলিয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র। এর অঙ্গরাজ্যগুলি কতগুলি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় অন্য সব ব্যাপারে স্বাধীন। ইচ্ছা করলে তারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও চলে যেতে পারে, যদিও এই বিষয়টি তত্ত্বের মধ্যেই আবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এদের পুলিশ বাহিনীও নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্যে প্রচণ্ড দুর্নীতি দেখা দিয়েছিল। এই অভিযোগের তদন্তের জন্য ১৯৯০ সালে কুইন্সল্যান্ডে ক্রিমিনাল জাস্টিস কমিশন (সিজেসি)-এর জন্ম হয় ও নিউসাউথ ওয়েলসে ১৯৮৮ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কমিশন এগেনস্ট কোরাপশন (আইসিএসি) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই সংগঠনই যথেষ্ট সফল হয় তাদের কাজে কারণ এরা সরকারের অধীনে ছিল না, তারা তাদের কাজের জন্য নিজ নিজ পার্লামেন্টের

কাছে দায়ী থাকত। এছাড়া কোনও ব্যাপারে অনুসন্ধান করার জন্য তাদের সম্পূর্ণ আইনসম্মত ক্ষমতা ছিল। এছাড়া তারা বিশেষ করে (আইসিএসি) প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তন করার জন্য উপদেশ দিতে পারতেন। তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার। সর্বোপরি দুই সংস্থাই শুরুতেই সর্বজনগ্রাহ্য ব্যক্তিদের পরিপূর্ণ ও কাজের সার্বিক দায়িত্ব দেয়। তারা স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান করে দুর্নীতির মূলে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে যারা দায়িত্বে আসেন তারাও তাদের কার্যের নিশানা পূর্বসূরীদের দেখানো পথেই পরিচালিত করেন[২১]।

তবে এই দেশগুলি ছাড়াও অনেক দেশই আজ দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেইসব দেশের বর্ণনা করা বা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরীক্ষা না করে কোনও সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া এত সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তা করা সম্ভব নয়।

সবশেষে সংক্ষেপে এটাই বলতে হয় যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ হল এক কঠিন ব্যাপার। তবে বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে একচেটিয়া বাজারের নিয়ন্ত্রণ, আমলা ও সরকারের বিশেষ ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রোধ ও তাদের কাজে স্বচ্ছতার আবশ্যিকতা, দুর্নীতি ধরা পড়বার সম্ভাবনা ও দোষীদের ক্ষেত্রে (দাতা ও গ্রহীতা উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য) শাস্তিদানের ব্যবস্থা যদি সম্ভব করা যায় তা হলে তার ভবিষ্যৎ আছে,[২২] না হলে 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' এই কথা যেন আজকে যারা দুর্নীতি করতে তারা মনে রাখে। তবে ভয়ের কথা এরকম দুঃসময়ে অনেক নিরীহ ব্যক্তিকেও চরম মূল্য দিতে হয়, অন্তত ইতিহাস সেই শিক্ষাই দেয়।

তথ্যসূত্র:

১. Kilgaard, R (1997), "Cleaning up and invigorating the civil service." Public Administration and Development; Vol. 17 No. 5. Wiley, London. pp. 497-510.

Ray, B and R Ghosh (1996), "India: Can Development Survive corruption and Graft?" Asian Studies Review; Vol. 19 No. 3. Melbourne. pp. 36-41.

২. Brooks, A (1895), Law of Civilisation and Decay. McMillan, London. pp. 263-4.

৩. Digby, W (1901), Prosperous British India – A Revelation. T Fisher Unwin, London. p. 33.

৪. Memorandum to Sardar Patel by Cachar District Congress Committee, 1947 ও
শ্রীহট্টের ইতিকথা— অচ্যুতকুমার মুখোপাধ্যায়

৫. Bishop Tutu's acceptance speech at the Nobel Peace Prize Award Ceremony.

৬. Britain, V (1999), Embarrassment aplenty in the tale of the high lie in The Guardian, London, Reprinted in the Canbera Times, 19 June.

৭. United Nations (1990), Corruption in Government: Report of an Interregional Seminar. The Hague, Netherlands. 11-15 December 1989. New York.

৮. Background paper prepared by the secretarial on international action against corruption for the Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the treatment of offenders. Cairo (A/CONF 169/14).

৯. World Development Report (1997), the state in a changing world. OUP, New York. p. 102.

১০. Noorani, A G (1973), Ministers' conduct. Vikash Pub. House. Delhi – (1984), President's Rule in the States. Indian Express, 6 February. Reprinted in the Indian Affairs: The Constitutional Dimension. Konark Publishers, Delhi.

— (1984), Is the constitutional Eroding? Indian Express, 24 April.

— (1987), Constitutional and Civil Servants. Reprinted in the Constitutional Dimension.

— (1988), President's Right to know. Indian Express, 18 March.

— (1989), The President and the constitution, 12 May.

— (1989), Forty years of the constitution. Sunday Mail, London, 26 November.

Chatterjee, P K (1997), Corrupt Legacy: Need for healthy conventions. The Statesman Weekly. 8 November.

Chaube, S K (1997), 'President's Rule: re-examining article 356.'

The Statesman, 6 August.

Gill, M S (1997), Chief Election Commissioner at a Press Conference in Kolkata on 18 August. At that conference he publicly alerted that all large political parties in India were harbouring and using anti-social elements in political activities and elections.

১১. Panth, N (1979), Some aspects of irrigation administration (a case study of Kosi project), Anugraha Narayan Sinha Institute of Social Studies, Patna.

১২. Wade, Robert (1984), The Market for Public Office: why the Indian state is not better at development. Institute of Development studies, the University of Sussex, England.

Bhattacharya, A (1982), 'In berighted Bihar.' Indian Express, New Delhi. 2 January.

১৩. The Statesman (2002), Karnataka High Court takes serious note of sex scandal. 11 November, Kolkata.

Ananda Bazar Patrika (2002), নথিতে কারচুপি, পাটনা হাইকোর্টে কেলেঙ্কারি ফাঁস, 26 October, Kolkata.

The Statesman (2002), CJI admits to graft in judiciary. 3 November, Kolkata.

১৪. Verma, Mr Justice J S (1997), 'I am under too much pressure on Hawla.' Chief Justice's open statement at the Court. 14 July.

১৫. UNDP (2001), Human Development Report 2001. Oxford University Press, New York.

১৬. Xin Ren (1997), Tradition of the law and the Law of the Tradition. Greenwood Press, London, p. 11.

১৭. World Bank (1997), World Development Report: The state in a changing world, OUP, New York, p. 107.

১৮. India Today, 1947-97, Special Issue (1997), India: state of the nation. New Delhi, pp. 42-53.

১৯. Transparency International Annual Report, 1997. Berlin

২০. Muganda, A A (1985), The corruption conundrum in Tanzania: Its limits and impact. Proceedings of the 7th UN conference on the prevention of crime and treatment of offenders. Milan.

২১. Criminal Justice Commission (1990), Criminal Justice Commission Queensland Annual Report 1989-90 (1990), Brisbane, Queensland. Independent Commission Against Corruption, New South Wales (1989), Annual Report to 30 June Sydney.

২২. Kilgaard, R (1997), cleaning up and invigorating the civil service. Public Administration and Development. Vol 17 No 5. Wiley, London, pp. 497-510.

২৩. May, R J and Binayak Ray (eds) (2006). *Corruption, Governance and Democracy in South Asia* (Bangladesh, India and Pakistan). Kolkata, Towards Freedom.

নোট বন্দী

প্রবীরজিৎ সরকার

"জলস্পর্শ করব না আর
চিতোর-রাণার পণ,
"বুঁদির কেল্লা মাটির 'পরে
থাকবে যতক্ষণ।"
"কী প্রতিজ্ঞা হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধবে তা আজ"
কহেন মন্ত্রীগণ।
কহেন রাজা, "সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।"
মন্ত্রী কহে যুক্তি করি,
"আজকে সারা রাতি
মাটি দিয়ে বুঁদির মতো
নকল কেল্লা পাতি।
রাজা এসে আপন করে
দিবেন ভেঙে ধূলির 'পরে,
নইলে শুধু কথার তরে
হবেন আত্মঘাতী!"
মন্ত্রী দিল চিতোর-মাঝে
নকল কেল্লা পাতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: নকল গড়, *কথা* (১৯০০)

ছাত্র: ১৯৭৫-৭৭

এই কবিতার মধ্যে যে গল্পটি বলা আছে সেটাকে আজকের পরিস্থিতির সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায়। আসল কালো ধন ক্ষমতাশালীদের দুর্গে নিরাপদে আছে। সেখানে হানা দেওয়ার দুঃসাহস রাজা (প্রধানমন্ত্রী)-র নেই। ওনার নির্বাচনী প্রতিজ্ঞা রাখবার জন্য (এখানে প্রধানমন্ত্রী) পরামর্শদাতারা (শোনা যায় ছ'জনের একটি দল এই পরিকল্পনা করে) নকল দুর্গ বানাল। অসহায় আমজনতার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। যাদের কাছেই ৫০০ বা ১০০০ টাকার নোট তাদের উপর যত হম্বি তম্বি।

বিগত ১৯৭৮ সালে যখন হাজার টাকা এবং আরও বড় নোট বাতিল হয় তখন সাধারণ মানুষদের খুব কম লোকেই অত বড় নোট চোখে দেখেছে। নতুন পে স্কেলে একজন অধ্যাপকই পেত ৭৯০ টাকা। এখন পাঁচ বাড়ি বাসন মেজেও অনেকে ৫০০০ টাকার উপরে রোজগার করেন। জিনিস পত্রের যা দাম (১৯৭৮-র তুলনায়) সেই হিসাবে আজকের ৫০০ টাকা সেকালের (প্রায়) ৪০ টাকার সমান। দেশের মোট অর্থের যোগানের প্রায় ৮৬%, পাঁচশত আর হাজার টাকার নোটে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে যে কাঁচা টাকার লেনদেন হয় তার মধ্যে সবটাই আয় নয় এর মধ্যে শ্রমের মজুরি সুদ লাভ সব মিশে থাকে। যুগ যুগ ধরে তাদের মুখে মুখে হিসেব। নোট বাতিলে এই সব ক্ষেত্রের উপর নির্ভরশীল গরীব শ্রমিক আর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত। যেমন মুম্বইয়ের আশে পাশের বাঙালি স্বর্ণ শিল্পীরা কাজ হারিয়ে রাজ্যে ফিরে এসেছে। এমন অনেক প্রবাসী শ্রমিক ফিরে আসছে— অনেক সময়ে তাদের বাতিল ৫০০ টাকায় মজুরি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি তারা বিদেশ বিভুঁইয়ে ভাঙাতে পারছে না— কপর্দকশূন্য হয়ে গ্রামে ফিরে আসতে হচ্ছে।

দেশের মোট কালো ধনের খুব সামান্য অংশ (বিশেষজ্ঞদের মতে ৬%) নগদে ছিল। অর্থনীতির সাধারণ জ্ঞান বলে লোকে তিনটি কারণে নগদ টাকা হাতে রাখে:

১) লেনদেনের জন্য (কেনাকাটার জন্য— transaction purpose)

২) নানা অজানা বিপদের জন্য (প্রাক-সাবধানতার জন্য--- pre-cautionary purpose)

৩) ফাটকার জন্য (সুদ বা জিনিসপত্রের দাম ওঠা নামা থেকে লাভ করবার জন্য— speculative purpose)।

তাই সাদা কালো সব আয়ের কিছুটা ওই তিনটে কারণে নগদে হাতে থাকে আর বাকিটা ব্যয় হয়ে যায়। কালো টাকার মালিকদের দ্রুত খরচ করার

প্রবণতা থাকে (ধরা পড়ার আশঙ্কায়)— স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ এবং আরও আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিনিয়োগের জন্য। আজকের নয়া অর্থনীতির উদারতায় বিদেশের দামী ভোগ্যপণ্য দেশে সহজে পাওয়া যায়— ডলার পাউন্ড সহজে কেনা যায়— বিদেশে পড়তে যাওয়া বা বিলাস ভ্রমণ করেও দ্রুত টাকা খরচ করা যায়। এছাড়াও কোনও সরকারের হাত যায় না এমন বিদেশি ব্যাঙ্কে হাওলার পথে পাচার তো যায়ই। তাই কালো টাকার বেশির ভাগটাই বড় নোটে নগদে থাকবে এমন ভাবনার মধ্যে যুক্তি বিশেষ নেই।

নোট বাতিলের পর ভাবা হয়েছিল বিশাল অঙ্কের কালো টাকা ব্যাঙ্কে নতুন নোটে পরিবর্তন হওয়ার জন্য আসবে না। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে বেশির ভাগ পুরনো নোট ব্যাঙ্কে ফিরে এসেছে (২৩.১২.০৬)। তাই সরকারের মুখ বাঁচাতে নিত্য নতুন নিয়মের কড়াকড়ি করে সাধারণ মানুষের নোট পাল্টানো আটকানো হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত হয়ত ৫% পুরনো নোট সরকারের কাছে ফিরবে না— এর সামান্য অংশ কালো টাকা। এর অনেকটাই খুব সাধারণ মানুষের সাদা টাকা যারা সুযোগের অভাবে পাল্টাতে পারেনি— কিছু বিদেশে থাকা মানুষও সুযোগের অভাবে পারেনি।

যারা কর ফাঁকি দিয়ে কোটি কোটি টাকা কামানোর ক্ষমতা রাখে তারা নানা ফন্দি ফিকির করে সেই টাকা বাঁচাতেও জানে। যেখানে আমজনতা তাদের হকের টাকা পাল্টাতে হিমশিম খাচ্ছে, হাতে নতুন নোট পেতে কালঘাম ছুটে যাচ্ছে, কালো টাকার কারবারিরা কোটি কোটি নতুন নোট পেয়ে যাচ্ছে। আয়কর হানায় এদের কাছ থেকে যা উদ্ধার করা হচ্ছে তাকে হিমশৈলের চুড়া বলা যায়। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের অসাধু কর্মীদের সাহায্য ছাড়াও রাজনৈতিক দলের সাহায্য আর মন্দির ট্রাস্টের দান চক্র এসব কাজে কালো টাকা সাদা করতে বড় লোকদের কাজে আসছে।

কাজেই নকল বুঁদির কেল্লা গুড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে তুলনা অমূলক নয়।

যে রাজস্থানী কাহিনী দিয়ে শুরু করেছি সেখানে কুম্ভ বলে একজনের কথা বলা ছিল— 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি গড়'। সেই কুম্ভও এখানে আছে যে লড়ে যাচ্ছে— সে ছিল রাজার ভৃত্য (বশংবদ), আবার ওই বড় (লোক ঠকানো) কালো ধনের ধারক ও বাহক (নাম করে কি বলতে হবে? বুঝহ যে জান সন্ধান)।

রাজস্থানের চিতোরের রানার গল্পের সঙ্গে এ যুগের কাহিনী অনেকটা মিলিয়ে দিলেও একটা বড় অমিল আছে। রাজতন্ত্রের যুগে লোক দেখানো

পণ আর আসল পণের পার্থক্য থাকতো না। গণতন্ত্রের ভড়ংয়ের যুগে সরকারের কালো ধন দূর করার পণ লোক দেখানো। তাই নেওয়া হল নোট বাতিলের মত লোক চমকানো (চাবকানো?) সিদ্ধান্ত। দেশপ্রেম আর হিঁদুয়ানির মোড়কে নাটকীয়ভাবে পরিবেশন করা হল— বলা হল পাকিস্তান দেশে জাল নোট ছড়িয়ে উগ্রপন্থার প্রসার ঘটাচ্ছে আর সেই সঙ্গে চলছে কালো ধনের বাড়বাড়ন্ত। এইসব রুখতে নোট বাতিল জরুরি— দেশের সৈন্যরা কত কষ্ট করে দেশ পাহারা দেয় আমাদেরও দেশের স্বার্থে কিছু দিন কষ্ট করতে হবে। ব্যাপারটা আমজনতার একটা বড় অংশের মনে ধরল— এরা মোটা দাগের যাত্রা পালা সহজে বোঝে; আঁতেল সিনেমা বিশেষ বোঝে না। এরা দেশের উগ্রপন্থার আর কালো টাকার বাড়বাড়ন্ত নিয়ে চিন্তিত (অনেকে কালো টাকা বলতে মূলত হাত পেতে ঘুষের আর চুরি ডাকাতির টাকা বোঝে)। মাঝে মাঝে বাতিল নোটের বান্ডিল এখানে ওখানে পড়ে থাকতে দেখার খবর বা কারও বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়ার খবর (কতটা সরকারি সাজানো ঘটনা বলতে পারব না) এদের উৎসাহিত করছে। কিন্তু কেউ ভেবে দেখছে না, মানুষকে এইভাবে না ভুগিয়েও কালো টাকা উদ্ধার করা যেত। এখন হঠাৎ আয়কর দপ্তরের এই তৎপরতা কি নোট বাতিল না করে শুরু করা যেত না? ৮ই নভেম্বর নাটকীয় ঘোষণা না করে আয়কর দপ্তরের বিশাল বাহিনী আচমকা সারা ভারত জুড়ে কালো ধনে ধনীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত। এতে শুধু নগদ নয় হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তির ও হদিশ পাওয়া যেত। গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্যে হাওলা দিয়ে কালো ধন বিদেশে পাচার উগ্রপন্থীদের অস্ত্রশস্ত্র কেনা সবই বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

সরকারের কালো ধন নিয়ে মাথা ব্যথা থাকলে পানামা পেপারসে যাদের নাম পাওয়া গেছে (পানামা দেশে সারা বিশ্বের কর ফাঁকি দেওয়া ধনীরা টাকা পাচার করে— কিছু হ্যাকার তাদের নাম ফাঁস করে দিয়েছে) তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করত— এর আগে সুইস ব্যাঙ্কে ভারতীয়দের কালো টাকার হদিশ হ্যাকাররা দিয়েছিল (ফ্রান্সের কিছু হ্যাকার ওদের দেশের কর ফাঁকি দেওয়া ধনীদের খোঁজে এই কাজ করেছিল)। সেই নিয়েও কিছু করা হয়েছে বলে খবর নেই। গোয়েন্দা দপ্তর প্রয়োজনমত আমাদের সমস্ত চিঠিপত্র খোলে সমস্ত মোবাইলে ইন্টারনেটে প্রয়োজনমত নজরদারি করে (যে সমস্ত বিদেশি সংস্থা— যেমন ফেসবুক— এসব করতে দেবে না তাদের দেশে ঢুকতে দেওয়া হয় না— ব্ল্যাকবেরি তাদের সার্ভারের অ্যাকসেস দেয়নি বলে তাদের চলে

যেতে বলা হয়েছিল)। কাজেই চাইলে কেন্দ্রীয় সরকার গোয়েন্দা লাগিয়ে প্রয়োজনে হ্যাক করে বিদেশে গচ্ছিত কালো ধন উদ্ধার করতে পারত— সদিচ্ছা থাকলে ব্যাঙ্কের কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়ে যারা শোধ দেয় না উল্টে মোদির চার পাশে বিচরণ করে তাদের জেলে পোড়ার উদ্যোগ নিত। সত্যি বলতে এই সব বড় কালো ধনের মালিকরা নোট বাতিলের বড় সমর্থক— তাদের গায়ে হাত তো পড়ছে না। দুর্গম অপ্রতিরোধ্য 'বুঁদির কেল্লায়' এদের বিচরণ।

তা হলে কেন এই নোটবন্দি খেলা? কিম্বা নোট বাতিল যাত্রা পালা? সেখানেই আসছে ঘোষিত উদ্দেশ্য আর আসল উদ্দেশ্যের পার্থক্য। নকল বুঁদির কেল্লা বানানো হয়েছিল রাজার অগোচরে রাজাকে অনশনে দেহত্যাগ থেকে বাঁচাতে। এখানে পরামর্শদাতারা এই চাল চেলেছিল আমজনতাকে বোকা বানাতে— ভোটের সময়কার পণ রাখতে উনি চেষ্টা করছেন বোঝাতে। দেশকে বাঁচাতে জনগণকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে— এসব বোঝানো চলল। এই সময়টা কেন বাছা হল? কদিন আগে সার্জিকাল স্ট্রাইক পালা করে বিশেষ সুবিধা হয়নি— বরং জানা গেল আগেকার সরকার মাঝে মাঝেই বিনা প্রচারে এমন করেছে— ইনি ব্যাপক প্রচার করাতে আরও বেশি উগ্রপন্থীদের সন্ত্রাস বাড়ছে— পরমাণু যুদ্ধের সম্ভাবনায় আন্তর্জাতিক চাপ আসছে। কাজেই নোটবন্দী খেলার একটা উদ্দেশ্য আমজনতা মোদির জয়ধ্বনি দিতে দিতে টাকার রেশন দোকানে (এখন ব্যাঙ্ক তাই হয়েছে) লাইন দিতে ব্যস্ত থাকবে। কদিন উগ্রপন্থীরা ঘাবড়ে গিয়ে আক্রমণে বিরত থাকবে (হয়েছিল তাই— এখন যেই কে সেই)।

এবার আসি আসল মতলব কি তার আলোচনায়।

১) ডিজিটাল ইন্ডিয়া: নোট বাতিল ঘোষণার সময় এই নিয়ে কোনও কথা বলা হয়নি। পরবর্তী কালে যথেষ্ট নতুন নোটের যোগান না দিয়ে মানুষকে জবরদস্তি অন লাই ডিজিটাল লেনদেনের দিকে ঠেলে দেওয়া হল। ফিকি-র বার্ষিক সাধারণ সভায় (১৭.১২.২০১৬) দেওয়া ভাষণে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেন: মোট ১৫ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা মূল্যের পুরনো নোট বাজার থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে। তবে সম মূল্যের নতুন নোট এখনই বাজারে ছাড়া হবে না। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে নগদের যোগানে ঘাটতি রাখা হচ্ছে। ভাবা হচ্ছে আমজনতা হাতে হাতে স্মার্ট ফোন নিয়ে ঘুরবে আর হই হই করে অনলাইন ডিজিটাল লেনদেন করবে। ভাবা হল না দেশের নীচের তলার

অশিক্ষিত গরীব মানুষগুলির কথা যারা স্মার্ট ফোট ইন্টারনেট এগুলি ব্যবহার করতে জানে না— এগুলি কেনার পয়সা নেই— বহু গ্রামে মোবাইলের সিগনাল নেই বিদ্যুৎ নেই ব্যাঙ্কের সুবিধা নেই। সাঁতার না জানা একজনকে মাঝে দরিয়ায় ঠেলে ফেললে সে সাঁতার শেখে না— বিপদে পড়ে। তাই হচ্ছে। অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে ঘরে ঘরে ব্র্যান্ড ইন্টারনেট স্মার্ট ফোন আসে মানুষ নিজে থেকেই এগুলির ব্যবহারের উপযোগিতা বোঝে জবরদস্তির দরকার পড়ে না (ব্যক্তিগতভাবে এই প্রবন্ধের লেখক বহু দিন ধরে এসব ব্যবহার করছে)। তা হলে কেন এই জবরদস্তি? দেশের নয়া অর্থনীতির পথ ধরে সর্বত্র বিদেশি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছে— কিন্তু গত জমানায় খুচরো ব্যবসায়ে দেশি পুঁজির ব্যাপক প্রসার ঘটলেও বিদেশি পুঁজি ঢুকতে দেওয়া যায়নি— বিরোধী দলের বাধায়। ওয়ালমার্টের মত বহুজাতিক কোম্পানির ভারতের বাজারের দিকে বহু দিনের নজর। এই কারণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট এক সময় বিরক্তি প্রকাশ করেছেন— ভারত নয়া অর্থনীতির প্রসার ঠিক মত হচ্ছে না। তারপরই অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে প্রণব মুখার্জীকে সরিয়ে আরও দক্ষ পি চিদাম্বরমকে আনা হল। এবার মোদির জমানায় ডিজিটাল ইন্ডিয়া করা আসলে বাজার বাড়ানো--- খুচরো ব্যবসায়ী আর তাদের নগদে ক্রেতাদের বিপদে ফেলে। আলু পটল বেগুল মুলো মাছ মাংস বাতানুকূল পরিবেশে কেনার অভ্যাস করলে (অনেকে এতকাল সুযোগ থাকলেও পাড়ার বাজারে দরদাম করে কেনা পছন্দ করে) দেশি বিদেশি দু ধরনের পুঁজি হাত ধরাধরি করে বিকশিত হবে। এর সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ওয়ালেটের ব্যবসা বাড়বে। নিন্দুকেরা বলে মোদির সহচর অনেক মহাপুরুষের শেয়ার এই সব ব্যবসায়ে আছে। তারা লাভবান হবে। ভোটের খরচপাতি তো এরাই যোগায়।

২) ব্যাঙ্কের নগদের যোগান বাড়ানো আরও সুদ কমানো: গরীব জনসাধারণ ঋণ নিয়ে শোধ না করতে পারলে ব্যাঙ্কের লোক বা পোষা গুণ্ডা হামলা করে (আমার ৭০০০ টাকার ক্রেডিট কার্ড বিল পেমেন্ট করার পর একটা ভুলের জন্য রেকর্ড আপডেট হয়নি বলে বহু দিন বাড়িতে হামলা চলছিল)। হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ না করে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় বা ধরতে গেলে বিদেশ পালায় এমন বহু মহাপুরুষ দেশে আছে— তাদের কেউ কেউ মোদির কাছের লোক। যাই হোক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি পুঁজির অভাবে ধুঁকছে। সরকার এক ঢিলে দুই পাখি মারার বন্দোবস্ত করল— লোকে

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে পারছে না— এইভাবে ব্যাঙ্কে টাকার যোগান বাড়ছে— সুদ কমছে। মহাপুরুষদের আরও ঋণ নিয়ে শোধ না করার সুযোগ হবে।

৩) নোট ছাপানোর চক্কর: নোট বাতিল করলে নতুন নোট ছাপতে হয়। এখানে আছে এক দুর্নীতির গন্ধ। পাকিস্তানকে ভারতের কারেন্সি নোটের কাগজ সরবরাহের অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত De La Rue কোম্পানি ভারতের নতুন ৫০০ ও ২০০০ টাকার নোট ছাপার অধিকার পেয়েছে। দেশের নিরাপত্তার জন্য জাল নোট বন্ধ করার কথা বলে কোন বিশেষ প্রযুক্তি ব্যবহার না করেই কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানিটি নতুন নোট ছাপাচ্ছে। এ ব্যাপারে জনস্বার্থ মামলা করে কেউ কি সব কিছু জনসমক্ষে আনবেন?

কেউ কি হিসেব করে দেখবেন নতুন নোট ছাপাতে কত খরচ হল আর কালো ধন উদ্ধার করে কতটা বেশি কর আদায় হল? এই সঙ্গে মানুষের যে দুর্গতি ভোগান্তি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির ক্ষতি হিসাবে আনতে হবে।

উপসংহারে এটাই বলা যায় দেশপ্রেম আর হিন্দু জাতীয়তাবাদের মোড়কে নোট বন্দী এক সর্বনাশা খেলা। সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত উপার্জন তাদের ইচ্ছামত ভোগ করতে না দিয়ে শুধু তাদের নয় তাদের উপর নির্ভরশীল আরও কিছু মানুষকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। আরও বড় কালো ধনের মালিকরা মনের সুখে আরও কালো ধন রোজগার আরও ভোগের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছু চিয়ার লিডার সরকারের জয়গান গেয়ে চলেছে। সত্য সেলুকাস কি বিচিত্র এই দেশ!

গ্রামীণ পর্যটন— পশ্চিমবঙ্গের ধারণক্ষম উন্নয়নের পথ

কাবেরী সরকার

পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামীণ ও কৃষি উন্নয়নের পাশাপাশি এই রাজ্যের ভ্রমণ বা পর্যটন শিল্পটিও যথেষ্ট তাৎপর্য বহন করে। ভ্রমণ শুধু যে পাহাড়, জঙ্গল, বা সমুদ্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা নয়। ভ্রমণপিপাসুদের কাছে সবুজ ছাওয়া, ছায়ায় ঢাকা ছোট্ট একটি গ্রামও তার নিজ গুণে আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সেটিকে প্রকৃত রূপে দ্রষ্টব্য করে তোলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা বলতে পারি, "বহু দিন ধরে, বহু ক্রোশ দূরে, বহু ব্যয় করি, বহু দেশ ঘুরে, দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শীসের উপরে, একটি শিশিরবিন্দু।' অর্থাৎ দেখার চোখ থাকলে আমরা ঘরের পাশেই কোনও দর্শনীয় বস্তু খুঁজে পেতে পারি এবং তার থেকে যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করতে পারি।

ঠিক এই কারণেই বর্তমানে পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। যেমন ইকো ট্যুরিজম বা বাস্তু পর্যটন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম বা রোমাঞ্চকর ভ্রমণ, এগ্রি ট্যুরিজম বা কৃষি ভ্রমণ এবং সর্বোপরি রুরাল ট্যুরিজম বা গ্রামীণ ভ্রমণ। এগুলির মধ্যে বর্তমানে গ্রামীণ পর্যটন। এগুলির মধ্যে বর্তমানে গ্রামীণ পর্যটন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে একটি 'সবুজ উন্নয়ন' সম্ভবপর হয়ে উঠতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে গ্রামীণ উন্নয়ন যেন না সবুজ দূরীকরণে পর্যবসিত হয়। বর্তমান কালে

ছাত্রী: ১৯৯০-৯২

'ধারণক্ষম উন্নয়ন' (sustainable development) একটি অতি পরিচিত এবং বহু চর্চিত বিষয় যার জন্য সমগ্র বিশ্ব সচেষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান পৃথিবীর সব থেকে বড় সমস্যা হল পরিবেশ দূষণ যা অতি ভয়ঙ্কর রূপে গ্রাস করতে বলেছে সমগ্র মানবজাতির অস্তিত্বকে। এ যাবৎ পৃথিবীতে চলে আসা বেপরোয়া উন্নয়ন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তথা জীবনের অস্তিত্বকে পৃথিবী থেকে মুছে দিতে চলেছে। তাই একবিংশ শতকের সর্ববৃহৎ চ্যালেঞ্জ হল অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বজায় রেখে পরিবেশ দূষণ রোধ করা। 'আবহাওয়ার পরিবর্তন'-কে (ক্লাইমেট চেঞ্জ) যদি না আটকানো যায় তবে তা সমস্ত প্রগতিকেই অর্থহীন করে দেবে। তাই আমাদের উন্নয়নের জন্য এমন পথ বেছে নিতে হবে যা বায়ুমণ্ডলে 'গ্রিন হাউস গ্যাস'গুলিকে (Green House Gases) ঘনীভূত হতে দেবে না। ভারতবর্ষের মত জনসংখ্যাবহুল দরিদ্র দেশে তাই দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য উন্নয়নের সাথে সাথে পরিবেশ ঠিক রাখা এক অতি কঠিন চ্যালেঞ্জ। গ্রামীণ উন্নয়ন প্রয়োজনীয় হলেও এটি সবুজায়নের মাধ্যমে করা আবশ্যক এবং সেই কারণেই গ্রামীণ পর্যটন বা গ্রামীণ ভ্রমণকে প্রাধান্য দেওয়া প্রয়োজন।

পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্যের (বায়ো-ডায়ভার্সিটি) সুযোগ নিয়ে, এর প্রাকৃতিক সম্পদগুলির সদ্ব্যবহার করে, এবং সর্বোপরি রাজ্যের মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলাই একমাত্র উপায়। গ্রামীণ ভ্রমণকে বৃদ্ধি করার জন্য রাস্তাঘাট উন্নয়নের সাথে প্রয়োজন ভ্রমণার্থীদের একটু আরামে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু তার জন্য যেনতেন প্রকারেণ যত্রতত্র হোটেল তৈরি করা বাঞ্ছনীয় নয়। কৃষিজমি নষ্ট করে বা গাছ কেটেও এগুলি করা যাবে না। যেসব বাসস্থানগুলি বর্তমান সেগুলির সংস্কারের মাধ্যমে, বৈদ্যুতিকরণ বাড়িয়ে তুলে, শৌচাগার তথা অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবার দিকে নজর দিয়ে এই কাজে এগিয়ে চলাই শ্রেয়। আরও নজর রাখা প্রয়োজন যাতে শক্তি এবং জলের অপব্যবহার না হয়। শক্তির জন্য সৌরশক্তি অথবা গোবর গ্যাস দ্বারা জ্বালানির প্রয়োজন মেটানো এবং জলের জন্য বৃষ্টির জল ধরে রাখা (ওয়াটার হারভেস্টিং) যা পরে বিভিন্ন রূপে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে, এই পদ্ধতিগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে। জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন কারণ এতে কেবলমাত্র বিদ্যুতের প্রয়োজন মিটবে না, পরিবেশ কম দূষিত হবে এবং ওই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি একটি ভ্রমণকেন্দ্রেও রূপান্তরিত করা যাবে।

গ্রামীণ পর্যটনের ক্ষেত্রে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিপণনই প্রাধান্য পায়। শহুরে

মানুষকে গ্রাম্য জীবনযাত্রার সাথে পরিচয় করানো তথা গ্রাম্য শিল্প সংস্কৃতি উপহার দেওয়াই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রামীণ পর্যটনকে উন্নত করতে পারলে এর গুণক প্রভাবে (মাল্টিপ্লায়ার এফেক্ট) সমগ্র গ্রামাঞ্চলেরই উন্নয়ন সম্ভব। মানব আধিপত্যকে হ্রাস করে, প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিলুপ্ত না করে গ্রামীণ পরিবেশকে সংরক্ষিত রেখে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা প্রয়োজন। গ্রামীণ পর্যটন কয়েকপ্রকার হতে পারে। যথা— কৃষি পর্যটন, যেখানে কোনও কৃষক পরিবারের সান্নিধ্যে থেকে (হোমস্টে) গ্রামীণ পরিবেশকে উপভোগ করা যায়। কৃষক পরিবারের সাথে পরিচিত হওয়া, তাদের লোক উৎস, লোকশিল্প ও সংস্কৃতিকে উপভোগ করা, তাদের পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য ও পানীয়ের সাথে পরিচিত হওয়া এবং তাদের হাতের তৈরি দ্রব্য ব্যবহার করার মাধ্যমে কৃষি ভ্রমণ গড়ে উঠতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি হল ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য ভ্রমণ। এর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাচীন মন্দির, স্মারকসৌধ অথবা যে কোনও বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের জন্ম ও কর্মস্থল। এর উদাহরণ উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভূতি হল্ট বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মস্থান অথবা দেউলটি বা হুগলিতে অবস্থিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভূমি। এছাড়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি বা গোপগড়, পুরুলিয়ার গড়পঞ্চকোট অথবা বিষ্ণুপুরের প্রাচীন টেরাকোটা মন্দিরগুলি এবং মুর্শিদাবাদের পালীশ তথা আরও বহু ঐতিহাসিক স্মারক পশ্চিমবঙ্গের ভ্রমণপ্রিয় মানুষের নিকট আকর্ষণীয় স্থান। গ্রামীণ পর্যটনের তৃতীয় ক্ষেত্রটি হল বাস্তু পর্যটন বা ইকো ট্যুরিজম। এটি বিভিন্ন অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য দেখার জন্য অর্থাৎ গাছপালা এবং প্রাণীজগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের জন্য আকর্ষণীয়। আমাদের গ্রাম বাংলার গড়পঞ্চকোট, বিহারীনাথ, বড়ন্তি অঞ্চল, পুরুলিয়ার জঙ্গল, অযোধ্যা পাহাড়, দলমা পাহাড় প্রভৃতি এই কারণে পর্যটকদের কাছে প্রিয়।

গ্রাম বাংলার পর্যটনকে উন্নত করার জন্য ইতিমধ্যেই কিছু কিছু কার্যকলাপ শুরু করা গেছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। মুর্শিদাবাদের লালবাগ থেকে কলকাতা পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে ২৫০ কিমি পর্যন্ত নৌবিহারের (Heritage Guise) ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটিতে পশ্চিমবঙ্গের তিনটি ঐতিহাসিক ধারাকে তুলে ধরা হচ্ছে যথা— ইসলামীয় প্রভাব; যথাক্রমে মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ-মায়াপুর ও ব্যারাকপুর অঞ্চলে। বীরভূমের বল্লভপুরডাঙা ও বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুরকেও পর্যটকদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। শালপিয়ালে ঢাকা ছোটনাগপুর মালভূমির

পুরুলিয়া অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি, পাথরে খোদাই হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হচ্ছে। বাঁকুড়ার পাঁচমুড়া গ্রামটি হস্তশিল্পের জন্য আকর্ষণীয়। পুরুলিয়ার ছৌনাচ ও অন্যান্য উপজাতির নৃত্যশৈলী পর্যটকদের আকর্ষণ করে। সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিগুলির জীবনযাত্রা তাদের রাঙা মাটিতে নিকানো উঠোন, গৃহগুলিও দ্রষ্টব্য বিষয়। এছাড়া গ্রামবাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণের বিভিন্ন উৎসবগুলি যথা— শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা, কেঁদুলিতে জয়দেব মেলা, সুন্দরবনে বনবিবির উৎসব, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজো, বিষ্ণুপুর মেলা, শিকার উৎসব, গবাদি পশুদের বাঁধনা উৎসব পর্যটক আকর্ষণ করে। অপর দিকে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে ১৫০০ বছরের প্রাচীন রাজা চন্দ্রবর্মণের গড় রয়েছে যেখানে হিন্দু দেবদেবীর প্রাচীন মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। গুপ্তীপাড়ায় বৃন্দাবন জিউ-এর মন্দিরকে কেন্দ্র করে বলাগড়ে একটি ভ্রমণকেন্দ্র, টাকীর নিকট আকর্ষণীয় পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন বহনকারী ধান্যকুড়িয়া গ্রাম, উত্তরবঙ্গে বাংলাদেশ সীমান্তের নিকট বালুরঘাটে অঞ্জিনা পাখিরালয় ইত্যাদি আরও বহু ভ্রমণকেন্দ্রকে উন্নত করার কথা ভাবা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যেতে পারে গ্রামীণ পর্যটনের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন, আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, সমস্ত কিছুই সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বিভিন্ন শিল্প সংস্কৃতির বিপণনে দরিদ্র গ্রামবাসী তাদের উপযুক্ত মজুরির আশা করতে পারে এবং এগুলির অবলুপ্তির পথ রুদ্ধ হয়। লোকসাহিত্য, লোকনাট্য, লোকগীত ও নৃত্য, বাউল সঙ্গীত, ভাটিয়ালি, কীর্তন, গাজন তথা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, প্রাচীন হিন্দুপুরাণ সাহিত্য এ সকল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে। টেরাকোটার কাজ, বেতের কাজ, হাতির দাঁতের কাজ, রেশম ও পশম এবং পাট হস্তশিল্প, তামা ও পিতলের কাজ তথা বিষ্ণুপুরের বালুচরী, ফুলিয়ার তাঁত গ্রামবাংলার ভাণ্ডারকে অফুরান করে তুলেছে। এই সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য উপযুক্ত অর্থসংস্থানের প্রয়োজন। জেলা শাসক, বিভিন্ন অসরকারি সংস্থা (এনজিও), স্থানীয় মানুষকে এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে, প্রশিক্ষণ শিবির (ট্রেনিং প্রোগ্রাম) ও কার্যশালার (ওয়ার্কশপ) মাধ্যমে গ্রামবাসীকে উৎসাহিত করতে হবে। সর্বোপরি প্রয়োজন হল মানুষের প্রকৃতরূপে ভ্রমণ মনস্কতার এবং সদিচ্ছার যা ব্যতিরেকে এই কাজে এগোন সম্ভব নয়।

অর্থনীতি বিভাগ— শতাব্দী পেরিয়ে

সুদক্ষিণা গুপ্ত

ভারতবর্ষে অর্থনীতি চর্চা ঠিক কবে থেকে শুরু, তা পণ্ডিতদের নানা আলোচনা, গবেষণার বিষয়। তবে এই ভূখণ্ডে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অর্থনীতি সম্পর্কিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কৌটিল্য বা চাণক্যের 'অর্থশাস্ত্র', যার বয়স ঐতিহাসিকদের মতে দু হাজার বছর পেরিয়ে গেছে, নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। 'অর্থশাস্ত্র' নামে অর্থশাস্ত্র হলেও, কেবলমাত্র অর্থের শাস্ত্র এটি নয়, অর্থনীতির চর্চায় সীমাবদ্ধ নয় এ বই— অর্থনীতি ছাড়াও রাজনীতি, দর্শন, রাজ্য পরিচালনাশাস্ত্র, কিছুটা জ্যোতির্বিজ্ঞান, বাস্তুশাস্ত্র, স্থাপত্যবিদ্যা, আইন কানুন— কিছু বাদ নেই এই বইয়ে। সেই প্রাচীন যুগেও ভারতবর্ষে অর্থনীতিকে এসব শাস্ত্রের জননী হিসাবে ধরা হত। সুপ্রাচীন উন্নত সভ্যতা এই বইয়ে প্রতিফলিত। এটি রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্য নয়, কালিদাস প্রভৃতির রচনার মতো সাহিত্যও নয়, কিন্তু একটি দেশ বা রাজ্যের, একটি অর্থনীতির পরিচালনা সংক্রান্ত রীতি-নীতি সমৃদ্ধ এমন একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ আর কোনও প্রাচীন সভ্যতায় পাওয়া গেছে বলে জানা নেই।

এরপর আইন-ই-আকবরী ইত্যাদি লেখা হয়েছে এ দেশে, তবে তখন সভ্যতা এগিয়ে গেছে অনেকটা, বিশ্ব জোড়া আধুনিক ইউরোপীয় বাণিজ্য শুরুর মুখে। অর্থাৎ, ভারতবর্ষে অর্থনীতি চর্চার ধারা সেই প্রাচীন যুগ থেকেই বহমান।

ইউরোপের সংস্পর্শে এসে এই ধারা বদলে গেল একেবারেই। উনিশ শতকে ব্রিটিশরা এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করেছিল তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে, এ কথা কারও অজানা নয়। তাদের ফার্মগুলি

ছাত্রী: ১৯৮৫-৮৭

এবং সরকারি প্রশাসন চালানোর জন্য কেরাণী, আইন ব্যবস্থার জন্য উকিল, মুহুরী সবই তারা তৈরি করেছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। স্কুল কলেজ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিকেও ঝুঁকল তারা। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সারা দেশ জুড়ে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল যখন, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং তৎকালীন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর কলকাতাও তাদের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হল না। তার কপালেও জুটল একটি আস্ত বিশ্ববিদ্যালয়— আমাদের বহু গর্বের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। দেশের অন্যতম প্রাচীন এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত এই প্রতিষ্ঠানটির বয়স হল প্রায় ১৬০ বছর। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হল কিন্তু সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধারায়। সেখানে শুধু ইউরোপীয় শিক্ষার প্রচলন, 'অর্থশাস্ত্র' রচনার সময়ে যে শিক্ষার কোনও অস্তিত্বই ছিল না। ইংরেজ যা বোঝেনি, তা হল তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে তরুণ ভারতীয়রা শুধু তাদের প্রশাসনের হাত শক্ত করতেই এগিয়ে যাবে না, তাদের মধ্যে জাগ্রত হবে জাতীয়তাবোধও, যা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে একদিন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ছটি দশক পার হতে না হতে এল অর্থনীতি বিভাগ। তত দিনে সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিদেশে সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এখানকার অনেক ছাত্র— বাঙালি ও অবাঙালি পুরুষ, অল্প সংখ্যক মহিলা— এমন কি কিছু অভারতীয়ও। সে সময়ে ভারতীয় রাজনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন— সর্বত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক-স্নাতকোত্তরের নাম জ্বলজ্বল করছে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি ঘটে গেছে, স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর রামকৃষ্ণ মিশন চতুর্দিকে এক পরিচিত নাম। আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে গবেষণা কার্য চালাচ্ছেন, কলকাতা থেকে ব্রিটিশ রাজধানী চলে গেছে দিল্লী, বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ বাংলা কাঁপাচ্ছেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে।

পুরনো regulation অনুযায়ী ১৯০৯ সাল পর্যন্ত অর্থনীতি পড়ানো হত ইতিহাসের সিলেবাসের মধ্যে। ১৯০৪-এর Indian Universities Act, New Regulations অনুযায়ী স্থির হয়েছিল যে অর্থনীতিতে বিএ ও এমএ চালু করা হবে। ১৯০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষের প্রথম প্রফেসরশিপ 'মিন্টো চেয়ার', এবং তা এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের জন্য। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে এই মিন্টো চেয়ার অলঙ্কৃত করেন প্রোফেসর মনোহর লাল, ১৯৪০-এ এটি পরিণত হয় University Professorship in Economics-এ।

যদিও অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার তোড়জোড় শুরু হয় স্যার আশুতোষের চেষ্টায় যখন তিনি উপাচার্য ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চালু হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে— উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সময়ে। সে সময়ে কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসই ছিল সব বিভাগের ঠিকানা। এই সময়ে ব্রিটেনের ভারতবর্ষের অর্থনীতি তছনছ করার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ, দাদাভাই নৌরজীর 'economic drain' তত্ত্ব, Findlay Shiraaz-এর (ইনি পরে এই বিভাগে অধ্যাপনাও করেন) জাতীয় আয়ের হিসাব প্রকাশিত অনেক আগেই, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙালি জড়িত— তবু অর্থনীতিকে একটি পৃথক বিষয় হিসাবে পড়াশোনা করার কাজ শুরু করতে দেরি হয়ে গেল বেশ। এ সময়ে কিন্তু অর্থনীতি যুক্ত হল রাজনীতি ও দর্শনের সঙ্গে। বিভাগটির নাম হল Department of Political Economy and Political Philosophy। স্বাধীনতার পরে, ১৯৪৮ সালে অর্থনীতি বিভাগ একটি পৃথক বিভাগের মর্যাদা পায়।

এখানে উল্লেখ্য যে মনোহরলালের নিযুক্তির পরে অল্পবয়সী ছেলেদের মধ্যে (তখন মেয়েরা আর এত দূর পড়ত কই?) অর্থনীতির বিষয় হিসাবে জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং স্নাতকোত্তর চালু হওয়ার পরে পূর্ণ ও আংশিক সময়ের বেশ কিছু অধ্যাপক এই বিভাগে যোগ দেন যার মধ্যে অনেক বিখ্যাত মানুষও ছিলেন।

এর পর প্রায় একটি শতাব্দী কেটে যাওয়ার মুখে এবং এর মধ্যে ঘটে গেছে বহু ঘটনা। দুটি বিশ্বযুদ্ধ পার হয়ে, বিশ্ব জোড়া ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটিয়ে বেশ কিছু দেশভাগ হয়ে নতুন দেশ সৃষ্টি হয়ে, কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটে গিয়ে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সমাপ্তি হয়ে ভারতে বিশ্বায়নের যুগ শুরু হয়ে গেছে সেও আজ পঁচিশ বছর হল। এর প্রত্যেকটি ঘটনার আঁচ লেগেছে আমাদের অর্থনীতি বিভাগে— বাম-দক্ষিণ সমস্ত আন্দোলনের শরিক হয়েছে সে। বিশেষত, এই বিভাগের ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকের মধ্যেই বামপন্থী চিন্তার ফল্গুধারা বয়ে চলে। (এর গূঢ় কারণ কি হতে পারে যে এই বিভাগের জন্ম ১৯১৭ সালের রুশ মহাবিপ্লবের সময়ে?)

পৃথক বিভাগ হিসাবে ১৯৪৮-এ আত্মপ্রকাশের পর ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ উঠে এসেছে বি টি রোডের ধারে একটি আলাদা ক্যাম্পাসে। একটি বিভাগের জন্য একটি আলাদা ক্যাম্পাস— আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। একটি ওজন মাপার যন্ত্র তৈরির কারখানার নামে

জায়গাটির নাম থেকে অর্থনীতি বিভাগের নাম হয়েছে আমাদের সাধের ‘কাঁটাকল’। ‘কাঁটাকল’ বছরের পর বছর পাশ করে যাওয়া অর্থনীতির ছাত্রছাত্রীদের কাছে বড় আদরের একটি নাম, একটি পরিচয়, একটি আইডেনটিটি। আলাদা ক্যাম্পাসে পড়াশোনা করার সুবিধা যেমন, কিছু অসুবিধাও আছে তেমন।

শুরুর দিকে পড়ানো বিভিন্ন অর্থনৈতিক মতবাদ, বা ইকোনমিক থটস, সাধারণ তত্ত্ব থেকে সরে এসে অর্থনীতির থিওরি, এবং ক্রমে আরও বেশি অঙ্ক সহযোগে তার বিশ্লেষণের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। মজার ব্যাপার এগুলি কিন্তু সবই পশ্চিমী অর্থনৈতিক তত্ত্ব। খোলাবাজার অর্থনীতির কাজ কারবার বিশ্লেষণ এবং সমান্তরালভাবে সমাজতান্ত্রিক ও মার্কসীয় তত্ত্ব ও আলোচনা করা হয়, এ কথা ঠিক যে— এ দুটি না জানলে বর্তমান যুগে, বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হবে— কলকাতার ইকোনমিক্স জানা ছেলেমেয়েরা ঠাঁই পাবে না কোথাও— কিন্তু যে দেশে প্রায় ২½ হাজার বছর আগে অর্থনীতির চর্চার একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লেখা হয়েছে— সে দেশের প্রাচীনতম আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও সে বইটির উল্লেখ করা হয় না, তাই না, ভারতীয় অর্থনীতির নিজস্ব সমস্যা, তার সমাধানের উপায় ইত্যাদির উপর গুরুত্ব যেন ক্রমেই কমে আসছে। অঙ্কের ব্যবহার বেশি শুরু হওয়ার ফলে গত বছর ত্রিশেক ছাত্রছাত্রীরা এমএ-র পরিবর্তে এমএসসি ডিগ্রি পাচ্ছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ রত্নগর্ভা। দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত বহু সুসন্তানের গর্বিত জননী হয়েছে সে। তার অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের তালিকা এই চিত্রটিকে স্পষ্ট করে। কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও এই বিভাগের প্রাক্তনী। ভূভারতের শিক্ষিত সমাজ এই বিভাগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের সকলের অবদান আলোচনা করতে গেলে একটি বৃহৎ প্রবন্ধ রচনা করতে হয়। তাঁদের প্রত্যেকের অবদান এই বিভাগকে তিলে তিলে ভারতের অগ্রণী অর্থনীতি বিভাগে পরিণত করেছে।

বিভাগে আজ ছাত্রের থেকে ছাত্রীসংখ্যা বেশি হওয়ার পিছনে হয়তো কোনও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। পঠন-পাঠন, গবেষণা, ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি— দেশের সব কটি রাজ্যস্তরের বিশ্ববিদ্যালয়কে ধরলে অর্থনীতি বিভাগের দৌড়ে আমরাই শীর্ষে আছি— নানা সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষায় তা জানা যায়। ন্যাক এবং ইউজিসি একে উপর দিকে রাখে। এই

বিভাগ থেকে পাশ করে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমন ছাত্রছাত্রীর দেখা পাওয়া ভার।

কম্পিউটার এবং অঙ্কের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার ছাড়া আজকের অর্থনীতি চর্চা অচল, এ ব্যাপারে এই বিভাগের সুনাম সর্বজনবিদিত। এ ব্যাপারে এতে কিছু মেধাবী ছাত্রছাত্রী আকৃষ্ট হয়, আবার কিছু পিছিয়েও যায়। তবে কিছুটা রাজনীতির চাপে, কিছুটা নিজেদের গরজেও ছাত্র সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে গুণমানের উপেক্ষা করতে হয়েছে— সেই পুরনো quality vs. quantity-র গল্প আর কি!

এই বিভাগের অন্তর্গত দুটি পৃথক গবেষণাকেন্দ্র— একটি নগর সংক্রান্ত (Centre for Urban Economic Studies) এবং অপরটি পরিবেশ সংক্রান্ত (DRS / DSA)— বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। এই বিভাগের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাই দেশের এবং বিদেশের নানা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত।

ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরির মতোই এমফিল ও পিএইচডি-র যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে এই বিভাগে। বরাবরই বিশ্বের ঘটনাবলীর সঙ্গে নিজেদের আপডেটেড রাখি আমরা। তাই মার্কসীয় অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্বায়ন চর্চাও বাদ যায় না এখানে আরও অনেক আধুনিক বিষয়ের মতোই। এখানকার লাইব্রেরি এবং কম্পিউটার ল্যাব অন্যান্য বিষয়ের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

এই সব কিছু নিয়েই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ এক একশত বছর পার হতে চলল। এক শতাব্দীর জয়যাত্রা বড় সহজ কথা নয়। হয়তো পুরনো সুনাম কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে কালের নিয়মে। আজ অনেক ছাত্রছাত্রীই কলকাতার কলেজ থেকে পাশ করে চলে যায় স্নাতকোত্তরের জন্য রাজ্যের বাইরে— ক্যারিয়ার, বিদেশযাত্রা ইত্যাদির তাগিদে।

ক্লাসে লেকচার, চক ডাস্টারে পড়া বোঝানো, বই-নোটস্-কার্বন কপির যুগ পেরিয়ে ফোটোকপির যুগও পার হয়ে এসেছি আমরা। ওভারহেড প্রোজেক্টারও নয়, পাওয়ার পয়েন্টে স্লাইডে কিংবা ডিজিটাল বোর্ডে পড়ানো হয় আজকাল। ছেলেমেয়েরা একে অপরের নোটসের ছবি তোলে মোবাইল ক্যামেরায়, তোলে স্লাইডের ছবিও এবং প্রযুক্তির সাহায্যে তা ছড়িয়ে যায় মোবাইল থেকে মোবাইলে— এবং কম্পিউটার স্ক্রিনেও। নোটস নেওয়ার ঝামেলা নেই, বই-জার্নালের আর্টিকেল পড়ার দরকার নেই। লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরিতে বই সাজিয়ে বসে থাকেন কম্পিউটারাইজড ক্যাটালগ নিয়ে—

'ফুট ফল?' শূন্য! ওয়েবসাইট আছে, ই-জার্নাল, ই-বুক..., আরও কত কী! এই লাইব্রেরি কিন্তু কাঁটাকলের একটি গর্বের ব্যাপার। প্রযুক্তি এসে কেড়ে নিল না তো তারুণ্যের জোর আর মেধাশক্তি?

পরীক্ষার নীতিতেও বদল হয়েছে বারবার। সাবেকী দু' বছরের পঠনপাঠনের কোর্সের শেষে এমএ পরীক্ষার যুগ পেরিয়ে গেছে অনেক দিন। এ বিভাগে যখন সেমিস্টার সিস্টেম প্রথম চালু হয় ১৯৭০-এর দশকে, তখন দেশে খুব কম জায়গাতেই তা চালু ছিল। ২৫ বছর চলেছে, এক বছরের শেষে পার্ট-১ এবং দ্বিতীয় বছরের শেষে পার্ট-২। আবার ফিরে এসেছি আমরা সেমিস্টার সিস্টেমে। এতে ছাত্র ছাত্রীরা যেমন, শিক্ষক শিক্ষিকারাও তেমন পড়াশোনা, পরীক্ষা, খাতা দেখার চাপে ব্যস্ত থাকেন সর্বদা, গবেষণার কাজও চলতে থাকে নিরন্তর।

এত পথ পেরিয়ে এসেও ক্লান্তি স্পর্শ করেনি এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগকে— শতাব্দী পেরিয়েও জরাগ্রস্ত নয় সে। আধুনিকতার স্পর্শ গায়ে মেখে আজও সে নানা উদ্দীপনায় ভরিয়ে রাখে নিজেকে। আরও একশো বছর এই গৌরবের ঝুলি মাথায় নিয়ে ক্লান্তিবিহীন পথ হেঁটে যাবে এই বিভাগ— এ আমাদের সকলের কামনা।

কাঁটাকল ও আমি

স্বামী ত্যাগরূপানন্দ

কাঁটাকলের অর্থনীতি বিভাগে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএসসি পড়েছিলাম ১৯৮২-৮৪-র সালগুলিতে। পুরনো কলেজের তৃতীয় বর্ষে, বেশ কয়েকজন সহপাঠী অর্থনীতি থেকে সরে গিয়ে অন্য ক্ষেত্রে যাওয়ার পরীক্ষা দিল। আমরা পড়ে গেলাম দ্বিধায়। কিছুটা সাবেকী মূল্যবোধ ছিল আমাদের বাড়িতে, স্কুলেও পড়েছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনে। তাই অর্থনীতি একেবারে ছেড়ে দিয়ে অন্য দিকে যেতে ইচ্ছে হল না, কাঁটাকলে স্নাতকোত্তর পর্বের ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষা (আমাদের বেলায় হয়েছিল!) দিয়ে দিলাম। ভর্তির এই পরীক্ষায় সম্ভবত আমি প্রথম হয়েছিলাম, জানতে পেরে খুব আত্মবিশ্বাস বেড়েছিল। আমরা কয়েকজন প্রেসিডেন্সির মাধ্যমে এমএসসি-তে ভর্তির সুযোগ পেলাম। বলা বাহুল্য, কাঁটাকলের বাড়িতে, একই সঙ্গে আমাদেরও ক্লাস হত।

বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে পরিচয় হতে শুরু করল। সকলের নাম মনে করতে পারব কিনা জানি না, চেষ্টা করা যাক। রাখাল দত্ত, প্রবুদ্ধ রায়, অরূপ মল্লিক, বিপ্লব দাশগুপ্ত, অসীম দাশগুপ্ত, আশিস ব্যানার্জী, অজিত চৌধুরী, তমাল দত্ত চৌধুরী, শর্মিলা ব্যানার্জী— এঁনারা সকলে প্রথম বছরে পড়িয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পাঠ শুরুর কিছু দিন আগেই অনার্সের ফলাফল বেরিয়েছে। তখন মাথায় যেন অর্থনীতির তত্ত্ব গজগজ করছে, সেগুলি ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করি কাঁটাকলের শ্রেণীকক্ষে। এখানে আবার নির্দিষ্ট সিলেবাস কিছু নেই— ক্লাসের পড়ানো অনুসারে পরীক্ষার সিলেবাস তৈরি হবে। অনেক সময় টেক্সবুকও ঠিক মতো পাওয়া যায় না, ক্লাসের নোটস তাই ভীষণ জরুরি

ছাত্র: ১৯৮২-৮৪

ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মনে পড়ে অধ্যাপক অরূপ মল্লিক একবার আমার ক্লাসের খাতা চেয়ে নিয়েছিলেন; ক্লাসে তিনি কী পড়িয়েছিলেন তা ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য।

আমাদের সময়ে কাঁটাকলে, প্রথম বর্ষে, একটিই সেকশন ছিল, এখনকার মতো দু'টি সেকশনে ভাগ করা হত না। তখন বার্ষিক পরীক্ষা হত, প্রতি শিক্ষা বর্ষের শেষে। একটি মজার ঘটনা মনে পড়ে। কিছু দিন পরেই শিক্ষকরা হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার কথা বললেন, আমরাও সাগ্রহে রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু এক দিন ক্লাসের বিরতি (ইন্টারভেল)-এর সময় ইউনিয়নের দাদা-দিদিরা এসে হাজির হল; হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় যাতে আমরা রাজি না হই, সেই পরামর্শ তারা দিল। প্রথম বর্ষের আমরা সবাই একই শ্রেণীকক্ষে বসে রয়েছি, আমাদের সামনে বক্তৃতা করছে দাদা-দিদিরা। মনের থেকে তাদের এই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী কথায় সায় পাচ্ছি না। তবু কেউ প্রতিবাদ করছে না।

হঠাৎ করেই আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম, বলে উঠলাম— "কেন, একটা হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা হলে তো ভালই হয়। একেবারে বছরের শেষে পড়াশোনা করার চেয়ে, সালের মাঝখানেও তা হলেও খাতা উল্টে দেখার একটা তাগিদ থাকবে।" মনে কিছুটা ভয় ছিল; আলাদা হওয়ার ভয়, আর কী! কিন্তু আমার কথার পিঠেই তন্ময় (সে সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে এসেছিল) উঠে দাঁড়াল, সমর্থন করল আমার বক্তব্যকে। আমাদের পক্ষে আরও গলা শোনা গেল অন্য প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে থেকে।

দাদা-দিদিরা এইবারে পিছু হটলেন। শুভ চিন্তার কাছে পরাজয় হল ধ্বংসাত্মক চিন্তার। পরবর্তী সময়ে অনেকবার এই ঘটনার উল্লেখ করেছি বক্তৃতাদিতে। সব জায়গাতেই দেখা যায়— সাহস করে একজনও যদি একটা পদক্ষেপ নেয়, ক্রমে আরও মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। 'গীতা' বইতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন— 'স্বল্পম্ অপি অস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'— (কল্যাণকর) ধর্মের কিছুটা আচরণ করলেও, বিরাট ভয় থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

কাঁটাকলের এই চত্বরে হাজির হয়েছিল, স্নাতকোত্তর পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে, নানা কলেজে অনার্স পড়া ছাত্রছাত্রীরা। সেখানে রয়েছে একটি ছোট কমন রুম— তাতে আমরা টেবিল টেনিস, ক্যারাম খেলি। ক্যান্টিনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও মন্দ নয়। বিভাগের বাড়ির সামনে মাঠ নেই— তাই ফুটবল, ক্রিকেট

খেলা হয় সামনের রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। সেই মাঠে যেতে হলে একটা শর্ট কাট রয়েছে; দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে আমরা পৌঁছে যাই মাঠেতে। খেলাধুলোর সময় অবশ্য খুব বেশি পাওয়া যায় না, ক্লাসের পরেই বেশির ভাগ ছাত্রেরই বাড়ি ফেরার তাড়া থাকে। আমাদের মধ্যে কিছু ছেলেরা থাকের পাশের হোস্টেলে; তারা মাঠেতে খেলার বেশি সময় পায়। আমরা থাকি বেহালার কাছাকাছি নিউ আলিপুরে— বাসে করে যেতে দেড় ঘণ্টা, পৌনে দু' ঘণ্টা তো লেগেই যায়।

কাঁটাকলের সঙ্গে মূল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসের সামান্যই যোগাযোগ ছিল। মনে পড়ে, বিভাগের ক্যারাম প্রতিযোগিতায় আমি ও শ্যামলেন্দু (সে এখন এক কলেজের প্রিন্সিপাল) চ্যাম্পিয়ান হয়েছি। পুরস্কার বিতরণ ও সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে কলেজ স্ট্রীটে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে। কাঁটাকলের অনেক ছাত্রছাত্রী এতে যোগ দিয়েছিলাম। অনেকটা বেশি বয়েসে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্তবাবু আমাদের সঙ্গে অর্থনীতির ক্লাস করতেন। তাঁর স্ত্রী সেই দিনের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেছিলেন।

অর্থনীতি বিভাগের মাস্টরমশাইদের মধ্যে তখন একটা বামপন্থী মেজাজ ছিল। সেখানে তাই স্রাফা মডেল খুব খুঁটিয়ে পড়ানো হত। তুলনায় নিও-লিবারাল ইকোনমিক্স কিছুটা দুয়োরানীর মর্যাদা পেত। দ্বিতীয় বর্ষে উঠে আমরা এক-এক করে স্পেশাল পেপার বেছে নিলাম। মনে পড়ে, আমি দ্বিতীয় বছরে বেছে নিয়েছিলাম ইকোনমেট্রিক্স এবং ইকোনমিক্স অফ মার্কস। প্রথমটা বাছার পক্ষে কারণ, আমরা স্ট্যাটিসটিক্স বিষয়টা ভাল লাগত, ইকোনমেট্রিক্স পড়া বেশ ভাল বুঝতেও পারতাম। দ্বিতীয় বিষয়টা বাছার কারণ ছিল অদ্ভুত। সেই বছরই, প্রথমবার পড়ানো হল ইকোনমিক্স অফ মার্কস। যাঁরা পড়াবেন বলে জানলাম, তাঁদের আন্তরিক মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আমার কিন্তু কোনও বামপন্থী মানসিকতা ছিল না, প্রধানত একটি সৎ প্রচেষ্টাকে সফল করার তাগিদে বেছে নিলাম এই বিষয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় একজন অতিথি অধ্যাপকের কথা। সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোস্যাল সায়েন্সেস থেকে আসতেন ড. পার্থ চ্যাটার্জী। এত চমৎকার তিনি পড়াতেন যে, আমি পরে সেন্টার-এ গিয়ে বইপত্র ঘেঁটে সেই পড়াকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম।

এই দ্বিতীয় বছরে, ইকোনমেট্রিক্স পড়ানোর ক্ষেত্রে পেয়েছিলাম বৎসলা মুখার্জী, রবীন মুখার্জী, পবিত্র গিরিকে। বৎসলা মুখার্জী আদতে দক্ষিণ

ভারতীয়— একেবারে তদ্‌গতভাবে তিনি পড়াতেন, যেন ডুবে যেতেন মার্কভ চেন, প্রোবাবিলিটি থিওরি ইত্যাদির আলোচনায়। এর ফল— আমি ডিজার্টেশন করার জন্য বেছে নিয়েছিলাম, তাঁর নির্দেশনায় মেজারমেন্ট অফ ইনইকুয়ালিটি। আরও পরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করার সময় এই আলোচনাকে আরও বিস্তৃত করার চেষ্টা করেছিলাম।

স্নাতকোত্তর স্তরে পৌঁছে গিয়ে ছাত্রের একটি পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়। স্নাতক পর্যায়ের মতো পাস সাবজেক্ট আর পড়তে হয় না; সম্পূর্ণ পড়াশোনা তাই একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হয়। এই পর্যায়তেই একটি ছাত্র ইকোনমিক্স বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করে, ক্রমে সেটি তার সত্তার একটি অংশ হয়ে যায়। বিশেষ করে স্নাতকোত্তরের দ্বিতীয় বছরে, স্পেশালাইজেশনের সময়ে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও কমে যায়। গভীরভাবে অধ্যয়ন হয় এই সময়ে, বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে ওঠে।

আমার ক্ষেত্রে কাঁটাকলের বিভাগের সঙ্গে সংযোগ স্নাতকোত্তর পরীক্ষা পাস করে যাওয়ার পরেও থেকেছে। এমএসসি-র ফলাফল বেরোনোর পরে পরেই, ব্রহ্মচারী হিসেবে যোগদান করেছিলাম রামকৃষ্ণ মিশনে। কিন্তু এর পরেও, অর্থনীতি থেকে আমি সরে আসতে পারিনি। মিশনের একটি কলেজ, 'বিদ্যামন্দির'-এ কাজের দায়িত্ব পড়ল। কলেজটিতে অর্থনীতি অনার্স পড়ানো হয়, আমিও সেখানে ছাত্রদের পড়াতে শুরু করলাম। মিশন থেকে এরপর বলা হল গবেষণার কাজ করতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সুবিধার্থে। আমার মনের কোথাও একটা লুকনো ইচ্ছে ছিল। এই সুযোগে তাই কাঁটাকলে, অর্থনীতি চর্চার মাঝে আবার এসে হাজির হলাম। তখন সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরে থাকি। এটাই তখন পোশাক, মিশনের নিয়ম অনুসারে। পুরনো শিক্ষকরা (কাঁটাকলের) অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন, এই ব্রহ্মচারীর পোশাক দেখে। কেউ বা জিজ্ঞেসই করে ফেললেন— "মিশনে কাজ করতে গিয়ে আবার গবেষণা করার কী দরকার?" আমতা-আমতা করে তখন উত্তর দিলাম।

এরও পরে, বেলুড় বিদ্যামন্দির কলেজে অর্থনীতি পড়ানোর সময়, কাঁটাকলে রিফ্রেসার কোর্স করতে গিয়েছি। আবার দেখা হয়েছে পুরনো শিক্ষকদের সঙ্গে। কিছুটা বয়েস বেড়েছে তত দিনে। নানা ধরনের মতামত দিয়েছি তখন, ধৈর্য ধরে অধ্যাপকরা সেগুলি শুনেছেন। অধ্যাপক কল্যাণ

সান্যাল আমার কয়েক বছর আগে নরেন্দ্রপুর স্কুল থেকে পাস করেছিলেন। তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম এই সময়ে, নানা কথা হয়েছে তাঁর পরিবারের সভ্যদের সঙ্গে।

যখন অর্থনীতি পড়তে শুরু করেছিলাম, তখন খুব হিসেব করে তা করা হয়নি। তারপরে কত বছর কেটে গেছে! আজ মিশনের একটি স্কুলে, দেওঘরে, কাজ করছি। এখানেও কিন্তু ইকোনমিক্স-এর ক্লাস নিই, সিবিএসই-র পাঠ্যসূচি অনুযায়ী। কোথায় যেন মনের গভীরে ঢুকে গেছে এই বিষয়— সেখানে রয়েছে এর তত্ত্বগুলি এবং পুরনো বন্ধু ও অধ্যাপকরা। নৈর্ব্যক্তিক একটি বিষয়, মানুষের স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। কখনও দূরে দেশে দেখা হয়েছে অচেনা লোকের সঙ্গে। যখন জেনেছি যে, তিনি কাঁটাকলে পড়েছেন, তখন সাগ্রহে কথা বলেছি তাঁর সঙ্গে, ঝালিয়ে নিয়েছি পুরনো সংযোগ। সন্ন্যাসী হয়েও তাই অর্থনীতি পড়ার এই 'বন্ধন'কে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছি, জ্ঞানচর্চার এই ক্ষেত্রকে সম্মান জানিয়েছি।

আমাদের থাকাকালীন বিভাগের একটি বড় গোছের আলোচনা সভার আয়োজন হয়। উপলক্ষ্য মনে নেই, হয়তো বিভাগের স্বর্ণজয়ন্তী। তখন দেশের অনেক বিখ্যাত অর্থনীতিবিদদের বক্তৃতা প্রথম শুনি। তাঁদের মধ্যে অমিয় দাশগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, ব্রহ্মানন্দ, বি আর লেনয় ছিলেন।...

কাঁটাকলে পড়াশোনার সাথে অনেক আনন্দের যোগান ছিল। আমরা নিজেরা একবার কোনও কনফারেন্সের শেষে একটা রেডিও প্লে করেছিলাম। আমার কাজ ছিল গান গাওয়া। বিভাগের কর্মচারী 'শান্তিরাম' সদাই চা এবং অন্যান্য রসদ যোগাতো। সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন মঞ্জুলা বসু, এনা সেন, অজিত দাশগুপ্ত, অমিতাভ সেন, স্তুতি, অল্প দিনের জন্য অর্জুন সেনগুপ্ত।

সব মিলিয়ে কাঁটাকলের স্মৃতি আজও নাড়া দেয়। সেটা কি জীবনের প্রথম ভাগ এই জন্য?

সুনন্দা সেন (১৯৫৫-৫৭)
বিটি রোড অর্থনীতি বিভাগের নতুন অধ্যায় ১৯৬০-৬২,
অর্থনীতি কথা, ২০১০, পৃ. ১২

কাঁটাকলের (অন্য) অর্থনীতি

অচিরাংশু আচার্য

সালটা ১৯৯৭। প্রত্যেক বছরের মত সে বছরও কলকাতা বইমেলা শুরু হল ময়দানে (সে সময়ে বইমেলা কলকাতা ময়দানে হত। পরে হাইকোর্ট তা বন্ধ করে দেওয়ায় মেলা প্রথমে কয়েক বছরের জন্য সল্টলেক স্টেডিয়ামে আয়োজিত হয় এবং আরও পরে, আবারও আদালতের হস্তক্ষেপে, মিলন মেলা প্রাঙ্গণে পাকাপাকিভাবে স্থান পায়)। আমি তখন সদ্য অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের স্নাতকোত্তর পাঠক্রমে ভর্তি হয়েছি। স্নাতকোত্তর বিভাগটি উত্তর কলকাতার সিঁথির কাছে। বাসে চাপলে বলতে হত 'কাঁটাকলে' নামব। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর অর্থনীতি বিভাগকে লোকে 'কাঁটাকল' বলেই চেনে। শুরুর দিকে একদিন বাসের খালাসিকে বলছি 'কাঁটাকলে' নামিয়ে দেওয়ার জন্যে, হঠাৎ পাশে বসা এক বয়স্ক ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ওটা কাঁটাকল নয় 'জাঁতাকল'। একবার ঢুকলে মগজ ধোলাই করে ছাড়বে। তখন আমি সদ্য প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছি। ভদ্রলোকের কথা শুনে মজা ও কৌতূহল, দুইই হল।

যাই হোক, ফিরে আসি সেই ১৯৯৭-এর বইমেলার কথায়। সে বছর প্রথম কলকাতা বইমেলায় একটি বিদেশি রাষ্ট্র 'ফ্রান্স'-কে থিম করা হল। বইমেলা উদ্বোধন করতে এলেন প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক জাঁক দেরিদা। কাঁটাকলে তখন খুব হইচই কারণ 'জাঁক দেরিদা' আসা মানে একরকম কার্ল মার্কসের উত্তরসূরী আসা। অধ্যাপক কল্যাণ সান্যালকে মজার ছলে বলতে শুনলাম, 'বড় দেরি করে এলে দেরিদাদা।' এর আগে 'construction' শব্দটা শুনেছি, কিন্তু

ছাত্র: ১৯৯৭-৯৯

'deconstruction' শব্দটা শোনা ছিল না। যখন কাঁটাকলের দোতলায় 'deconstruction' শব্দটা প্রায়ই শুনলাম, ভাবলাম একবার অভিধানটা দেখি। দেখলাম 'deconstruction' কথাটার মানে হল 'simultaneous affirmation and undoing' অথবা 'to deconstruct constructively'.

আরও জানলাম যে 'deconstruction' কথাটা হাইডেগার-এর 'Destruktion' থেকে জাঁক দেরিদা নিয়ে এসেছেন। আমরা প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা এসব শুনে তো অথৈ জলে। অধ্যাপক অজিত চৌধুরী তখন 'আন্দ্রেই তারকভস্কির' বিখ্যাত সিনেমা 'Stalker' দিয়ে আমাদের 'deconstruction' বোঝানোর চেষ্টা করলেন। 'Stalker'-এর 'S'-টা বাদ দিলে হয়ে যায় 'Talker' এবং মানেটা পাল্টে যায়। উনি বোর্ডে একটি বাক্য লিখলেন—

Sorry for the Inconvenience.

তারপর In শব্দটিকে bracket-এ করে দিলেন, ফলে বাক্যটি হল—

Sorry for the (In)Convenience.

এই সব দেখে শুনে মনে হল অর্থনীতি— রাজনীতি— দর্শনশাস্ত্র সব মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ এক রোমাঞ্চ রহস্য পরিবেশে এসে পড়েছি। এই নয় যে তা খারাপ লেগেছিল। বরঞ্চ বেশ উপভোগই করেছিলাম। সে সময় সিনিয়র দাদাদের কাছে শুনতাম 'কাঁটাকলের' অনেক অধ্যাপক মিলে এক সময় 'হেগেল ক্লাব' নামে একটি ক্লাব খুলেছিলেন। প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অজিত চৌধুরী, অরূপ মল্লিক ও কল্যাণ সান্যাল। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এই ক্লাবের সদস্য ছিল। সেই ক্লাবে নিয়মিত হেগেল, কান্ট, দেরিদা ইত্যাদিদের দর্শন নিয়ে আলোচনা হত। কলকাতায় দেরিদা আসার উপলক্ষে কাঁটাকল থেকে তাঁকে নিয়ে একটি ছোট পুস্তিকাও প্রকাশিত হল, যার নাম 'In Honour of Jacques Derrida'।

এ সবের মধ্যেও কিন্তু আমাদের ক্লাস হত নিয়মিত— সোমবার থেকে শুক্রবার এগারোটা থেকে সাড়ে তিনটে। অনেক সময় মনে হত আবার যেন স্কুলে ফিরে এসেছি। স্কুলের কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির স্নাতকোত্তর বিভাগকে একটা সময় 'দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স'-এর ধাঁচে 'কলকাতা স্কুল অফ ইকনমিক্স' করার পরিকল্পনা ছিল। কোনও অজানা কারণে সেটা আর হয়নি, তবে হতেই পারত। আমি যে সময়ে কাঁটাকলে পড়েছি সে সময় কাঁটাকল 'দিল্লি স্কুল অফ ইকনমিক্স'-এর

থেকে কোনও অংশে কম যায় না। এখনও আমার মনে হয় সে সময় ছাত্র হিসেবে আমি সত্যিই ভাগ্যবান ছিলাম। সবচেয়ে যেটা ভাল লাগত, অধিকাংশ মাস্টারমশাই আমাদের সাথে বন্ধুর মত মিশতেন। যেমন কল্যাণ সান্যাল। একবার এক ছাত্র মদ্যপান করে ক্লাসে এসে ধরা পড়ল। সে তো বেশ হই চই ব্যাপার। কল্যাণ সান্যাল তখন বিভাগীয় প্রধান। তাকে বিষয়টি জানানো হল। উনি জানতে চাইলেন ছেলেটি মদ্যপান করে কোনও অসভ্যতামী বা কারও শ্লীলতাহানি করেছে কি না। তাকে জানানো হল যে না, সেরকম কিছু করেনি, শুধু মদ্যপান করেই এসেছে। কল্যাণ সান্যাল খুব রেগে গিয়ে বললেন, 'তা হলে ওকে ছেড়ে দাও। এই বয়সে ও তো আর দুধ খেয়ে ক্লাস করতে আসবে না।'

সে সময় এল-পি-জি কথাটা খুব চলত। আমাদের অধ্যাপক বিপ্লব দাশগুপ্ত ভারতীয় অর্থনীতি নিয়ে পড়াতেন। ১৯৯১ থেকে মনমোহন সিংহ অর্থনৈতিক উদারীকরণের পথে হাঁটছেন। নতুন নতুন গাড়ি, টিভি চ্যানেল বাজারে আসছে। তখন লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন ও গ্লোবালাইজেশন, যাকে ছোট করে এলপিজি বলা হত, তার খুব চর্চা হচ্ছে। বিপ্লব দাশগুপ্ত, যিনি আমাদের মাস্টারমশাই ছাড়াও রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া (মার্কসিস্ট)-এর পলিটব্যুরো সদস্য ছিলেন, তিনি বলতেন এলপিজি-র আসল মানে হল 'Gas' (সত্যিই এলপিজি মানে Liquid-Petroleum-Gas)। ওনার কাছে এই উদারীকরণ ছিল সামাজিক অবক্ষয়ের পথ অবলম্বন। উনি দুঃখ করে আমাদের বলতেন, 'জানো, আগে গ্রামে গেলে ডাব খাওয়াতো। এখন ডাবের বদলে পেপসি দেয়।'

আমরা ঠিক করলাম 'গ্লোবালাইজেশন' নিয়ে একটা সেমিনার করবো। ফ্রি ট্রেড নিয়ে যে সব অধ্যাপকরা গবেষণারত, তাদের মধ্যে স্বনামধন্য, চারজনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে ঠিক হল। কল্যাণ সান্যালকে সেই চারজনের নাম বলাতে উনি বললেন, 'এ কি করেছ। এ যে সবাই পুরুষ দেখছি। ব্যাপারটা খুব বোরিং হয়ে যাবে। কোনও মহিলা গবেষককে আনো। ফ্রি ট্রেডটা জমবে ভাল।' এরকম এক খোলামেলা পরিবেশে আমরা কাঁটাকলে পড়াশোনা করেছি। এর ব্যতিক্রমও ছিল। অনেক মাস্টারমশাই-ই একটু দূরত্ব রেখে চলত। এক্ষেত্রে অরূপ মল্লিকের কথা বলতেই হয়। আমার দেখা একজন অসাধারণ শিক্ষক। কিন্তু অসম্ভব গম্ভীর। আমি কাঁটাকলে ভর্তি হওয়ার সময় এক সিনিয়র দাদা সাবধান করে বলেছিল, বাংলার বাঘ যদি হয় আশুতোষ মুখার্জী,

কাঁটাকলের বাঘ হল অরূপ মল্লিক। তা সেই সতর্কবাণী মিলে গেছিল। উনি যখন ক্লাস নিতেন মনে হত বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল পান করছি। আর পড়াতেনও বাঘের মতনই। ক্লাসে একটি কি দুটি চক-পেন্সিল নিয়ে ঢুকতেন। যখন ক্লাস থেকে বেরতেন, মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতাম।

১৯৯৮ সালে অমর্ত্য সেন অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেলেন। আমরা অর্থনীতির ছাত্ররা বাঙালি হিসেবে উৎসবে মাতলাম। অমর্ত্য সেনের নানা ছবি কেটে বাড়ির দেওয়ালে বহুদিন সেঁটে রেখেছিলাম। সে সময়কার কোনও এক কাগজের হেডলাইন ছিল 'মর্তের সেরা সম্মান অমর্ত্যের'। তা সেই নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন পুরস্কার পাওয়ার পর প্রথম কলকাতায় পা রাখলেন। পশ্চিমবঙ্গের তখনকার অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক অসীম দাশগুপ্ত তখন কাঁটাকলে আমাদের গ্রোথ থিয়োরি পড়াতেন। ওনার সাথে অমর্ত্য সেনের ভাল সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে কলকাতায় এসে অমর্ত্য সেন কাঁটাকলে প্রথম বক্তৃতা দিতে এলেন। সেমিনার হল খুব বড় ছিল না, তাই সব ছাত্রছাত্রীদের জায়গা হল না। ঠিক হল চিরকুট বানিয়ে লটারি করা হবে। যারা ভাগ্যবান একমাত্র তারাই অমর্ত্য সেনকে দেখতে পাবে। আমি সেই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন ছিলাম।

অমর্ত্য সেন প্রচুর পুলিস সহ কাঁটাকলে ঢুকলেন। চারি দিকে সাংবাদিকদের ভিড়। কাঁটাকলের আশেপাশের সমস্ত ছাদ ও বারান্দায় মানুষের ভিড় অমর্ত্য সেনকে চাক্ষুস একবার দেখবার জন্যে। অমর্ত্য সেন তখন প্রকৃত অর্থেই একজন তারকা। যাই হোক, উনি ঢুকেই একটা চক-পেন্সিল নিয়ে মাইক্রোইকনমিক্স ও ইউটিলিটি থিয়োরির কোথায়-কোথায় খামতি এবং কিভাবে সামাজিক চয়ন বা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার বিষয়টি তৈরি হল (যার জন্যে উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন) তা খুব সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করলেন। কারও বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না।

আমি যে দু' বছর কাঁটাকলে পড়েছি (১৯৯৭-১৯৯৯), সে সময়ে ভারতবর্ষে উদার অর্থনীতি কায়েম হয়েছে। ১৯৯১-তে যে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছিল তা আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। সোভিয়েত রাশিয়া বহু দিন হল ভেঙে পড়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও কাঁটাকল তখনও সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী। ধনতন্ত্রের তারা ঘোরতর বিরোধী।

সবচেয়ে মজার বিষয় হল পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অধ্যাপক অসীম দাশগুপ্ত সে সময় নিয়মিত আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বা গ্রোথ ইকনমিক্স পড়াতেন, যদিও ব্যক্তিগতভাবে উনি অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্কে খুব

একটা বিশ্বাসী ছিলেন না। তাই হয়ত পশ্চিমবঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন দুটিই নব্বইয়ের দশকে অনেকটা কমে গেছিল।

নানা অভিজ্ঞতা মিলিয়ে আমাদের অনেকেরই মনে হত আমরা এক অন্য অর্থনীতি পড়ছি যা mainstream অর্থনীতি থেকে ভিন্ন। ভারতবর্ষের ভিতরে যখন অর্থনৈতিক উদারিকরণ, বিশ্বায়ন ইত্যাদি ঘটনা ঘটছে, সোভিয়েত রাশিয়া বহু দিন হল ভেঙে পড়েছে, কাঁটাকলের অর্থনীতি তখনও মার্কসিজম-সোস্যালিজমের ধারণা থেকে সরে আসেনি। তারা তাদের মত করে নিজস্ব এক (-ইজম)-এ বিশ্বাস রেখেছে। এই লেখার শিরোনাম এই কারণেই আমি রেখেছি— কাঁটাকলের (অন্য) অর্থনীতি। তবে এর ফলে কাঁটাকলের অর্থনীতি বিভাগের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছিল। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অর্থনীতির অধ্যাপককে 'কাঁটাকল' সম্পর্কে বলায় ওনার উক্তি ছিল, 'oh Kantakol!! It's different!' অবশ্য এর মানে এই নয় যে কাঁটাকল ভিন্ন ছিল বলে পিছিয়ে ছিল। একটা উদাহরণ দিই। আমি কাঁটাকলে ছাত্র থাকাকালীন পরিবেশ ও অর্থনীতি নিয়ে প্রথম একটি কোর্স চালু হয়, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় 'Environmental and Natural Resource Economics'। এই কোর্সটি তখন সদ্য ভারতবর্ষের কিছু সীমিত বিশ্ববিদ্যারয়ে পঠিত হত। অধ্যাপিকা শর্মিলা ব্যানার্জী ও কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই কোর্সটি কাঁটাকলে চালু করেন। আমি এবং আমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলাম এই কোর্সটির প্রথম ছাত্র। আমাদের মধ্যে অনেকে পরিবেশের অর্থনীতি নিয়ে পরে উচ্চতর গবেষণা করে সফলতা পেয়েছে।

কাঁটাকলের শিক্ষকরা ক্লাসে সোস্যালিজম চর্চা করলেও ক্লাসের বাইরে একটা লিবারালিজমের পরিবেশ ছিল। আমরা ছিলাম খুবই স্বাধীন। আর এই স্বাধীনতার কথা বলতে গেলে বাসুদার ক্যান্টিনের কথা বলতেই হয়। একতলার বাসুদার ক্যান্টিন ছিল এক অপার স্বাধীনতার জায়গা। ছাত্রীরা এখানে ধূমপান করত ছাত্রদের থেকে বেশি।

প্রচুর ছাত্রছাত্রীর প্রেম এবং পরবর্তীকালে বিবাহ ও সংসার বাসুদার ক্যান্টিন থেকেই শুরু। সর্বপরি বাসুদার ক্যান্টিনে যে কেউ যখন খুশি প্রবেশ করতে পারত এবং সবরকম আলোচনাই ক্যান্টিনে চলত। তাই আমাদের অনেকটা সময় ক্যান্টিনেই কেটে যেত।

আরও একটা জায়গার কথা এখানে বলা দরকার, সেটা হল 'ছাদে ওঠার

সিড়ি'। যাদের প্রেমের সম্পর্কটা দৈহিক বা জৈবিক স্তরে পৌঁছে গেছিল, তাদের জন্যে ওই সিড়িটি ছিল খুব আকর্ষণীয় একটি স্থান কারণ ছাদ সবসময় বন্ধ থাকত আর নীচ থেকে সিড়ি দিয়ে কেউ উঠলে দেখা যেত। ফলে জায়গাটা ছিল যাকে বলে 'সেফ'।

প্রথম দিকে যখন এসব জানতাম না একবার সিড়ি দিয়ে উঠে পড়েছিলাম। আমারই দুই বন্ধু-বান্ধবী এত 'ব্যস্ত' ছিল যে কেউ সিড়ি দিয়ে উঠছে কি না খেয়াল করেনি। সিড়িতে উঠে পরিস্থিতি দেখে যে দ্রুততার সঙ্গে আমি নেমেছিলাম ওরকম দ্রুততার সঙ্গে আর কোথাও কোনও দিনও নামিনি।

এতসব স্বাধীনতার মধ্যেও আমাদের মাস্টারমশাইদের প্রতি আমাদের ভীষণ সভ্রম ও শ্রদ্ধা ছিল। মনে পরে উল্টোডাঙা থেকে ২০১ নম্বর বাসে চেপে কাঁটাকল যাচ্ছি, দেখি আমার দুই মাস্টারমশাই কল্যাণ সান্যাল (যাকে আমরা আর কোনও দিনই পাব না) আর সৌমেন সিকদার ভিড় বাসে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি জায়গা পেলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছি, যদিও তারা বসতে চাইতেন না। কিন্তু অনেক অনুরোধে শেষমেষ রাজি হতেন বসতে। এরকমই কাঁটাকলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্ক ছিল। মাস্টারমশাইরা ছিলেন সরল, সাধাসিধে আর ছাত্র দরদী আর আমাদের ছিল তাদের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা। আজ আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই। কোথায় মনে হয় যেন সেই শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কটা আর কোনও দিনও ফিরে আসবে না।

কাঁটাকলের সেকাল

অনিশ মুখোপাধ্যায়

এমারেল্ড বাওয়ার বা মরকতকুঞ্জ ছিল এক বিস্তীর্ণ রাজকীয় বাগানবাড়ি যা ইউরোপীয়দের মুগ্ধ করেছিল। স্বাধীনতার পর সরকার এই সম্পত্তি অধিগ্রহণ করেন এবং কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এখানে জায়গা করে দেন। এরই এক খণ্ড প্রান্তিক জমিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ উঠে আসে— খাতায়-কলমে 'বি টি রোড ক্যাম্পাস'। সেই হিসাবে এই ক্যাম্পাসে কালানুক্রমে প্রথম এক দশকের মধ্যেই আমাদের ব্যাচ। ওই সময় মরকতকুঞ্জের চৌহদ্দীতে আর ছিল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, যেটি এখন জোকায় স্থানান্তরিত, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যেটি এখন কাঁকুড়গাছিতে, আরও একটি কারিগরী প্রতিষ্ঠান।

কলেজে পড়বার সময় শুনতাম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ বরাহনগরে। ১৯৬৫ সালে সেপ্টেম্বরের গোড়ায় এই বিভাগে প্রবেশের জন্য বাস থেকে নামতে হল বি টি রোডের ধারে 'কাঁটাকল' বাস স্টপে। রাস্তার অপর পারে এক দাঁড়িপাল্লার কাঁটা প্রস্তুতকারক কারখানার নাম অনুসারে বাস স্টপের নাম। আমরা প্রথম দিকে বলতাম শুধুই 'ডিপার্টমেন্ট'। কিন্তু আমাদের আগের ব্যাচের ছাত্রছাত্রীরা রসিকতা করে নাম দিয়েছিল 'কাঁটাকল স্কুল অব ইকনমিক্স'। কালক্রমে যুগের রীতি মেনে মেদ ঝরিয়ে সেই নাম এখন শুধুই 'কাঁটাকল' হয়ে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, যদিও কারখানাটি সেই কবেই উঠে গেছে।

প্রথম দিন কাঁটাকল ক্যাম্পাসে ঢোকবার সময় অপ্রশস্ত গলিপথটি মনে একটু বিরূপতার সৃষ্টিই করেছিল। কিন্তু অচিরেই এই বিভাগের একান্ত ঘরোয়া

ছাত্র: ১৯৬৫-৬৭

পরিবেশ আমায় মুগ্ধ করেছিল, কারণ কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসের সরগরম পরিবেশ থেকে এটা ছিল একেবারে আলাদা। কলেজ স্ট্রীটের ছাত্ররা আমাদের বলত এক ঘরে, আমরা বলতাম, তোরা আমাদের হিংসে করিস। কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসে অবশ্য আমরা ঘন ঘনই যেতাম, সেটা অন্য তাগিদে; কলেজ স্ট্রীটে সমকালীন জীবনের উত্তাপটা তো বেশিই ছিল। তাছাড়া এমন অনেক আয়োজন কলেজ স্ট্রীটে মিলত যা কাঁটাকলের পরিসরে সম্ভব ছিল না। যেমন 'সুবর্ণরেখা' মুক্তির পর ঋত্বিক ঘটক এসেছিলেন ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করতে। দ্বারভাঙা হলে তিল ধারণের জায়গা ছিল না; সেই ভিড়ে আমরাও অনেকে মিশে ছিলাম অনেক আগ্রহ নিয়ে। ১৯৬৫-তে ভর্তি হলে তখনকার শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের এমএ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল; কিন্তু নানা ডামাডোলে পরীক্ষা পিছিয়ে যায় ১৯৬৮-র সেপ্টেম্বর মাসে পুজোর ছুটির আগে। তাই আমরা অনেকটা বেশি সময় স্নাতকোত্তর ছাত্রের তকমা গায়ে রাখতে পেরেছিলাম। অন্য দিকে আমরা গুটি পাঁচেক বালক ১৯৬৫-র সেপ্টেম্বরেই হোস্টেলে জায়গা পেয়ে যাই, আমাদের ব্যাচের অন্যান্যরা হোস্টেলে এসেছিল ডিসেম্বরে ১৯৬৫ সালের এমএ পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর। আগে হোস্টেলে আসবার সূত্রে আমাদের দু ব্যাচ আগেকার অলকদাদের (অধ্যাপক অলক রায়) সঙ্গেও সখ্যতা তৈরি হয়ে যায়। কাজেই আমরা ছিলাম পর পর চারটি ব্যাচের যোগসূত্র, যে চারটি বছর আবার পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে এক টার্নিং পয়েন্ট— বেশি দিন ছাত্র থাকবার সুবাদে আমাদের অভিজ্ঞতার ঝুলিও বেশ ভারি।

আমরা আবার এমন এক ব্যাচ যাদের গর্বের বিষয় হল, ছাত্র থাকাকালীন বিভাগীয় প্রধান হিসাবে পেয়েছিলাম ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেনকে, আবার আমাদের এমএ সার্টিফিকেটেও তাঁরই স্বাক্ষর, কারণ তত দিনে তিনি উপাচার্য। অমন ছাত্রবৎসল সদাশিব সর্বজনপ্রিয় শিক্ষা-প্রশাসকের বোধহয় জুড়ি নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর সেন বলতে একজনকেই বোঝাত। কাঁটাকলে সকল ছাত্র ও শিক্ষাকর্মীই অবাধে ও অকপটে মনের কথা তাঁর কাছে বলতে পারতো; আমরা তো অনেক সময় প্রায় আবদারই করতাম। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য অফিসটিও ছিল যথেষ্ট দক্ষ। শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক জে কে মিত্র ছিলেন তুলনায় প্রবীণ; কিন্তু সন্তোষ ভট্টাচার্য, অম্লান দত্ত, অলক ঘোষ, রাখাল দত্ত, অজিন সেনগুপ্ত প্রমুখ সকরেই তখন তরুণ। নজরকাড়া ব্যক্তিত্ব ও চালচলন ছিল সন্তোষবাবুর— ছাত্রদের বড় কাছের মানুষ, বেশ কিছু পরে

জেনেছি ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকার কথা, জেল থেকে বিএ পরীক্ষা দেওয়ার কথা। সব শিক্ষকই ছাত্রদের সঙ্গে সংযোগে ছিলেন আন্তরিক, কিন্তু ছাত্রদের দিক দিয়ে চৌকাঠ ডিঙোবার সংকোচের তারতম্য ছিলই। সন্তোষবাবু যেমন ব্যক্তিত্ব বলে সমীহ আদায় করে নিতেন তেমনি ছাত্র দরদি মন নিয়ে তাদের প্রিয় হয়ে উঠেছিরেন, ছাত্রদের নানা কার্যকলাপে সহযোগিতা করতেন সক্রিয়ভাবে। কাঁটাকলের ওই একান্ত ঘরোয়া পরিবেশেও শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কে কখনই কোনও সাময়িক ভুল বোঝাবুঝি হয়নি তা নয়; ছাত্ররা অনুতপ্তও হয়েছি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। কাঁটাকলের সংসারে প্রকৃত 'যুব শিক্ষক' ছিলেন স্বপ্নাদি, অলকদা ও অসীমদা। অধ্যাপকদের অনেক পদ খালি থাকায়, শিক্ষার মানোন্নয়নে ডক্টর সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক ব্যবস্থা করেছিলেন; প্রত্যেক বছর পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করবে তাকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হবে; কিছু দিন পরে তিনি বিদেশ যাবেন উচ্চতর গবেষণার জন্য। সেই সূত্রেই এই ত্রয়ী। অসীমদা (দাশগুপ্ত) যখন ১৯৬৬ সালের পরীক্ষায় প্রথম হলেন, শিক্ষকও হলেন কাঁটাকলে, তখনও আমাদের পাঠ্যক্রম শেষ হয়নি, এ দিকে সন্তোষবাবু বিদেশ যাচ্ছেন বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে; অসীমদা আমাদের ঘাটতি পুষিয়ে দিতে এলেন— আমরাও চেনা বন্ধুকে শিক্ষকের ভূমিকায় পেয়ে গেলাম স্বল্পকালের জন্য। মনে রাখতে হবে ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ এই সময়টা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা কাঁটাকলে প্রবেশের সময় পাক-ভারত যুদ্ধ চলছে— চলছে যুদ্ধ নিয়ে দুই বিপরীত রাজনীতির দ্বন্দ্বও। তখন বামপন্থী দর্শনে নানা তারতম্যও নিত্য মাথা তুলে দাঁড়াত ও বিরোধের কারণ হয়ে উঠত; আবার ৪৮ ঘণ্টা বাংলা বনধের সেই যুগে গণআন্দোলনের ব্যাপকতা এক বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের গরিষ্ঠ অংশের কাছেই 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে' বড় কিছু ভূমিকা পালনের আবেগ আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না। ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের সময় কাঁটাকল থেকে এক মিছিল কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত পথ চলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সমাবেশে যোগ দিতে। বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের চারদিকে তখন হেলমেটধারী পুলিশে ছয়লাপ; ছাত্রদের কাছে বিপ্লবের ছবি যেন জীবন্ত; আবার সাগরপারে তখনই চলছে ভিয়েতনামের গণপ্রতিরোধ যুদ্ধ। আন্দোলনকারী ছাত্রদের একটা বড় প্রচার মাধ্যম ছিল পোস্টার। কিন্তু কাঁটাকলের দেওয়ালে কোনও পোস্টার সাঁটা হত না; ডক্টর সেন প্রথমেই ছাত্রদের বলে দিয়েছিলেন। ছাত্রদের দেওয়া হয়েছিল

স্ট্যান্ডের উপর একটি বোর্ড, ছাত্ররা তৈরি করে নিয়েছিল আরও একটি; সেখানেই লাগানো হত বিপ্লবের যত ইস্তাহার।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই কাঁটাকলের একান্ত নিজস্ব পরিবেশে আমাদের সময়ের ছাত্ররা কিছু অভূতপূর্ব কাজ করেছিল যার বোধহয় সেভাবে পুনরাবৃত্তি হয়নি কখনও। প্রথমটি হল পুনর্মিলন উৎসব— বিভাগীয় ভবনের ছাদের উপর প্যান্ডেল বেঁধে ১৯৬৬-তে। সমস্ত শিক্ষক এবং হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা-নিয়ামক) বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, অধ্যাপক অলক ঘোষ অসংখ্য প্রাক্তন ছাত্রের হদিস দিয়েছিলেন। তালিকা ভাগ করে আমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তাম নানা কলেজে, ব্যাঙ্কে, কর্পোরেট অফিসে বিলবই নিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করতে, তারপর আবার নানা ধাপে যোগাযোগ করতে হত একেবারে আমন্ত্রণ জানানো পর্যন্ত। উল্লেখযোগ্য হল ওই রিইউনিয়নে আমরা মঞ্চস্থ করেছিলাম গঙ্গাপদ বসুর লেখা নাটক 'নমোযন্ত্র', হোস্টেল সুপার অধ্যাপক অরুণ দত্তগুপ্ত ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গান করিয়েছিলেন, অরূপদা (মল্লিক) গান করেছিলেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে,— এমনই অনাবিল আনন্দের ধারা বয়েছিল ওই অনুষ্ঠানে। পরিণত সন্ধ্যায় শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সেন সহ শিক্ষকবৃন্দ।

দ্বিতীয়টি হল পত্রিকা প্রকাশ ১৯৬৭-তে; নামকরণ হয়েছিল 'অয়ন'; ছাত্রদের ব্যাপার বলে বিনা পারিশ্রমিকে এর প্রচ্ছদ করেছিলেন জোছন দস্তিদার। পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন ডক্টর সেন, উনি সুন্দর একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন; ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন অলক ঘোষ। এই পত্রিকাতে অসীমদা লিখেছিলেন 'A Note on Optimum Savings'; রামপ্রসাদ লিখেছিল 'Evolution of Values and Our Times'; রতন লিখেছিল 'Development of Capitalism in Indian Agriculture'; তাছাড়া ছিল ছাত্রদের লেখা আরও নানা প্রবন্ধ, রম্যরচনা, গল্প, কবিতা। এগুলি প্রকৃতই ছিল ছাত্রছাত্রীদের একান্ত নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ। ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদকের সমীক্ষাতে রতন অনেক বিষয়ের মধ্যে লিখেছিল,

"... প্রগতিশীল ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে কোনো দিনই আমরা সুলভ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দাবীকে সোচ্চার করে তুলবার কথা ভাবিনি।"

তবে সমকালের দাবি মেনে পত্রিকায় বারুদের অভাব ছিল না। যেমন তাপস রায়ের একটি কবিতা ছিল 'অর্যমা সকাশে ভ্রষ্টাচারী'। কবিতাটি শুরু

হয়েছিল এইরকম:

"অস্থির এ ঘূর্ণাবর্তে আমি চঞ্চল, উচ্ছ্বাসী"

আর শেষ হয়েছিল এই রকম:

"উত্তরের বন্ধ জানালাটা খুলে দাও
হিমালয় পারের হাওয়া আমায় উত্তাল করুক
'ইয়েনানের অতি বিপ্লবী বৃদ্ধের' কাছে বলতে দাও—
বারুদের গন্ধে আকাশ ভারী করার শপথ
ভুলিনি কমরেড।"

কিন্তু প্রকৃত বিস্ফোরণ 'অয়ন' ঘটিয়েছিল তার সর্বাঙ্গে নানা উদ্ধৃতিতে, যার মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র তেকে স্টালিন পর্যন্ত। তবুও পত্রিকাটিকে তৎকালীন ছাত্র-চেতনার ও বহুমুখী আগ্রহের এক ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে দেখা যায়।

তৃতীয় বিষয়টি ছিল প্রতাপ মেমোরিয়াল মঞ্চে এক বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান (১৯৬৭)। সাধারণভাবে কাঁটাকলে নবাগতদের জন্য স্বাগত অনুষ্ঠান বা বিদায়ী ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠান এসবই হত আমাদের সেমিনার হলে। কিন্তু প্রতাপ মেমোরিয়ালের অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছাড়াও ছিলেন দু' একজন আমন্ত্রিত বন্ধু, আর হয়েছিল থিয়েটার ওয়ার্কশপের একটি একাঙ্ক নাটক 'বেহায়া' (আন্তন চেখভের 'দ্য বেয়ার্ড' অবলম্বনে); চিন্ময় রায় ও মায়া ঘোষ এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ছিল অপরিসীম। ওই বছরই ভিয়েতনাম নিয়ে এক পোস্টার ড্রামাও অভিনীত হয়েছিল কাঁটাকলের সেমিনার হলে।

চতুর্থটি ছিল ছয়টি ছবি নিয়ে এক চলচ্চিত্র উৎসব (১৯৬৬)— স্থান সেমিনার হল— একটি বাংলা ছবি আর বাকিগুলি বিদেশি; বিভিন্ন কনসুলেট অফিস থেকে এই বিদেশি ছবিগুলি আনতে হত। বিদেশি ছবিগুলি ছিল ১৬ মিলিমিটারে আর বাংলা ছবিটি ৩৫ মিলিমিটারে; ফলে দুটি প্রোজেক্টর ভাড়া করতে হল; সে আমলে ডিজিটাল প্রোজেকশন তো কল্পবিজ্ঞানের ব্যাপার। বাংলা ছবির পরিবেশকের অফিস তেকে বা নানা কনসুলেট থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন সহ ছবির ক্যান বয়ে আনা ও ফেরৎ দেওয়া বড় সহজ কাজ ছিল না। এই উৎসবের প্রস্তাব দিয়েছিলেন আমাদের আগের ব্যাচের রজতদা (দাশগুপ্ত), আর আমরা অনেকেই তখন ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকায় চলচ্চিত্রের জন্য শ্রমদান ছিল এক কমিটমেন্টের ব্যাপার। চলচ্চিত্র

উৎসবটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মতোই সাড়া জাগানোয় আমাদের আত্মসন্তুষ্টির অন্ত ছিল না। অন্য বিভাগের বন্ধুরাও এসব অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হত।

বছরে একদিন অন্তত মরকতকুঞ্জে আমাদের ক্রিকেট খেলা হত। প্রাকটিস না থাকায় অল্পবিস্তর চোট জখম যে হত তা কাউকেই দমিয়ে রাখতে পারত না। যাঁরা অসীম দাশগুপ্তকে সুশিক্ষক হিসাবে চেনেন তাঁরা অনেকেই জানেন না অসীমদা ভাল ক্রিকেট খেলতেন। অরূপদা (মল্লিক) ছিলেন ক্রিকেটের পোকা; কিন্তু ব্যাট-বল নিয়ে মাঠে নেমেছেন বলে মনে পড়ে না।

কারও মনে হতেই পারে, কাঁটাকলের শ' আড়াই ছাত্রছাত্রী নিয়ে এত কর্মকাণ্ডের মূল রসদ কিভাবে পাওয়া যেত। এ ব্যাপারে আসল কৃতিত্ব রতনের। আমাদের কাঁটাকলে তখন অবিসংবাদিত ছাত্রনেতা রতন খাসনবিশ। ও কিভাবে যেন আবিষ্কার করে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের জন্য নির্ধারিত তহবিলে অর্থনীতি বিভাগের জন্য কিছু বকেয়া পাওনা আছে। আমরা সদলবলে রেজিস্ট্রারের কাছে দাবি পেশ করতে গেলাম, দু সপ্তাহের মধ্যে ছাত্র কল্যাণে আমাদের 'নিবেদিত প্রাণ' প্রমাণিত হল ডক্টর সেনের সহযোগিতায় এবং অর্থ মঞ্জুরও হল যা আমরা নানা উদ্যোগে ব্যবহার করে ডক্টর সেন ও রেজিস্ট্রার মহাশয়কে খুশি করতে পেরেছিলাম। তবে এই অনুদানের সঙ্গে দফায় দফায় আমরা যোগ করতে পেরেছিলাম মনীষা গ্রন্থালয়-এর মতো প্রকাশক/ পুস্তক বিক্রেতার বিজ্ঞাপন।

কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আমাদের আবেদন মঞ্জুর হওয়ায় কোনও কোনও সময় আমরা দাবি আরও প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা চালাতে লাগলাম। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ যেসব সাংস্কৃতিক হত না। সেবার (১৯৬৭) রাজাবাজার ক্যাম্পাসের লনে মঞ্চ বেঁধে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' অভিনীত হচ্ছে; কাঁটাকলের আমরা জনা বিশ-পঁচিশ গিয়ে হাজির হলাম, এবং বলা বাহুল্য তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হল প্রবেশ দ্বারে। কিন্তু আমাদের যুক্তি শেষ পর্যন্ত গ্রাহ্য হওয়ায় প্রবেশাধিকার পেতে অসুবিধা হল না।

সব শেষে ছাত্রাবাসের দু চার কথা। ঠিকানায় আমাদের হোস্টেলটি ছিল সাউথ সিঁথি রোডে, কিন্তু মরকুত কুঞ্জের লাগোয়া হওয়ায় হোস্টেলের পিছন দিক দিয়ে ঐতিহ্যবাহী এক টুকরো ঝিলের পাড় ধরে শুকনো পাত মাড়িয়ে ডিপার্টমেন্টে চলে যাওয়া যেত। বিভাগের আয়তনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চারতলা হোস্টেল বাড়িটি ছোট ছিল, কিন্তু কাঠামোটি এমন ছিল যে চার

দিকে ঘর আর মাঝখানে এক চত্বর উঠোন। ঠিক যেন পুরনো কলকাতার চকমেলান বাড়ির এক অ-বনেদি সংস্করণ। কোনও ঘরে দুজন আর কোনও ঘরে একক বসবাসের ব্যবস্থা। তখন দু বছরের শেষে একবারই পরীক্ষা, তাই ইচ্ছা করলেই আড্ডায় কালক্ষেপ করা চলত; ক্লাসরুম ছাড়া তিন তলায় কিছুটা ফাঁকা ছাদও রাখা ছিল বোধহয় এ কারণেই। এই হোস্টেল জীবনের প্রথম পর্যায়ে খুবই আকর্ষণীয় ছিল গ্র্যান্ড ফিস্টের এলাহি আয়োজ মাসের শেস ডিনারে আর ডিনারের শেষে ৫৫৫ ব্রান্ডের সিগারেট। কিন্তু অচিরেই খাদ্য সংকট আর বিদেশি গমের যুগ শুরু; আমাদের খাদ্য তালিকায় এল ব্যাপক পরিবর্তন— দিনে এক বাটি ভাত (অবশ্যই নিকৃষ্ট মানের) আর বাকিটা রুটি, রাত্রে কেবলই রুটি; গ্র্যান্ড ফিস্টের বিলাসিতা পরিত্যক্ত হওয়া ছিল অনিবার্য। নিজেদের খাওয়ার কষ্টের বোধ যতটা না ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি মায়া হত রাম ঠাকুর আর তার সহকারী রতিকান্তর জন্য— ছাত্র কর্মচারী মিলিয়ে যাট জনের দুবেলার আহার্য রুটি প্রস্তুতের কঠিন শ্রম সত্যিই করুণার উদ্রেক করত। এরই মাঝে এক দিন রাতে বেপরোয়া দুই আবাসিক বাজি ধরে আঠাশটি করে রুটি খেয়ে ফেললে রামঠাকুরের চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। খাদ্য সংকটের এমনতর প্রভাব কোনও গবেষকের বিশ্লেষণেই বোধহয় ধরা পড়েনি। তবে এই পর্বেও দীপ্তেনদা মেস ম্যানেজার হলে সপ্তাহে একদিন মটর ডাল ও পোস্তর বড়া মেনুতে আবশ্যিক ছিল।

ফাইনাল পরীক্ষার ছ' মাস আগে থেকেই ওই ব্যাচের কাউকে ম্যানেজার হতে হত না; তবে যারা পরীক্ষা দিতে যাবে তাদের যাত্রার সময় দইয়ের ফোঁটা পরানোর দায়িত্ব ছিল ম্যানেজারেরই, অন্যদের কাজ ছিল সমবেত উলুধ্বনিতে পাড়া মাত করে জানিয়ে দেওয়া যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষা শুরু হল। কারও কখনও অতিথি তো আবাসিকদের থাকতোই; তবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দুজনের কথা— স্বপন গুপ্ত ও অনুপ ঘোষালের কথা। স্বপন যখনই আসুক গানের আসর বসত। আমরা রাতের খাওয়া হোস্টেল সুপারের ঘর থেকে; অনেক সময় অধ্যাপক দত্তগুপ্ত নিজেও একটু ঘুরে যেতেন। অনুপদা ছিলেন দীপ্তেনদার বন্ধু। উনি এলেই যে গানের আসর বসত তেমন নয়, গান একটু-আধটু তো হতই। তবে একদিন নিশুতি মধ্যরাতে তিন তলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে অনুপদা ধরলেন ''ক্যায়সে কাটে রজনী''; চারদিক ঘেরা নিস্তব্ধ বাড়ির মাঝখানের চকে গানের ধ্বনিক্ষেপ এমন এক পরিমণ্ডল তৈরি করেছিল যার পর পনের মিনিট আমরা কেউই কথা বলিনি,

অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

কাঁটাকলের এই বর্ণময় জীবনে অর্থনীতি ও সমাজনীতি যেমন শিখেছি সমসাময়িক সমাজের উত্তাল ঢেউ তেমনই অনিবার্যভাবেই আছড়ে পড়েছিল আমাদের চেতনার তটে, যা আমাদের মননকে কোনও না কোনওভাবে সমৃদ্ধ করেছে নিশ্চয়ই। আমাদের সময়ের বন্ধুরা কেউ কেউ কৃতী অধ্যাপক হিসাবে দেশ বিদেশের বিশ্ববিদ্যারয়ের আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কেউ বা ব্যাঙ্ক-কর্পোরেট জগতে গিয়েছেন, কেউ বা গিয়েছেন প্রশাসনে; বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই শিক্ষকতার পেশাতেই যুক্ত হয়েছেন— আবার কেউ বা তুমুল বিপ্লবী পরিস্থিতিতে বাংলার যৌবনের উত্তরাধিকার নিয়ে মানুষের মধ্যেই হারিয়ে গিয়েছেন। এঁদের সকলের কাছেই কাঁটাকলের জীবনটা মূল্যবান সময়, সকলেই এই জীবনটার কাছে ঋণী নিশ্চয়ই।

> আর্থিক তত্ত্বের জগতে একটা উল্টো পরিবর্তন আসছিল। পঞ্চাশ-ষাট দশকের জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্ব, যার একটা তাৎপর্য ছিল এই যে, মুক্ত প্রতিযোগিতা থাকলে চরম দক্ষতায় পৌঁছন সম্ভব, একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেল। তার বদলে উঠে এল গেম থিয়োরি যার মূল বার্তা দুটি। এক, সবখোল চাবির মত কোনও সবখোল তত্ত্ব নেই যা দিয়ে একটা অর্থনীতির সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায়। বলা দরকার, জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম তত্ত্ব কিন্তু এইরকমই একটা সবখোল চাবির স্বপ্ন দেখেছিল। দুই, তাত্ত্বিকভাবে দেখান গেল আলাদা আলাদাভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে, অদক্ষ একটা অবস্থায় পৌঁছন শুধু যে সম্ভব তাই নয়, প্রায় অবশ্যম্ভাবী। দক্ষ অবস্থায় পৌঁছানর জন্য দরকার যৌথভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। তাছাড়া বাজার সম্বন্ধে অসমাপ্ত জ্ঞান থাকলে যে একটা অদক্ষতা জন্ম নিতে পারে সেটাও তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে মুক্ত বাজার অর্থনীতির তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে শুরু করল।
>
> অভিরূপ সরকার (১৯৭৫-৭৭)
> রাষ্ট্র, সমাজ ও উন্নয়ন: একটি ব্যক্তিগত পাদটীকা,
> *অর্থনীতি ভাবনা ভাবনায় পরিবর্তন*, ২০০৩, পৃ. ৩১-৩২

অর্থনীতির পঠন-পাঠন

বহ্নিবরণ ঘোষ

১৯৯৭-এর জানুয়ারি মাস। কয়েক দিন আগে প্রয়াত হয়েছেন অর্থনীতির কিংবদন্তী শিক্ষক ভবতোষ দত্ত। কলকাতার কাঁটাকলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে উপস্থিত ছিলাম সে দিন। অনেকেই স্মৃতিচারণ করেছিলেন, তবে মনে রয়ে গেছে সর্বজনশ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই প্রয়াত রাখাল দত্তের বলা গল্পটা।

স্নাতকোত্তর স্তরে রাখালবাবু তখন ভবতোষবাবুর ছাত্র। বিদেশে প্রকাশিত হয়েছে হ্যারড-এর Economic Growth-এর ধারণা সম্পর্কিত বইটি (নাম বলেননি তবে অনুমান করা যায় Towards a Dynamic Economics; 1948)। চারি দিকে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে সেই বই, কারণ তাতে রয়েছে যুদ্ধোত্তর যুগে উন্নয়ন ঘটাবার দিশা। রাখালবাবু এবং তাঁর সহপাঠীর গভীর কৌতূহল বইটি সম্পর্কে জানা। কিন্তু এ দেশে তখন তা পাওয়া যেমন দুষ্কর তেমনই তার মর্মোদ্ধার করার জন্যও চাই প্রস্তুতি। দুই কৌতূহলী ছাত্র মাস্টারমশাইয়ের স্মরণাপন্ন হলেন বইটি পড়িয়ে দেওয়ার জন্য। ভবতোষবাবু বললেন আগে তিনি বই যোগাড় করবেন, পড়বেন, তবে তো পড়াবার কথা। এর বেশ কিছু দিন পরে জানালেন, বই যোগাড় করে পড়া হয়েছে তাঁর। রাখালবাবু এবং তাঁর বন্ধু— এই দুই ছাত্রকে পড়াবার জন্য নির্ধারিত ক্লাসের অতিরিক্ত সপ্তাহে একটি দুটি ক্লাস তিনি নেবেন; আর এইভাবেই ছাত্র এবং মাস্টারমশাই পড়লেন স্যার হ্যারডকে।

গল্পটা মনে থাকার কারণ এই নয় যে একজন যথার্থ শিক্ষকের স্বরূপ এর মধ্যে দিয়ে উন্মোচিত হচ্ছে, আসলে যখনই এই গল্প মনে পড়ে তখনি একটা

ছাত্র: ১৯৮২-৮৪

প্রশ্ন জাগে মনে— সব কৌতূহলী ছাত্রের কৌতূহল কি নিরসন করেন একজন দায়বদ্ধ শিক্ষক? নাকি ছাত্রের 'ছাত্র' 'হয়ে ওঠা' কোথাও অনুঘটকের কাজ করে, যেমন করে বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে থাকা একজন শিক্ষক 'শিক্ষক হয়ে ওঠেন' বিষয়ের 'কেন', 'কিভাবে', 'কার জন্য'— এসবের নিরন্তর চর্চার মধ্যে দিয়ে আর ছাত্রদেরও শামিল করে নেন সেই যাত্রাপথে? ভবতোষবাবুর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে অমিয় বাগচী লিখছেন— His writings spread over a period of more than 50 years give the impression that he never deviated from vision of an economy which would deliver both equity and efficiency and a policy-making framework which would include public intervention and legislation for correcting failures of equity as well as for market failures more narrowly defined (EPW, April 26, 1996).

ভবতোষবাবুর গবেষণার বিষয় ছিল Economics of Industrialisation। এটি বইয়ের আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে এবং তারপর আরও তিনটি সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৯৫৭, ১৯৬০ এবং ১৯৬৬ সালে। গবেষণার উপজীব্য ছিল একটা অনুন্নত অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলির বিশ্লেষণ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণের হাতিয়ারগুলিকে চিহ্নিত করা। লক্ষ্যগুলির কেন্দ্রবিন্দুতে পূর্ণ নিয়োগের উপর বারংবার জোর দেওয়া হয়েছে। তবে অনুন্নত দেশগুলির সমস্যার সমাধানে কেইনস-এর বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধকারী নীতিগুলির অসারতার ইঙ্গিত যেমন দিয়েছেন তেমনি সেগুলির প্রয়োজন যে বাজার পরিচালিত অর্থনীতিতেও আছে সে কথাও জানাতে ভোলেননি।

১৯৪৮ সালে হ্যারড তাঁর বইয়ের ভূমিকায় সতর্ক করছেন, The idea which underlies these lectures is that sooner or later we shall be faced once more with the problem of stagnation, and that it is to this problem that economists should devote their main attention. অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পূর্ণ তত্ত্ব আমাদের যে শুধু ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে সাহায্য করে তাই নয়; কি ধরনের নীতি গ্রহণ করলে একটি নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে স্থিতিশীলতা বজায় রেখে দ্রুত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি বজায় রাখা যায় তারও হদিস দেয়। নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা বড় হয়ে দেখা দেয় তা হল কিভাবে মূলধন গঠনের কাম্য হার সুনিশ্চিত করার সাথে সাথে বেকারত্ব ও সম্পদের অবাঞ্ছিত বণ্টনের দীর্ঘকালীন

কারণগুলিকে দূর করা যায়। হ্যারডের এই বই সেই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চাইল।

ভবতোষ দত্ত ভারত সহ অন্যান্য অনুন্নত অর্থনীতিতে বাণিজ্য চক্রের নিম্ন দশায় কি সমস্যা দেখা দেয় এবং তার সমাধান কিভাবে সম্ভব সেই প্রসঙ্গে বলেছেন যে বাণিজ্য চক্রের নিম্ন দশায় এইসব অর্থনীতিতে নিয়োগ কমে না, কমে আয় এবং তা ঘটে দুটি পরস্পর সম্পর্কিত কিন্তু ভিন্ন কারণে। এক, বাজারের কাজকর্ম প্রায় ক্ষেত্রেই পারিবারিক কাজকর্মের সম্প্রসারিত রূপ এবং যেহেতু পরিবারই জীবনধারণের প্রয়োজন মেটায় তাই বাজারের আয়তনকে চাহিদার স্বল্পতা যখন ভঙ্গুর করে তোলে তখন মানুষ আবার জীবনধারণের উৎপাদনের কাজেই ফিরে যায় এবং দুই, সংগঠিত ক্ষেত্র-বহির্ভূত দ্রব্য ও সেবার দাম যেহেতু চাহিদা নির্ধারিত তাই চাহিদা কমলে ওইসব দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনকারীদের আয় কমে। এক্ষেত্রে দত্তর মত হল দারিদ্র্য ও নিয়োগের দীর্ঘকালীন সমাধান হিসেবে জীবনধারণের উপযোগী আয় সুনির্দিষ্ট করতে হলে কৃষিনির্ভর পেশার দরকার ম্যানুফ্যাকচারিংমুখী হওয়া।

সেটা এমন একটা সময় যখন অর্থনীতি পড়া বা পড়ানোটা নিছকই পেশাগত আর 'পাশ' দেওয়ার খাতিরে দায়সারা কাজ নয়। আর ঠিক এমনটাই যেন বলতে চাইছিলেন জোয়ান রবিনসন— For many years I have been employed as a teacher of theoretical economics. I would like to believe that I earn my living honesty, but I often have doubts. I am concerned particularly for India and other developing countries whose economics doctrines come to them mainly from England and in English. Is that what we are giving them helpful to their development? (Teaching Economics: a Passage to India; Economic Weekly, Bombay, January, 1960).

পরীক্ষায় পাশ বা ভাল ফল করতে চাওয়া ছাত্র নিয়ে ভাবছিলেন না রবিনসন কিন্তু সেই সময়ে যে সিরিয়াস ছাত্রটি সমাজ, দেশ এবং দশের ভাল করার উপায় হিসেবে অর্থনীতি পড়তে চাইছে, যে ছাত্রটি এই ভাবনায় আন্দোলিত— কি করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে চালিত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় থেকেও উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হবে, যে ছাত্র প্রত্যাশিত উত্তর লেখার পরিবর্তে সেই উত্তর সম্পর্কেই প্রশ্ন তুলতে চাইছে তাদের

জন্য রবিনসনের উপলব্ধি ছিল— The prestige of the teachers and the books bears down on the serious student with a heavy weight. He bears to distrust his native common sense and to curb his generous impulses. He submits himself to a course of miseducation and comes out not by the same door wherein he went but by another door in the wrong street.

এর দুই দশক পরে সুখময় চক্রবর্তী ভারতে অর্থনীতি পড়ানোর বিষয়ে লিখলেন,The Teaching of Economics in India (EPW, vol. xxi, no. 27, July 5, 1986)। চক্রবর্তীর উষ্মা প্রকাশ পেল অর্থনীতি পড়তে আসা কিছু উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপস্থিতি সত্ত্বেও বিষয়টির উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার আতিশয্য দেখে। তাঁর মনে হয়েছিল যে এ দেশের অর্থনৈতিক জীবন এবং সংগঠন সম্পর্কে সামগ্রিক বোধ নির্মাণের জন্য যথোপযুক্ত উপাদান ও ধারণা সম্বলিত জ্ঞানের প্রসার প্রয়োজন। সেটার অভাব থাকার তিনটি কারণের কথা তিনি বললেন— First, we have the type of textbooks used in the University departments which rarely originate within India and therefore do not reflect Indian concerns, secondly, there is widespread desire for catching up with the West from which even the best departments are not exempt. The 'catching up' syndrome takes the form of attempting to introduce the students to a level of theorizing for which the undergraduate training of the students rarely makes them well prepared.

তৃতীয় কারণ হিসেবে যা বললেন তা প্রণিধানযোগ্য— University teaching within India hardly attracts the type of people who are best motivated as well as equipped to handle a changing body of thought. Here again, there are important exceptions, but unfortunately they are not the rule.

ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত মিশ্র বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে ভারসাম্যের অর্থনীতির মডেলগুলিকে উপযুক্ত করে নিয়ে তবে তার প্রয়োগ ঘটানো যেমন দরকার তেমনি অনুন্নত অর্থনীতির আলোচনায় উন্নয়নের সমাজতত্ত্বকে অস্বীকার করার উপায় নেই। অর্থনীতি একদিকে যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কাছাকাছি তেমনি অনেকটা তা 'reasoned history'— এমনটাই

অভিমত তাঁর। তাঁর আমলে যেভাবে অর্থনীতি পড়ানো হচ্ছিল তা 'natural science paradigm'-এর পুরনো সংস্করণ হলেও গত তিরিশ বছরের তুলনায় অনেকটাই উন্নত হবে, তবে তাঁর আক্ষেপ থেকে যায় যে অর্থনীতি পড়ানোর এই যাত্রাপথে বিষয়টি ক্রমেই তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। সবশেষে এই অভিমত তাঁর— What I am, therefore, pleading for is that in teaching economics, we recognize the diversity of epistemological perspectives and in the process prepare our students much better for the study of Indian society.

এই শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে অর্থনীতি শাস্ত্রের স্বরূপ ছাত্রদের বোঝাতে পার্থ দাশগুপ্ত শোনালেন দুটি মেয়ের কথা যাদের একজন Becky এবং অন্যজন Desta (Economics: a very short introduction, Oxford University Press, 2007). Becky-র পরিবার তার বাবা, মা ও বড় ভাইকে নিয়ে যাদের বাস আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমের শহরতলীতে। বাবা যে ফার্মে কর্মরত তা সম্পত্তির আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম করে। পারিবারিক আয় ওঠা নামা করলেও কখনও তা বার্ষিক ১,৪৫,০০০ মার্কিন ডলারের নীচে নামে না। Becky ও তার দাদা স্কুলে পড়ে, তাদের দোতলা বাড়ি, বাড়ির পিছনে কিছুটা জমি যেখানে পরিবারের সদস্যরা অবসর কাটান, পরিবারের দুটি মোটর গাড়ি, পরিবারের সদস্যদের এবং সম্পত্তির বীমা করানো আছে। Becky-র বয়স দশ এবং সে ডাক্তার হতে চায়।

Desta-রও বয়স দশ। সে তার বাবা-মা ও পাঁচ ভাইবোনের সঙ্গে ইথিওপিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি গ্রামে থাকে। এদের বাড়ি কাদার গাঁথনি দিয়ে তৈরি, বাড়িতে দুটি ঘর। মেয়েটির বাবা আধ হেক্টরেরও কম জমিতে ভুট্টা এবং teff (সে দেশের একপ্রকার বিশেষ খাদ্যশস্য)-এর চাষ করে। সামান্য যে পরিমাণ teff উৎপন্ন হয় তা বাজারে বিক্রি করা হয় অর্থ উপার্জনের জন্য আর ভুট্টার যা ফলন হয় তার সবটাই পরিবারের খেতে চলে যায়। কুটিরের লাগোয়া ছোট্ট একফালি জমিতে Desta-র মা বাঁধাকপিট, পেঁয়াজ এবং এনসেট (একপ্রকার মাটির তলার খাদ্যশস্য) ফলান। গৃহস্থালীর সব কাজ তিনিই করেন, তাঁকে সাহায্য করেন Desta ও তার দিদি। এরা কখনও স্কুলে ভর্তি হয়নি, বাবা-মা-রাও লিখতে-পড়তে পারেন না। ঋণদানকারী এমন কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানও নেই এদের সাহায্য করবার জন্য।

ইথিওপিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রার ব্যয়ের পার্থক্যের নিরিখে ২০০৭

সালে Desta-দের পারিবারিক আয় ৫৫০৭ ডলার। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যে বছর কম হয় সে বছরে গ্রাসাচ্ছাদন যখন অনিশ্চিত ও অনিয়মিত হয় তখন পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে আবার ভাল বৃষ্টিপাতের বছরে তার উন্নতি ঘটে। দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সমস্যার পুনরাবৃত্তি স্বাভাবিক ঘটনা। Desta বোঝে আর কিছু দিন পরে তার বিয়ে হবে এবং সেও তার মায়ের মতই জীবন কাটাবে।

উভয় বালিকার মধ্যে মানবিক কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের সাযুজ্য আছে যেমন দুজনেই খেলা, গল্প করা, খাওয়া-দাওয়া ভালবাসে, বিপদে পড়লে মায়ের কাছে আশ্রয় নিতে চায়, ভাল পোশাক পরতে চায়, বিরক্ত হতে, খুশি হতে জানে। তাদের বাবা-মা-রাও নিজেদের জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এবং সব সময়ই চেষ্টা করেন কি করে পরিবারের অবস্থা আগের তুলনায় ভাল করা যায়। এক্ষেত্রে উভয় পরিবারের এই অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করার একটি রাস্তা হচ্ছে এই দুই পরিবারের ক্ষেত্রে যেসব সুযোগ ও বাধাগুলি বিদ্যমান সেগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা আর সেক্ষেত্রে পার্থ দাশগুপ্তের মতে অর্থনীতি হল সেই পদ্ধতিগুলিকে চিহ্নিত করা যেগুলির প্রভাবে মানুষের জীবন বর্তমান রূপ গ্রহণ করেছে— Economics in great measure tries to uncover the processes that influence how people's lives come to be that they are.

এই আবরণ উন্মোচনের কাজটা কিন্তু সহজ নয়। এর জন্য পর্যবেক্ষণের পরিধি বিস্তৃত হওয়া দরকার। পার্থ জানাচ্ছেন— Modern economics, by which I mean the style of economics taught are practised in today's leading universities, likes to start the enquiries from the ground up: from individuals, through the household, village, district, state, country, to the whole world.

Becky এবং Desta-র পরিবারের পরিবারের জীবনধারা বিশ্লেষণ করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে কি কি ধরনের বাস্তব প্রত্যাশার সম্মুখীন পরিবারগুলি হচ্ছে বা হতে পারে, দ্বিতীয়ত, এই সকল প্রত্যাশার সৃষ্টি হওয়ার পিছনে পরিবারগুলির জীবনযাপনের পদ্ধতি, পছন্দ ও নির্বাচনের প্রকৃতি কেমন তা বুঝতে আর তৃতীয়ত, পরিবারগুলি তাদের বর্তমান অবস্থার কতটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাচ্ছে তা বিশ্লেষণ করা দরকার। এর জন্য দাশগুপ্ত-র মত হল— historical narratives continue to play

an important role in modern economics, but they are put to work in conjunction with model-building and econometric tests.

এত গেল এক রকম, কিন্তু 'আমি মনে করি আমরা চাই অর্থনীতি অর্থনীতিকে রহস্যের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বের করে আনুক' (I think we want economics to demystify economics)— এমনটা কেন বলতে হল তাঁকে, তাও আবার NCERT আয়োজিত বিদ্যালয়ে অর্থনীতি শিক্ষা বিষয়ক জাতীয় স্তরের আলোচনা চক্রে? অমিত ভাদুড়ী এই আলোচনা চক্রে যে বীজভাষণ (keynote address) দিয়েছিলেন যার শিরোনাম ছিল What is core of Economics?— ভূপালের একলব্য প্রকাশনা সেটিরই বিস্তৃত রূপটি প্রকাশ করেছেন ২০১০ সালে। আমরা জানতে পারছি কেন এক প্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ না কি বলেছিলেন— অর্থনীতি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই কারণে নয় যে তা যা শেখায় বরং এই কারণে যে তা অন্য অর্থনীতিবিদদের আমাদের বোকা বানানো থেকে নিরস্ত করে। এই বোকা বানানো সম্পর্কে অনেক দিন থেকেই সজাগ করেছেন অমিত ভাদুড়ী নানাভাবে। এখানে যেমন বাজেট আর গৃহস্থালী (housekeeping)-র প্রসঙ্গে বলছেন উভয়ের বিশেষ পার্থক্য নেই কেবল প্রথমটির ক্ষেত্রে সরকার যা টাকা ছাপাতে আর কর বসাতে পারে যেটা গৃহকর্ত্রী বা পরিবার পারেন না যদি না অবশ্য তাঁদের ওভারড্রাফট নেওয়ার সুযোগ থাকে। ভাদুড়ী বলছেন— This is one of the things that really distinguish the government budget and public finance from housekeeping. And yet, mainstream economics nowadays have almost obliterated this distinction because they want the state to be diminished in its economic role as far as possible. পরে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন— the game has become one of reducing public finance to housekeeping in the name of 'fiscal discipline' which increasingly means disciplining the poor to help the rich. It should be our attempt as economists to discuss and debate where the government should and why, without starting with a predetermined idea of how much it should spend. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলতে চাইছেন— তোমরা কেউ বামপন্থী হতে পার কেউ বা ডান; সেটা কোনও কথা নয়; দেখতে হবে খোলা মনে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ও অভিজ্ঞতার নিরিখে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিকে কোনওরকম মিস্টিক আবরণে মুড়ে না

রেখে সেগুলির সঠিক স্বরূপ নির্ণয় করতে পারছ কি না। কিন্তু অভিজ্ঞতা তো পরিশুদ্ধ হয় মতাদর্শের মধ্যে দিয়ে। আর তখন সামাজিক বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় যে কোনও মতাদর্শের ভিত্তি সম্পর্কে সচেতন করা। নিরপেক্ষ বা যান্ত্রিকভাবে কোনও কিছু পাওয়া সম্ভব নয় আর তাই বৌদ্ধিকভাবে সৎ থেকে জানা দরকার কোথায় এবং কিভাবে মতাদর্শের প্রয়োগ ঘটানো হচ্ছে। এর জন্য কি করতে হবে? ভাদুড়ী জানাচ্ছেন— And the first check on this is an understanding of numbers.

ছাত্রদের একটা প্রবণতা প্রায়ই দেখা যয় অর্থনীতির যুক্তিটা না বুঝে অঙ্কটা করে ফেলার, তাদের জন্য অমিত ভাদুড়ীর এই কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য— I want to be intellectually honest and emphasise that mathematics can be useful to put things in a much sharper way. It is not something that gives you anything new, but it can help you to blow away the fogs of imprecise thinking. Mathematics does not tell you something which you could not tell in words; what it does is to say the same thing far more precisely. And precision makes it easier to pinpoint differences in assumptions and conclusions that logically follow.

তাঁর মতে অর্থনীতির যুক্তি নির্মাণ করা দরকার through a complex interaction between experience, ideology and numbers. আর সেটাই সঠিকভাবে হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ সাধারণ জ্ঞান (distilled commonsense)। যদি সেই সাধারণ জ্ঞান পূর্ব-অনুমিত সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তা হলে কেন তা হল না প্রশ্ন তুলতে হবে আর সেইটাই অমিত ভাদুড়ীর মতে, the more complex function of training in economics. Perhaps this is also the beginning of being a real economic theorist of relevance.

ইকনমিক্স পাঠ ও পাঠ্যবস্তু নিয়ে নানা পুরানো কথা

অনুপম গুপ্ত

আজ থেকে বছর ষাটেক আগে ইকনমিক্স অনার্সের ছাত্রদের কাছে এক কপি সেন এন্ড দাসের বই থাকত। যদিও তখন ওই বইটা, পাস কোর্সের ছাত্রদের পাঠ্য তালিকার মধ্যে ছিল— তাহলেও অল্প সময়ে নানা কিছুর ধারণা করে নেওয়ার জন্য অনার্সের ছাত্রদেরও সহায় ছিল। সেন মানে কলকাতার স্নাতকোত্তর অর্থনীতি বিভাগের বোধ হয় সর্ব কালের সব থেকে প্রিয় ছাত্র-বৎসল শিক্ষক সত্যেন্দ্রনাথ সেন। বইটির অর্ধেক ছিল ইকনমিক্স আর বাকী অর্ধেক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পলিটিক্স। তখন বিষয়টির নাম পলিটিক্স থেকে বদলে পোলিটাকাল সায়েন্স হয়নি। ওই অর্ধেক লিখেছিলেন দাস বা শিশির কুমার দাস। তখনকার দিনে অনার্সে ইকনমিক্স আর পলিটিক্স এর জন্য একটি সম্মিলিত পাঠক্রম ছিল। স্নাতকোত্তর স্তরে গিয়ে অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভাগে চলে যেত। শুনেছি তারও আগে বোধহয় ১৯৫০-এর আগে স্নাতকোত্তর স্তরেও দুটি বিষয় একটি বিভাগের অন্তর্ভূক্ত ছিল। কয়েকটি বিকল্প পেপারের সাহায্যে স্নাতোকত্তর স্তরে অর্থনীতি আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠক্রমের মধ্যে প্রভেদ করা হত। অবশ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দিকে ভারী পাঠক্রম নিয়ে পাস করেও দেখেছি কোনও কোনও ব্যক্তি অর্থনীতির অধ্যাপক হিসাবে জীবনে স্বীকৃতি পেয়েছেন। যাই হোক সেন এন্ড দাসের বই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী বাজার পেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পর পর তিনটি পরীক্ষায় প্রথম হয়েও বোধ হয় ১৯৩৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ সেন আশুতোষ কলেজে ৭৫ টাকা মাইনের

ছাত্র: ১৯৫৬-৫৮

অধ্যাপনার কাজ পেয়েছিলেন। সেন এন্ড দাসের কল্যাণে সত্যেনবাবু আর্থিক স্বাচ্ছল্য পেয়েছিলেন। সত্যেনবাবুকে আমরা স্নাতোকত্তর স্তরে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলাম।

ইকনমিক্সে তখন স্যামুয়েলসনের বইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য ছিল। সম্ভবত ১৯৫৩ সালে কেয়ারর্নক্রসের জায়গায় স্যামুয়েলসন পাঠ্য করা হল। সেটা বোধ হয় স্যামুয়েলসনের প্রথম সংস্করণ ছিল। কিন্তু দু' বছরের মধ্যে তৃতীয় সংস্করণ এসে গেল— আর বইয়ের দাম ১২ টাকা থেকে বেড়ে ৩০ টাকা হয়ে গেল। তখনকার অবস্থায় দামটা আমাদের বেশ গায়ে লাগত। তখনকার দিনে ইকনমিক্সের দুটো দিক নিয়ে সাধারণত কথা বলা হত। সেই দুটো দিক হল থিওরি আর ইন্ডিয়ান ইকনমিক্স। অর্থনীতির প্রয়োগের দিক অর্থাৎ পলিসির দিক নিয়ে খুব কথা হত না। ছোটবেলা থেকে আমার বাবাকে বলতে শুনেছি যে তাঁর গৈলা গ্রামের ইস্কুলের সহপাঠি বন্ধু ভারতবর্ষে প্রথম থিওরি নিয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে পিএইচডি করেছিলেন। তখন থিওরি বলতে সাহেবদের তত্ত্বের টিকা টিপ্পনি বোঝানো হত। বোধ হয় গত শতকের তিরিশের দশক থেকেই বাঙালি অর্থনীতিবিদদের বিলেতে গিয়ে পিএইচডি করে আসার রেওয়াজ চলেছে। প্রথম বোধ হয় প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লন্ডন থেকে ডিএসসি করে এসে কলকাতার বিভাগীয় প্রধান হয়েছিলেন। সেটা ইংরেজ আমল— তখন ইকনমিক্সের বিভাগীয় প্রধানকে বলত মিন্টো প্রফেসর। তখনকার দিনে এক একটা বিভাগে ওই একটাই প্রফেসরের পদ সরকারি বা বেসরকারি অনুদানে কারুর নামে রাখা হত। তখন বিভাগীয় প্রধান মর্যাদার আসন ছিল। কাজেই প্রফেসররা বিভাগীয় প্রধানের পদ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইতেন না। প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই খণ্ডে ইন্ডিয়ান ইকনমিক্সের বই ছেলেরা পড়ত। এখানে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের কথাও বলার কথা, কিন্তু সত্যি সত্যি গত শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত ইকনমিক্স পড়ুয়াদের মধ্যে মেয়েদের উপস্থিতি প্রায় না থাকার মত। এখানে অবশ্য মনে করতেই হবে যে পঞ্চাশের দশকের গোড়াতে একটা বছর ইকনমিক্সের এমএ পরীক্ষায় প্রথম তিনটে স্থানই মেয়েরা দখল করেছিল। হয়ত সে বছর মোট মহিলা পরীক্ষার্থীও ওই তিনজনই ছিলেন।

আমাদের সময় আর একটা বইয়ের কথাও মনে পড়ছে। সেই বইটা হল স্টিগলার এর প্রাইস থিওরি। বইটার প্রথম সংস্করণ সরাসরিভাবে অবরোহী বা তার থেকেও বেশি গাণিতিক যুক্তির ধারায় বক্তব্যগুলি প্রায় উপপাদ্যর মত

উপস্থাপন করেছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল পরবর্তী সংস্করণে গাণিতিক যুক্তির পদ্ধতি যতটা সম্ভব বর্জন করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে ছোট ছোট দৃষ্টান্ত এনে বক্তব্য সাজানো হয়েছিল। কথা দিয়ে আলোচনা সাজানোর পদ্ধতি আগেকার বইতে— কেয়ার্নক্রস, সেন এন্ড দাস ইত্যাদির রীতি ছিল। স্যামুয়েলসনে ছোট ছোট দৃষ্টান্ত আর অল্প কিছু গাণিতিক পদ্ধতির একটা মিশেল ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে ছাত্রপাঠ্য বইগুলি ক্রমশ অধিকতর গাণিতিক যুক্তি-পদ্ধতির দিকে ঝুঁকছিল। এরপরে ১৯৫৫ সালে হেগ এন্ড স্টোনিয়ার আর ১৯৫৮ সালে হেন্ডারসন-কোয়ান্ড, এঁদের বইগুলি এসে ক্রমশ দৃষ্টান্ত দিয়ে কথার যুক্তিকে সাজানোর পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে গাণিতিক যুক্তি পদ্ধতিকে একমাত্র জায়গা দিল। গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের পর থেকে এটাই প্রায় সব পাঠ্য বইয়ের আলেচনা পদ্ধতির গৃহীত ধারা ছিল। কথা নয় গণিত— বাস্তবের নানা কথা এড়িয়ে বা কমিয়ে ন্যূনতম কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে খুব অল্প কয়েকটি শর্তের রূপ দিয়ে অনেক ব্যাপক সারসত্যকে উপপাদ্যর মত প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে যে বড় রকমের গরমিল ঘটে যেতে পারে এটা তখন মনে হয়নি। প্রথমত গাণিতিক পদ্ধতির ভিত্তি সম্বন্ধে অর্থনীতির ছাত্র কখনই ততটা তৈরি হতে পারত না। আর অনেক ব্যাপক অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ন্যূনতম শর্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সমাজ অর্থনীতির বৈচিত্র্য উপেক্ষিত হয়ে গেল। অর্থনীতির ছাত্রর কাছে অর্থনীতির প্রকৃত রূপটাই ধরা পড়ল না। পাঠ্য বইয়ের ক্রমশ সংকীর্ণ, বাস্তবকে ছেঁটে ক্রমশ আঁটোসাঁটো গাণিতিক কাঠামোর দিকে চলার যে ধারা, স্টিগলারের বইয়ের সংস্করণগুলি সেই সময় আশ্চর্যজনকভাবে ঠিক তার উল্টো দিকে গিয়েছিল।

তখনকার আর একটা পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত বইএর কথা মনে পড়ছে। সেটা হল বেইনের থিওরি অব প্রাইসিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন। ডিস্ট্রিবিউশন বা বণ্টনের কথা বিশেষ করে এই বইটির নামেতেই উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে থিওরির সব বইতেই এক ধরনের বণ্টনের তত্ত্ব থাকত। তত্ত্বগুলি উৎপাদনের চারটি উপাদান, যথাক্রমে শ্রম, পুঁজি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্যোগের মধ্যে মোট উৎপাদনের মূল্যর বিতরণের পদ্ধতি, ফলাফল ইত্যাদির কথা বলত। অর্থনীতিতে উপাদানের অধিকার নির্বিশেষে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে মোট উৎপন্ন দ্রব্য বা মোট আয়ের বণ্টন বা ভাগাভাগির কোনও তাত্ত্বিক নির্দেশ পাওয়া যায় না। এদিক নিয়ে সম্ভব অসম্ভবের একটা আকর্ষণীয় আলোচনা করেছিলেন অধ্যাপক অমিয়কুমার দাশগুপ্ত তাঁর ইকনমিক্স অব অস্টারিটি নামের একটা

ছোট বইতে। ধরুন ব্যাঙ্কের জেনেরাল ম্যানেজার বা সরকারি মন্ত্রকের সচিব যত টাকাই পান না কেন সেটা তো বেতন হিসাবেই পান। আবার কর্মচারি খাটিয়ে পাড়ার মুদির দোকানের বা মিষ্টির দোকানের মালিক যেটা আয় করেন তার প্রায় সবটাই তো লাভ বলে ধরতে হবে। এইভাবে লাভ আর বেতনের মধ্যে আয়ের তারতম্য নিয়ে কোনও অবশ্যম্ভাবী ফলাফল বা পরিণতির কথা বলা যায় না। আয়ের তারতম্য আয়ের উৎস নির্বিশেষে সব মানুষের মধ্যে কোন দিকে যাবে, তুলনামূলকভাবে দারিদ্র্য বাড়বে কি না, বাড়লে কতটা বাড়বে তার কোনও ইঙ্গিত কোনও তত্ত্বে নেই। থিওরিতে যা কিছু আছে সবটাই বাজার দর আর উৎপন্নের অথবা উৎপাদনের উপাদান হলে প্রদানের পরিমান নির্দেশক। কাজেই আমাদের নির্ধারিত পাঠ্যের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন তো নয়ই, প্রাইস থিওরি, প্রাইসিং ইত্যাদির বেশি কিছু থাকত না। আমরা অধৈর্য হলে পুঁজি ও শ্রমের লড়াই, শোষণের কথা ইত্যাদি থেকে বণ্টনের সমস্যার উত্তর পাব বলে তখন ভাবতাম। উত্তরটা যে স্ট্যাটিসকাল ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যানের সযত্ন সংগ্রহ আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্যে খুঁজতে হবে এটা তখন কেউ আমাদের ধরিয়ে দেয়নি।

আমরা ১৯৫৮ সালে কলেজ স্ট্রিটের আশুতোষ বিল্ডিং থেকে নির্বাসিত হয়ে তখনকার কালের 'ধ্যরধেরে গোবিন্দপুর' সাউথ সিঁথিতে এসে পড়লাম। সে যে কি মনোকষ্টের কথা আজ বলে বোঝানো যাবে না। অনেক দিনই ক্লাসের পরে কলেজ স্ট্রিটে ছুটতাম। খানিক ক্ষণ কফি হাউসে না বসলে লোকে ইন্টেলেকচুয়াল বলে মানবে কেন। তখনও সিনেট হল ভাঙা হয়নি। সেবারের নবীনবরণ হল সিনেট হলে। বোধ হয় প্রথম গানই ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের ''এসো শ্যামল সুন্দর''। সদ্য স্নাতকোত্তরের হাওয়া যখন গায়ে লেগেছে তখন সিনেট হলের পরিবেশে দেবব্রত বিশ্বাসের গলায় ওই গান শোনার অভিজ্ঞতার তুলনীয় ঘটনা আমার জীবনে আর কখনও ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। অর্থনীতির স্নাতকোত্তর ক্লাসের ছেলেরা তখন রাজেশ্বরী দত্তর গানের খুব ভক্ত। তখন সবে ৩৩ পাকের রেকর্ড বেরোতে শুরু করেছে। সত্যজিৎ রায়ের যুগান্তকারী সিনেমাগুলি একে একে মুক্তি পাচ্ছে। সিম্বল, পার্সপেক্টিভ ইত্যাদি নিয়ে আমরা খুব আলোচনা করছি। সত্যজিৎ রায়ের ছবি দেখে সিনেমার আধুনিক ব্যাকরণ শিখে সত্যজিৎ রায়ের সিনেমারই চুলচেড়া বিশ্লেষণ করছি। সত্যজিৎ যে ব্যর্থ হচ্ছেন আর অনন্যোপায় হয়ে সিনেমা পরিচালনা আমাদেরই হাতে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই— এই রকম সব কথাবার্তা বলছি। বোধহয়

চিরদিনই অর্থনীতির ছাত্রদের আগ্রহের আর জানার পরিধি যেমন বড় স্পর্ধাও তেমনই সীমাহীন।

কলেজ স্ট্রীটের ক্যাম্পাসে আকর্ষণীয় ঘটনার বিরাম নেই। সিনেট হলে বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী নিলস্ বোর এসে বক্তৃতা দিলেন। কিছু বুঝি আর না বুঝি যাওয়া চাই। আশুতোষ বিল্ডিং-এ কবি স্টিফেন স্পেন্ডার এসে বক্তৃতা দিলেন। রুমা গাঙ্গুলি তখনও গুহঠাকুরতা হননি, সলিল চৌধুরি, তালাত মাহ্মুদদের সঙ্গে ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার তৈরি করেছেন। বোধহয় তাদের প্রথম অনুষ্ঠান— নানা প্রদেশের নাচ-গান দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হল। অধিকাংশ নাচ রুমা গাঙ্গুলি নিজে পরিবেশন করেছিলেন। এইসব ছোটাছুটি, কালচার করার অভ্যন্তরে, মনের ভিতরে মেহনতি জনতার জন্য বিপ্লবী চেতনা সদা সজাগ ছিল। তখন বছরের একটা বড় ঘটনা ছিল বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন— মার্কাস স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত হত। সেবার ১৯৬০ সালে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে একদিন ঐতিহ্য আর বাংলা সাহিত্য নিয়ে একটা আলোচনা সভা হল। গোড়াতেই বাংলা সাহিত্যিকরা যে ঐতিহ্যের একেবারে ধার ধারে না এই নালিশ তুলে শিবনারায়ণ রায় সবাইকে খুব এক হাত নিলেন। সেদিন ওখানে বক্তাদের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের সর্বকালের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রদের সমাবেশ হয়েছিল— সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, নরেন্দ্রনাথ মিত্র ইত্যাদিরা সবাই এসেছিলেন। ১৯৬০-এর গ্রীষ্মে সম্ভবত সেটাই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শেষ সভা। তার অল্প পরেই উনি মারা গিয়েছিলেন। সেই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন আমাদের মাস্টারমশাই অম্লান দত্ত। তিনি তখন তরুণ অধ্যাপক। উপস্থিত বক্তাদের সবার থেকে বয়ঃকনিষ্ঠ। অম্লানবাবুর ছাত্র আমরা তো আনন্দে উৎফুল্ল। সে দিন মনে আছে অম্লানবাবু তাঁর বক্তৃতায় একটিও ইংরাজী শব্দ বলেননি। অম্লানবাবু ক্লাসে পড়াবার সময় ইংরাজীর মধ্যে কখনও একটিও বাংলা শব্দ বলতেন না। এমনকি ক্লাসে কথা প্রসঙ্গে কোনও সাধারণ উক্তি বা নির্দেশ দেবার সময়েও উনি ইংরাজী বলতেন। সে দিন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে ওঁর সভাপতির ভাষণ ভাষা ও বক্তব্যে আমাদের মুগ্ধ করেছিল।

তখনকার দিনে মাঝে মাঝে কোনও একটা নির্বাচিত বিষয় নিয়ে বিতর্ক সভা বসানো হত। বিতর্ক হত ইংরাজী ভাষায়। সেই সব আনুষ্ঠানিক বিতর্কে কয়েকজন বক্তার জনপ্রিয়তা ছিল। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, উৎপল দত্ত, জলি কাউল, সুধাংশু দাশগুপ্ত, বিষ্ণু

মুখার্জী ইত্যাদি। আর অধিকাংশ ওই ধরনের তথাকথিত প্রদর্শনী বিতর্কে আমাদের সহপাঠী মনীশ নন্দী অংশ নিতেন। মনীশের থেকে বয়সে অনেক বড় নিজেদের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বক্তাদের মধ্যে কোনও অংশে বক্তা হিসাবে মনীশকে কম বলে মনে হত না। আমি তখন মনে মনে ধরে নিয়েছিলাম যে মনীশ নিশ্চই ইংরাজী মাধ্যম ইস্কুল থেকে পড়ে এসেছে। আশ্চর্য হলাম যখন মনীশ বলল যে পুরোপুরি বাংলা মাধ্যমের ইস্কুল, স্কটিশ চার্চ স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাস করেছে। ওর বয়সী আর পাঁচটা বাঙালি ছেলের মত বাংলায় কবিতা লিখত। তখনকার দিনে বাংলা বলবার বা লিখবার সময় ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করাকে এক ধরনের শিক্ষাগত অক্ষমতা বলে ভাবা হত। তখন প্রায় সব বাঙালি ছেলেমেয়েই পরশুরামের গল্পের ঠাট্টাগুলির সঙ্গে বা সুকুমার রায়ের কবিতার ঠাট্টাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিল। অন্য দিকে আমাদের স্নাতকোত্তর বিভাগের এক শ'রও বেশি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বড় জোর জনা পাঁচেক ইংরাজী ইস্কুল থেকে পাস করেছিল। তাঁদের মধ্যে কেউ পরীক্ষার ফলের দিক থেকে বলবার মত কিছু করেছিল বলে মনে পড়ে না। তবে ইংরাজী বলাতে এরা সরগর ছিল বলে তখনকার বিদেশি সদাগরি ব্যবসায় এরা ভাল চাকরি পেত। তখনকার দিনে আমাদের ভিতরের ভীষণ পুঁজিপতি বিরোধী উত্তেজনায় ওই সব সুযোগকে অনায়াসে উপেক্ষা করতে পারতাম।

মনীশ এমএ পরীক্ষা পাস করে ডানলপ কোম্পানিতে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হয়ে ঢুকল। তখনো সেইভাবে ম্যানেজমেন্ট পড়ানো শুরু হয়নি। দেশে প্রথম ম্যানেজমেন্ট পড়ানোর কলেজ স্থাপিত হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজের পিছনে ১৯৫৪ সালে। তারপরে বোধ হয় ১৯৬২ সালে দেশে প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট হল কলকাতায় কাঁটাকলের কাছে— ইকনমিক্স ডিপার্টমেন্টের দক্ষিণ দিকের জমিতে। যাই হোক, তখনকার দিনে ইকনমিক্স, স্ট্যাটিসটিক্স পড়া ভাল ছাত্ররা অনেকেই বিদেশি কোম্পানিতে ওই রকম ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি হয়ে জীবন শুরু করত। তখনকার দিনে জীবন শুরু করবার পক্ষে বেশ বড় চাকরি— মাইনে ৫০০ টাকা। তখন প্রেমিকা পাওয়া অত সহজ ছিল না। ওই সব ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিদের প্রেমে পড়বার জন্য স্মার্ট মেয়েরা বা সম্বন্ধ করবার জন্য মেয়েদের বড়লোক বাবারা তখন ছুটে বেড়াতেন। আজকে সেই সব কোম্পানিগুলো লালবাতি জ্বেলে উধাও হয়ে গেছে। সেটা কি করে হল ইকনমিক্স পড়া লোকেদেরই জানবার কথা। আমরা সিলেবাসের বাইরে যাইনি বলে কলকাতার সংগঠিত, অসংগঠিত কোনও ক্ষেত্রের কোনও ব্যবসার

অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে কোনও কিছু জানার বা শেখার কোনও গরজ কখনও বোধ করিনি। এর মধ্যে ১৯৪৮ আর ১৯৫৪ সালে পর পর দুটো শিল্পনীতির ভিতর দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার প্রতষ্ঠিত হয়ে গেছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বিস্তৃতি যে সমাজতন্ত্রর অবশ্যম্ভাবী অভিমুখ এ বিষয় কারুর মনে তখন কোনও সন্দেহ ছিল না। আমাদের পাঠ্যসূচিতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথা ছিল কিন্তু তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত সরকারি নিয়ন্ত্রণের কোনও কথা তার মধ্যে ছিল না।

সম্ভবত ১৯৫৮ সাল থেকেই স্নাতকোত্তর অর্থনীতির পাঠ্যসূচিতে গণিতের প্রবেশ ঘটল। কলকাতার এবং তার প্রভাবে বাংলার অন্য সব কলেজের অর্থনীতি পাঠক্রমে তখন থেকে গণিতের মাত্রা ক্রমশ বেড়েছে। কিন্তু গাণিতিক পদ্ধতিগুলির ভিত্তি সম্বন্ধে অর্থনীতির পড়ুয়াদের প্রায় কখনই সচেতন করা হয়নি। এর ফলে পরবর্তীকালে দেশে বসে অর্থনীতি গবেষণায় স্বাধীনভাবে গণিতের প্রয়োগ করতে কারুকে বিশেষ দেখা যায়নি। গণিতের প্রয়োজন নিয়ে সারা পৃথিবীর অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দুটো বিরোধী মত প্রচলিত ছিল। জাপানী অর্থনীতিবিদ মরিশিমা তাঁর একটি ছাত্রপাঠ্য বইয়ের ভূমিকায় এই ব্যাপারে বেশ মজার কথা লিখেছিলেন। জাপানে নাকি গণিত প্রধান অর্থনীতির পণ্ডিতরা ইতিহাস প্রধান অর্থনীতির মানুষদের নির্বোধ বলে ভাবতেন আর ইতিহাস প্রধান অর্থনীতিবিদরা গণিত প্রধান অর্থনীতিবিদদের অবাস্তব বা অর্বাচীন বলে ভাবতেন। যাই হোক এ দেশে সেটা দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ। স্নাতকোত্তর বিভাগের ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারে পড়তে যাচ্ছে। ওখানে তখন স্ট্যাটিস্টিকস, ইকনমিকসের দিকপাল পণ্ডিতরা আসছেন। অত গোছানো আর অত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার তখন দেশে আর কোথাও ছিল না। দেখা যেত স্যার রোনাল্ড ফিশারের মত বা কক্রেনের মত স্ট্যাটিস্টিয়ান বা কালেস্কি, জোন রবিনসনের মত অর্থনীতিবিদ ওখানে লেখাপড়া করছেন, বক্তৃতা দিচ্ছেন। তখন ফোর্ড ফাউন্ডেশন অর্থনীতি বিভাগকে অনেকগুলি স্কলারশিপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। রিজার্ভ ব্যঙ্ক কমার্স বিভাগকে একটা প্রফেসরশিপ ও কিছু স্কলারশিপ দিয়েছিল। ওই পদগুলিতে ইকনমিক্স বিভাগের অধ্যাপক-ছাত্ররাই নিযুক্ত হয়েছিলেন। স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউটেও অর্থনীতি বিভাগের অনেক প্রাক্তন ছাত্র কাজ করতেন। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও স্নাতকোত্তর অর্থনীতির পাঠক্রমে প্রয়োগধর্মী অর্থনীতির কোনও প্রভাব পড়েনি। সব থেকে বড় কথা ভারতীয় অর্থনীতি আর অর্থনীতি তত্ত্বর

পাঠক্রমগুলির মধ্যে কোনও যোগসূত্রের ইঙ্গিত ছিল না। অন্য দিকে তখন অর্থনীতি বিভাগের সংলগ্ন জমি— এখন যেখানে রবীন্দ্রভারতী ইউনিভার্সিটি সেখানে— ইউনেস্কো রিসার্চ সেন্টার নামে একটি প্রতিষ্ঠান হল। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ছিলেন ব্রহ্মানন্দ-ভকিল খ্যাত বম্বের প্রবীণ অর্থনীতিবিদ সি এন ভকিল।

তখন ব্রহ্মানন্দ ও ভকিল ভোগ্যপণ্যর দিক থেকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিশা নির্দেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। উন্নয়নের সঙ্গে মানব কল্যাণের সম্পর্ক নিয়ে সরাসরিভাবে তখনও বিশেষ কথা ওঠেনি। রাশিয়ার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত থেকে দ্রুত হারে মূলধন গঠন করে বিকাশের দিকেই প্রায় সবার নজর ছিল। অন্য দিকে আজও শ্রমের নিয়োগ ও দক্ষতা বাড়িয়ে বিকাশের কোনও স্পষ্ট ছক কেউ তৈরি করে উঠতে পারেনি। আমাদের সময় আমরা ভাবতাম যে সমাজ সচেতন, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল মানুষ তৈরি হলেই শ্রমের দক্ষতার ভিত্তিতে মানব কল্যাণ সম্ভব হবে। বিশ্বাস করতাম সাম্যবাদে বিশ্বাসী বলে নিজেদের ভাবতে পারলেই সমাজ সচেতনতা দেশে অবিসংবাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সাম্যবাদ তখন প্রায় বিবেকের অন্য নাম হয়ে গেছে। জহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্র বললেও সবটা বলা হল না বলে অনেকে গাল পারতেন। এমনতর ভাবনা বা কথাবার্তা সবটাই মধ্যবিত্তদের অন্তর্কলহ বা কোন্দলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী বাঙালি অর্থনীতিবিদরা তখন চোখা চোখা ইংরাজী বা বাংলা ভাষায় সাম্যবাদের পক্ষে বক্তৃতা করছেন বা প্রবন্ধ লিখছেন। আমরা সেই পঞ্চাশের দশকের শেষে ছোটাছুটি করে সেইসব বক্তৃতা শুনতে যেতাম। অবশ্য তখনকার ভোটের বাক্সে ওই সব চোখা চোখা কথাবার্তার কোনও প্রভাব পড়ত না। অবাঙালি অর্থনীতিবিদদের মধ্যে অনেকেই তখন বাঙালিদের শ্লেষাত্মক সাম্যবাদী কথার ফুলঝুরিকে বাহবা দিয়েছেন। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের কোনও জায়গায় প্রায় তখন থেকেই বাঙালিদের অস্তিত্ব ছিল না। অর্থনীতির প্রয়োগের দিকটা অবহেলা করে গাণিতিক যুক্তি পদ্ধতির অতি সীমিত ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ থেকে আজও দেশের অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের কোনও বড় জায়গায় কলকাতার কোনও ছাত্রের ঠাঁই জোটেনি। যে কজন বাঙালি সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজনও কলকাতায় অর্থনীতির পাঠ নেননি।

১৯৬০ সালের গোড়াতে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এসে কাঁটাকলের বাড়িতে অর্থনীতি বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন। ভি কে আর ভি রাও, বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, বি আর শেনয়, অমিয়কুমার দাশগুপ্ত, সি এন

ভকিল ইত্যাদি অনেক তখনকার দিনের দেশের নামী অর্থনীতিবিদ এসে বক্তৃতা দিলেন। শেনয় ছাড়া প্রায় সবাই তখন জওহরলালের বা প্রশান্ত মহলানবীশের সমর্থক ছিলেন। শেনয় বাজারের উপরে নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা সংকোচন করে উন্নয়নের পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলেছিলেন। তখন পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে তথ্যভিত্তিক আলোচনার উপরে জোর দেওয়া হত। কলকাতায় আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক অজিত বিশ্বাস স্ট্যাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট থেকে আংশিক সময়ের অধ্যাপক হিসাবে পড়াতে আসতেন। গণিতের ব্যবহারে অত অনায়াস দখল আর কারুর মধ্যে দেখিনি। বিষয়ের প্রশ্ন ও পদ্ধতির মধ্যে অজিতবাবুকে এত সহজভাবে বিচরণ করতে দেখে আমি অনেক সময় মুগ্ধ হয়েছি। বিষয়ের আর একটা দিকে ইতিহাস, সমাজ নিয়ে অর্থনীতির একটা সামগ্রিক ধারণা দিতে পারতেন অধ্যাপক অম্লান দত্ত। তখন ইতিহাস নিয়ে সাম্যবাদের বাইরে কথা বললেই তাঁকে আমরা আমেরিকার দালাল বলে সন্দেহ করতাম। এর ফলে ইংল্যান্ডে ও ফ্রান্সে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণের বাইরে অবস্থান করে সমাজতন্ত্র বিষয় নিয়ে নানা আলোচনাকে তখন আমরা উপেক্ষা করেছি। অম্লানবাবু অনেক বই নিয়ে পাঠ্য তালিকা তৈরি করার থেকেও মৌলিক অল্প কিছু বইয়ের উপরে নির্ভর করে স্বাধীন ভাবনায় বিশ্বাস করতেন। নিজেরা ভিতরে ভিতরে সাম্যবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েও তাঁর সহজ সাবলীল বাচনভঙ্গির জন্য আমরা মন দিয়ে পড়ানো শুনতাম। কিন্তু সব সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি কি জানতাম না। গাণিতিক পদ্ধতিকে বেশি সমীহ করতাম। কিন্তু গণিতের যৌক্তিক ভিত্তি পাকা করা হয়নি বলে গণিতের স্বাধীন প্রয়োগেও পোক্ত হতে পারিনি। তত্ত্বকে মাথায় তুলে প্রয়োগের দিকটা অবহেলা করাতে বাস্তব ক্ষেত্রেও বিশেষ ঠাঁই জুটল না।

আমাদের সময় অনেকের মধ্যে খুব একটা ইকনমিক্স পড়ার দিকে ঝোঁক হয়েছিল। এই ঝোঁকটা স্বাধীনতার পরে হল নাকি আগেও ছিল, বলতে পারবো না। ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান পড়েও এমনকি খুব ভাল ফল করেও অনেকে অনার্সে ইকনমিক্স পড়তে আসতো। আমাদের সময় তো দুটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হল অমর্ত্য সেন ও অশোক সঞ্জয় গুহ। দুজনেই আইএসসি-তে ফার্স্ট হয়েছিলেন। তারপরে বিজ্ঞানের দিকে না গিয়ে তাঁরা ইকনমিক্স পড়তে এলেন। সম্ভবত এই রকম একটা পুরোনো দৃষ্টান্ত হল সত্যেন্দ্রনাথ সেন। তিনি খুব সম্ভব ১৯৩০-৩১-এ ইকনমিক্স অর্নাস পাশ করেন, তিনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। সম্ভবত তিনি আইএসসি-তে ফার্স্ট হয়ে ইকনমিক্স অর্নাস পড়তে এসেছিলেন।

যাই হোক আমরা যখন ইকনমিক্স অর্নাস পড়তে আসছি সেই সময় দেশে সদ্য স্বাধীনতার হাওয়াটাই চলছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা— এইরকম সময়। কিংবা হয়তো তারও আগে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে ব্যাপারটার শুরু। সেই সময় আইএসসি-তে ভাল ফল করে ছেলেরা ইকনমিক্স পড়তে আসছে। ইকনমিক্স পড়তে এসে একটা সাধারণ ধারণা ছিল যে অঙ্ক শেখাটা খুব জরুরি। ফলে অনেক দিন থেকে, হয়তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে থেকেই ইকনমিক্স অর্নাসের সঙ্গে, ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে অঙ্ক নেওয়ার একটা রীতি ছিল। আমাদের সময় এটা না হওয়াটাই ছিল ব্যতিক্রম। আমাদের সময় এই রকম একটা খুব উল্লেখযোগ্য ব্যাতিক্রম হল প্রণব বর্ধন— আইএ পড়েছেন আইএসসি নয়। এবং বিএ-তে ইকনমিক্স অনার্সের সঙ্গে অঙ্ক নেননি। পরবর্তী জীবনে অধ্যাপনা এবং গবেষণার সময় প্রণব বর্ধন নিঃসন্দেহে অর্থনীতিতে গণিত প্রয়োগে সারা পৃথিবীতে অগ্রগণ্যদের মধ্যে একজন হয়েছেন। সাধারণত এটা হয় না। অঙ্ক এমন একটা বিষয়, যেটা প্রথা মাফিক ক্লাস করে না শিখলে শেখা খুব শক্ত।

ইকনমিক্সে অঙ্কের প্রয়োগ কিন্তু বস্তুত ব্যাপকভাবে উনিশ শতকের শেষ থেকেই শুরু হয়ে গেছে। প্রথমেই নাম করতে হয় অ্যালফ্রেড মার্শালের। তিনি কেম্ব্রিজ থেকে অঙ্কে স্নাতক স্তরে প্রথম বিভাগে খুব উঁচু জায়গা নিয়ে পাশ করেছিলেন। তখন পদার্থ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার দিকে যাবেন কি না ভাবছেন। ওদের সমসাময়িক ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক চেতনাসম্পন্ন বন্ধু ছিলেন সিজউইক। আর এই বন্ধুত্বের প্রভাবেই শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্য এবং অর্থনৈতিক বিপন্নতার চেহারার দিকে মার্শালের নজর পড়ল। বিভিন্ন দেশে মার্শালের সমসাময়িকদের মধ্যে ওয়ালরাস, উইকসেল, প্যারেটো গণিতের সাহায্যে তাদের সব তাত্ত্বিক ভাবনার বিকাশ করছেন। খোলাখুলিভাবে যারা গণিতের প্রয়োগ করছেন না, তাঁরাও আলোচনায় যে যুক্তির ধারা অনুসরণ করছেন তা নিঃসন্দেহে গাণিতিক। সাধারণভাবে বিশ শতকের গোড়া থেকেই অর্থনৈতিক তত্ত্বের যে বিকাশ ঘটছিল— তখন তো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের জায়গা ইউরোপ— সেখানে অর্থনীতি তত্ত্ব কিন্তু বেশ ভালরকম গণিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছিল। এ সত্ত্বেও কলকাতাতে এবং কলকাতাই তখন অর্থনীতি চর্চায় ভারতবর্ষের মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য জায়গা— এখানে ছাত্রদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা ধারণা ছিল যে খানিকটা তর্কশাস্ত্রের মেজাজেই অর্থনীতির বিকাশ ঘটেছে। তখন এ দেশে অর্থনীতি পাঠের জন্য

গণিত জানার আবশ্যকতা সম্বন্ধে চেতনা ছিল না। আমি পরে আমার আগের প্রজন্মের অর্থনীতিতে বিএ, এমএ পাশ করেছেন এমন অনেককে বলতে শুনেছি— ''আমাদের সময়ে ইকনমিক্সে অঙ্ক ছিল না। আমরা মার্শাল পড়তাম।'' অথচ তাঁরা নিশ্চয় কখনোই মার্শালের বইটা উল্টে দেখেননি যে বইয়ের অ্যাপেন্ডিক্স-এ, অর্থাৎ বইয়ের সংলগ্ন অংশে একেবারে খোলাখুলি ভাবে অঙ্কের প্রয়োগ আছে । ক্যালকুলাসের প্রয়োগ আছে এবং ক্যালকুলাস প্রয়োগ করে যে সমস্ত সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, সেই ইঙ্গিতের ভিত্তিতেই বইয়ের মূল অংশে বক্তব্য তৈরি করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের দেশে চল্লিশের দশক পর্যন্ত মার্শালের বইকে পাঠ্যপুস্তক বললেও এর পিছনে যে যুক্তির কাঠামোটা গণিতভিত্তিক সে সম্বন্ধে একেবারেই ছাত্ররা ওয়াকিবহাল ছিলেন না।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে গণিতের খোলাখুলি প্রয়োগ যে হতে লাগল তারও আবার একটা কারণ হল যে ত্রিশের দশকে ইংল্যান্ডে এবং আমেরিকায় অর্থনীতি তত্ত্বে খুব উল্লেখযোগ্য সমন্বয় করা হয়েছে। অর্থাৎ তত্ত্বের নানা দিককে সার্বিকভাবে সমন্বিত করা হয়েছে। যেমন ইংল্যান্ডে হিক্স করেছেন আমেরিকাতে স্যামুয়েলসন করেছেন— আর একজন শিকাগোতে ঠিক একই কাজ করছিলেন তাঁর নাম হেনরি সুলজ্। তিনি অল্প বয়সে আল্পস পাহাড়ে উঠতে গিয়ে মারা গিয়েছিলেন। যাই হোক এটা ছিল অর্থনীতির বিভিন্ন দিককে সমন্বিতকরণে উদ্যোগ। একটা বাংলা শব্দ প্রচলিত আছে— শব্দটা খুব স্পষ্টভাবে অর্থবহ নয়— সামান্যিকরণ। এটাকে ইংরাজিতে বলে জেনারালাইজেশন। এই সমস্ত কাজ, প্রধানত হিক্সের, স্যামুয়েলসনের কাজ আর সেই সব কাজের গাণিতিক অংশ— আর জি ডি অ্যালেনের বইতে আলাদা করে এনে— অঙ্ককে আলোচনার সামনের দিকে নিয়ে আসা হল। ফলে অঙ্ক— মার্শাল, ওয়ালরাস, উইকসেল, প্যারেটো এমনকি মেঙ্গারেও যেটা ভিত্তিতে ছিলই সেটাকে— খোলাখুলিভাবে ত্রিশের দশকে সামনে আনা হল। আমাদের দেশে অর্থনীতি চর্চায় অঙ্কর ব্যবহার আসতে আসতে প্রায় পঞ্চাশের দশক হয়ে গেল। পঞ্চাশের দশকে যখন এটা আসলো অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের অর্ন্তভুক্ত হয়ে গেল, তখন থেকেই অর্থনীতির গাণিতিক কাঠামোটা যে অপরিহার্য এই রকম একটা ধারণা তৈরি হল।

এই ধারণাটা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বোধহয় আমাদের দেশে বিশেষ করে কলকাতায় সবাই বলতে শুরু করল যে অথনীতিটা একটা সায়েন্স। যেমন ফিজিক্স একটা সায়েন্স, কেমিস্ট্রি একটা সায়েন্স

সেই রকম ইকনমিক্সও হল সায়েন্স। কলেজে পাঠক্রমের একটা মোটা ভাগ আছে আর্টস ও সায়েন্স। এছাড়া আরেকটা ভাগ আছে যেটাকে কলকাতা সমাজে গৌণ বলে ভাবা হত সেটা হচ্ছে কমার্স। আমি কলকাতা সমাজ কথাটার উপর একটু জোর দিচ্ছি। এই গৌণ বলে ভাবাটা কিন্তু অন্যত্র হত না। এই নিয়ে তখন নানা রকমের কথাবার্তা চলছিল, যেগুলি আজকে পিছন দিকে তাকিয়ে মনে হয় অনেকটাই বিভ্রান্তিকর। যেমন কোনও একটা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে যে সব বিষয়গুলি পড়ানো হয়, তার মধ্যে গণিত থাকে। এবং গণিত কলা বিভাগেও পড়ানো হয়। তাছাড়া কেমিস্ট্রী, ফিজিক্স, বায়োলজি পড়ানো হয়। তখনকার দিনে বায়োলজির ধরন ছিল প্রায় সবটাহ এক্সপেরিমেন্ট করা। সবটাই অবজারভেশনের উপরে প্রতিষ্ঠিত। তখন বায়োলজির লোকেরা মনে করত যে, ল্যাবরেটোরি থাকাটাই হচ্ছে একটা বিষয়ের সায়েন্স হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়ার আবশ্যিক নিদর্শন। কেমিস্ট্রীতেও তাই। অতএব ইকনমিক্সে ল্যাবরেটোরি নেই, তাহলে কি ইকনমিক্সকে সায়েন্স বলা যায়? এই সায়েন্স না সায়েন্স নয় এই বৃথা তর্ক পাঠক্রমকে কতটা প্রভাবিত করেছে, আজকে পিছন দিকে তাকিয়ে বলা শক্ত। কিন্তু সাধারণভাবে এই ধরনের কথাবার্তা ইকনমিক্স বিষয়টার সম্বন্ধে ধারণা তৈরি করতে খানিকটা অসুবিধা সৃষ্টি করেছে।

অর্থনীতি অনার্সের ক্লাসে ঢুকেই ছাত্রদের কিছুদিন বোঝানোর চেষ্ঠা হয় যে আর্থনীতি কিন্তু একটা সমাজ বিজ্ঞান। অর্থনীতি কী?— এই ধরনের দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে লেখা পত্র হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থনীতির পাঠের গোড়াতেই অর্থনীতির সংজ্ঞা বোঝানোর জন্য শিক্ষকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এর ফলে বিষয়বস্তু না জেনেই প্রকৃতি বা চরিত্র নিয়ে দার্শনিক গোলোক ধাঁধার মধ্যে পড়ে ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়। অর্থনীতি কী— এই সব প্রশ্ন ছাত্রদের কাছে পাঠক্রমের শুরুতে না আনাই ভাল। ইতিহাস পড়ানোর সময় ইতিহাস কী?— ফিজিক্স পড়ানোর সময় ফিজিক্স কী?— এই ধরনের কথাবার্তার মধ্যে ছাত্রদের পড়তে হয় না। অর্থনীতিকে বলা হয় সমাজ বিজ্ঞান। সমাজ কথাটার এখানে একটা গুরুত্ব আছে। যে কোনও মানুষ তো সমাজেই বাস করে। তার পরিবারও এক ধরনের সমাজ, তাঁর প্রতিবেশীদের নিয়ে যে বাসের অঞ্চল সেটাও একটা সমাজ ইত্যাদি। সমাজবদ্ধ মানুষের কাজকর্ম নিয়ে অর্থনীতিতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হওয়ার কথা। সমাজের বিজ্ঞানটা কী হতে পারে এটাও গোড়ার দিকে বোঝানোর চেষ্ঠা না করাই ভাল। গোড়ার দিকে এই ধরনের খানিকটা আলগা কথাবার্তায় সময় নষ্ট হয়। অর্থনীতির ক্লাসে প্রথম থেকে

দেখা যায় যে চাহিদা, যোগান, চাহিদার ভিত্তি, নিরপেক্ষ রেখা, উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রব্য ও উৎপাদনের উপকরণের মধ্যে সম্পর্ক, এই সব সরাসরিভাবে এবং স্পষ্টভাবে পড়ানো শুরু হয়। এর আগে অর্থনীতি সমাজ বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞান নয়, এইসব নিয়ে কথা শুরু করলে ছাত্রের কাছে স্পষ্টভাবে বিষয়টাকে ধরতে অসুবিধা হবে। এরপরে আর একটা যে কাণ্ড করা হয় সেটাও খুব গোলমেলে। অর্থনীতির মূল্য নিরূপণের আলোচনায়, মানে তথাকথিত বাজার সংক্রান্ত আলোচনায়, অর্থনৈতিক উৎপাদনে অর্থনৈতিক দক্ষতা অর্জন প্রসঙ্গে রবিনসন ক্রুসোর গল্প বলা হয়। রবিনসন ক্রুসো বিপদে পড়ে একেবারে সমাজের বাইরে অবস্থিত হয়েছেন। তাঁর তখন একমাত্র সম্বল ছিল নিজের শরীরের সামর্থ্য। নিজের শরীরের সামর্থ্যের উপরে নির্ভর করে বেঁচে থাকার জন্য যতটা সম্ভব উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে থেকে সংগ্রহকে সর্বাধিক করবার উদ্যোগকে দক্ষতার সম্পর্কিত বিষয় বলে বলা হয়। কিন্তু দক্ষতার প্রশ্নে রবিনসন ক্রুসোর গল্প বলা হয় কেন? রবিনসন ক্রুসো তো একেবারেই সমাজের থেকে নির্বাসিত। অতএব এখানে ওই গল্পটা না আনলেই ভাল হয়।

এখন সমাজ বলতেও যেটুকু মাত্র প্রথাগত আর্থনীতি পাঠে প্রাসঙ্গিক, সেটা হল কেনাবেচাতে মানুষে মানুষে সম্পর্ক। মনুষই জিনিস কেনে, মানুষই জিনিস বেচে। জিনিস কেনে এবং বেচে বলে বিভিন্ন মানুষ তার সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী এক একটা বস্তু উৎপাদনে যথাসাধ্য সামর্থ্য নিয়োগ করতে পারে। প্রয়োজন মত জিনিস কেনবার এবং সাধ্যমত জিনিস বেচবার সুযোগ থাকে বলেই কোনও ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সব কিছু নিজেকে বানিয়ে নিতে হয় না। এই যে কেনা-বেচা জাতীয় কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে যেটুকু মানুষে মানুষে আদান-প্রদান, অর্থনীতির প্রথাগত পাঠক্রমের মধ্যে সেইটকু সামজিক সম্পর্কই শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক। সন্ধ্যা বেলায় দিনের কাজের শেষে চণ্ডীমণ্ডপে বসে, কিংবা ক্লাবে বসে অবসর বিনোদনের জন্য কীর্তন শোনা বা তাস খেলা ব্যাপারটা নয়। এমন কি পাড়ার ছেলেদের এক সঙ্গে হয়ে পাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, পাড়াকে অপরাধ বা দুর্বৃত্তের র হাত থেকে বাঁচানো— এই ধরনের সামাজিক কাজকর্ম সাধারণভাবে অর্থনীতির বিষয়বস্তু নয়। যদি দেখা যায় সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে বসে বৈষ্ণব সাধনা বা কীর্তন করতে করতে মানুষরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের বেচা-কেনার সম্বন্ধে কিছু খবর পাচ্ছে বা বেচা কেনার নতুন কোনও সুযোগ পাচ্ছে, তা হলে অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক সামাজিক সম্পর্কের বিষয়টা এখানে আসছে বলে ধরা

যেতে পারে। শুধুমাত্র এক সঙ্গে বসে কীর্তন গান করাতে নয়। ঠিক সেইরকমই যদি ভাবা যায় যে পাড়ার ছেলেরা পাড়াকে অপরাধ থেকে মুক্ত করতে পারলে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারলে ফেরিওয়ালারা নিশ্চিন্তে এই পাড়ায় বিক্রি করতে আসতে পারবে। পাড়ার লোকেদের ভোগ্যপণ্য পেতে সুবিধা হবে। তা হলে চণ্ডীমণ্ডপ বা পাড়ার ছেলেদের ক্লাবের কাজকেও অর্থনীতির দিক থেকে বিচার করলে সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক বলে ধরা যাবে। কেনা বেচার সঙ্গে যুক্ত না হলে অর্থনীতির দিক থেকে প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না।

অর্থনীতিকে সমাজ বিজ্ঞান বলা হয়। বিজ্ঞানের কথা আগে বলা হয়েছে। এরপরে বলা হল মানুষে মানুষে শুধুমাত্র বেচা-কেনার যে সম্পর্ক, সেটুকু নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ, এটাই অর্থনীতির সমাজ সংক্রান্ত কথা। অনেকেই এখানে দ্বিমত হতে পারেন এই বলে, যে শুধুমাত্র ব্যক্তি নয় সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণটা পার্থিব জগতের বিষয়। সমাজে পরস্পরের সঙ্গে নানাভাবে সম্পর্কিত অনেক মানুষের সামগ্রিকভাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকার সুযোগটাও তো অর্থনীতির অঙ্গীভূত হাওয়ার কথা। সবার সুস্থভাবে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকার সুযোগ অনেকটাই সামাজিক সম্পর্কর উপরে নির্ভর করে। জীবন ধারণের জন্য উপযোগী কতগুলি নির্দিষ্ট দ্রব্য এবং সেবা আবশ্যক। উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস প্রাপ্তি বা প্রাপ্তির সুযোগ, সব মানুষেরই থাকা দরকার। জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পাওয়ার উপরে কল্যাণ নির্ভর করে। কেনা-বেচার সম্পর্কের থেকেও বড় কথা খেয়েপরে বেঁচে থাকার অধিকার অর্থনীতির মত বিষয়ের সমাজ ভাবনার মধ্যে পড়বার কথা।

অর্থনীতির ক্লাসে এসে ছাত্ররা গোড়া থেকে শুনছে যে অর্থনীতি হল সোশাল সায়েন্স। সমাজ বিজ্ঞান চর্চার একটা অঙ্গ। এখন সমাজ বলতে কিছু ধারণা চারদিক দেখে ছাত্রদের হয়, সাধারণ মানুষের হয়। বিভিন্ন মানুষ নানা রকম সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করে। সম্পর্কগুলি আচরণের বিধি বা আচরণের পদ্ধতি নির্ণয় করে। এখন অর্থনীতিতে আলোচনার ক্ষেত্র যদি হয় শুধুমাত্র বাজার তা হলে এখানে সমাজ বলতে ক্রেতা আর বিক্রেতার যোগাযোগকেই শুধু নেওয়া হবে। বাজারকেন্দ্রিক আলোচনায় সমস্ত বিচার সীমিত রাখলে পরস্পরের মধ্যে সহযোগের প্রশ্ন বা অভিজ্ঞতা অর্ন্তভুক্ত করার কোনও কথাই উঠবে না। অর্থনীতিতে ক্রেতা আর বিক্রেতার যে সহযোগ বা যোগাযোগ তার মধ্যে স্বার্থ সিদ্ধির বেশি আর কিছু বিবেচনার মধ্যে আনা হয় না। অর্থনীতি তত্ত্বে আলোচনার ধারাটা যেভাবে চলেছে, তাতে প্রায়

স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে যে,ক্রেতা বিক্রেতার যোগাযোগের অন্তর্নিহিত প্রতিযোগী মনোভাব, মানুষের সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। কল্যাণ এখানে স্বার্থভিত্তিক প্রতিযোগিতার ফল বলেই গৃহীত হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটি ব্যক্তি ক্রেতা হিসাবে বা বিক্রেতা হিসাবে যেমন একদিকে স্বাধীন তেমনই আবার অন্যদিকে সম্পূর্ণ একা। ক্রেতাদের সঙ্ঘ যদি কখনও গঠিত হয়, বা বিক্রেতাদের সঙ্ঘের কথা যদি কখনও ভাবনাতে আনা হয় সেটাও সঙ্ঘের অর্ন্তভুক্ত ক্রেতা বা বিক্রেতার সম্পূর্ণ ব্যাক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে বিবেচনাতে আসে। এই বাজার ভিত্তিক আলোচনার থেকে অন্যভাবে বা বৃহত্তরভাবে সমাজের কথা ভাবতে গেলে রাজনীতির কথা এসে পড়বে।

পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত অর্থনীতি চর্চায় সমাজের প্রসঙ্গিকতা তো শুধুমাত্র প্রতিযোগিতায়। কিন্তু সাধারণভাবে সমাজ বললে সহযোগিতার কথাটা মাথায় আসে। অর্থনীতি পাঠক্রমে প্রতিযোগিতার অর্থাৎ বাজারের তুলনামূলক গুরুত্ব এত বেশি যে সহযোগিতার কথা প্রায় বাদ পড়ে যায়। অর্থনীতি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত শ্রেণী সংগ্রাম সর্ম্পকিত লেখায় বাজারভিত্তিক বিশ্লেষণের প্রবলভাবে সমালোচনা করা হয়েছে। সেখানে শ্রেণীকে এক ধরনের সামাজিক গঠন বলে ভাবা হয়ে থাকে। শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক এক ধরনের অর্থনৈতিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে সেটা গৃহীত হয়ে থাকে। এই শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক আলোচনার লক্ষ্য হল অবশ্য সব দিক থেকে শ্রমিক পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা অর্থাৎ সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করা। শ্রমিক পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা কী হতে পারে? সেটার তো অভিজ্ঞতা কোথাও হয়নি। এখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি কোনও একটি রাজনৈতিক দলের সম্পূর্ণ অধিকারভুক্ত হয়, তা হলে সামাজিক সংগঠনগুলি সবই সেই রাজনৈতিক দলের দ্বারা গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কমিউনিস্ট সরকার যেখানে যেখানে হয়েছে, সেই সব জায়গাতেই সব রকম সামাজিক সংগঠন, সে ছাত্রই হোক, বিভিন্ন কাজ ভিত্তিক শ্রমিক সংগঠনই হোক, মহিলা সংগঠনই হোক, কৃষক সংগঠনই হোক, সবই ওই রাষ্ট্র পরিচালক যে রাজনৈতিক দল তার অধিকার বা নিয়ন্ত্রণভুক্ত হতে দেখা গেছে। আজকের যুগে অর্থনৈতিক শ্রেণী নির্বিশেষে সব রাজনৈতিক দলই নিরপেক্ষ সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছে।

সমাজ বিজ্ঞানের দিক থেকে ভাবলে একটা রাষ্ট্র এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বাতন্ত্র্য থাকা দরকার। এই রকম ব্যবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ বলবেন বহুজন সাপেক্ষ ব্যবস্থা। বহুজন সাপেক্ষতা, অর্থাৎ প্লুরালিজম, প্রকৃত গণতন্ত্রের একটা প্রধান

ভিত্তি। প্লুরালিজমের ক্ষেত্রে সামাজিক সংগঠনগুলি রাষ্ট্রের থেকে খানিকটা স্বাধীন বা স্বনিয়ন্ত্রিত হবে বলে মনে করা যেতে পারে। বিশেষ করে যে দল রাষ্ট্র পরিচালনা করছে সেই দল সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হবে এটাই কাম্য। এক-একটা সমিতি বা সঙ্ঘ এক এক ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে সংগঠিত মানুষদের কাজকর্মের ক্ষেত্র। এই সংগঠনের কাজকর্ম কীভাবে চলবে, এই সংগঠনের ভিতরের মানুষরা তাঁদের উদ্দেশ্যর প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজেদের ক্রিয়া— অ্যাকশন— কীভাবে স্থির করবে এটা অর্থনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে আলোচনাতে আসার কথা। এইখানে পাবলিক পলিসির কথা আসছে। পাবলিক পলিসি নির্ধারণের জন্য— লক্ষ্য, পদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য— বিভিন্ন মানুষের পছন্দ অপচ্ছন্দকে কীভাবে সমন্বিত করা হবে, এবং সেই পছন্দ অপচ্ছন্দ সমন্বিত করে কর্ম পদ্ধতি কীভাবে নির্ধারিত হবে, এক দিক থেকে এটা পলিটিক্যাল ইকনমির ব্যাপার বলা যেতে পারে। পলিটিক্যাল ইকনমি বলতে সাধারণভাবে শ্রেণী সংগ্রামভিত্তিক, শ্রেণী স্বার্থভিত্তিকি অর্থনীতির কথা ভাবা হয়েছে। শ্রেণী স্বার্থভিত্তিক অর্থনীতি চর্চাতে শুধুমাত্র সম্পত্তি র অধিকারের লড়াই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু অন্য দিকে পলিটিক্যাল ইকনমি বলতে বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের অর্ন্তভুক্ত মানুষদের শ্রেণী নির্বিশেষে কাজকর্ম করা, উদ্দেশ্য স্থির করার বিষয় নিয়েও ভাববার কথা ।

পাবলিক ইকনমিক্স বা পাবলিক পলিসি সংক্রান্ত ইকনমিক্স আজকের যুগে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। আজকে নানা রকম নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলায় এগুলি খুব প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। যেমন এনভায়রোনমেন্ট স্টাডিজ বা পরিবেশ অধ্যয়ন। এটা অবশ্যই পাবলিক পলিসির অর্ন্তভুক্ত। সমাজে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সমিতিতে কিছু কিছু মানুষ সংগঠিত হয়। সংগঠনে সমন্বিত মানুষরা আবশ্যিক ভাবে কোনও নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা কোনও একটা অঞ্চলের আবাসিক হতে পারে, কোনও একটা বিশেষ অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষ হতে পারে অথবা ধর্ম বা সংস্কৃতির দিক থেকে এক মতের মানুষ হতে পারে । অর্থনীতিতে সমাজ বলতে শুধুমাত্র বাজার এবং প্রতিযোগিতায় দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রাখার ফলে পাবলিক ইকনমিক্সের অন্য দিক যেমন পরিবেশের দিক অথবা সীমিত সংস্থান, যেমন জল, সংরক্ষণের দিক নিয়ে চর্চা প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়নি। পাঠ্যসূচিতে অনেক মানুষের সম্মিলিত বা যৌথভাবে বিবেচিত স্বার্থ সংক্রান্ত বিষয়বস্তু গুরুত্ব কম পাচ্ছে, অবহেলিত হচ্ছে। বোধহয় পূর্ব ভারতে বিশেষ করে কলকাতাতে পাবলিক

ইকনমিক্সের অবহেলাটা বেশি। পশ্চিম ভারতে বা দক্ষিণ ভারতে অর্থনীতিতে পাবলিক পলিসি অনেক বেশি পড়ানো হয়। একটা সময় এমন গেছে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কলকাতায় ম্যাক্রোইকনমিক্সটাতেও শুধুমাত্র জেনারেল ইকুইলিব্রিয়ামের আলোচনা হত। অর্থাৎ আলোচনাতে একত্রিতভাবে কতগুলি সম্পদের পরিমান এবং বিনিময় মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারের বেশি কিছু ভাবা হত না। যখন প্যাটিনকিনের লেখার উপরে, বা ওই ধরনের অর্থনীতি আলোচনার পদ্ধতির উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন ম্যাক্রোইকনমিক্স পঠন পাঠনে এমনকি রাষ্ট্রর কাজকর্মর ব্যাপারটার উপরেও ততটা দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল অন্য দিকে সেই সময় কিন্তু ডেভলপমেন্ট ইকনমিক্স বা উন্নয়ন সম্পর্কিত অর্থনীতির তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটছে। সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা অনিবার্য বলে ভাবা হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও ম্যাক্রোইকোনমিক্সটা প্রায় এক ধরনের জেনারেল ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যেই সীমিত থেকেছে। কলকাতাতে পঠনপাঠনে এটা যতটা হয়েছে, ততটা কিন্তু পশ্চিম ভারতে বা দক্ষিণ ভারতে ঘটেনি।

কলেজের অর্থনীতির পাঠক্রম দেখে মনে হয় মানুষে মানুষে চাহিদা এবং যোগানের ভূমিকা এবং চাহিদা ও যোগানের আদান-প্রদানের কথা শুধুমাত্র বিবেচনা করেই অর্থনীতিকে সমাজ বিজ্ঞান বলা হয়। চাহিদা, যোগান, বাজার এই কটি বিষয় বিশেষভাবে অধ্যয়নযোগ্য বলে গ্রহণ করা হয়। আমাদের সময় প্রায় সমস্ত নজরটাই বাজার এবং বিশেষ করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের উপরে ছিল। আমাদের সময় যদিও পৃথিবীর অনেকগুলি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। অর্থনৈতিক উন্নয়ন যে রাষ্ট্র এবং বহুজাতিক রাষ্ট্র সঙ্ঘের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়, এটাও রাষ্ট্রীয় পরিচালকরা সবাই বুঝেছিলেন। এত সত্ত্বেও অর্থনীতির পাঠক্রমে ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের সঙ্গে রাষ্ট্রের অর্থনীতি সংক্রান্ত কাজকর্ম যাকে বলে পাবলিক ফিনান্সের যোগ অতি সামন্য ছিল। পাঠক্রম দেখে পাবলিক ফিনান্স অর্থনীতির পাঠক্রমের মূল ধারার বাইরে একটা সংযোজন বলে মনে হত।

পাঠক্রমের বিষয়বস্তুতে চাহিদা, যোগান, বাজারের প্রধান নিয়ন্ত্রণের ধরন হল প্রতিযোগিতা। পাঠ্য বিষয়ে বলা হত যে প্রতিযোগিতা যত বেশি— যারা চাহিদা করে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, যারা যোগান দেয় তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা যত বেশি— অর্থনীতির ফলাফলের সার্থকতা তত বেশি। তখন ওয়েলফের ইকনমিক্স বলে পাঠক্রমে একটা অংশ ছিল। এই ওয়েলফের ইকনমিক্সেও প্রাথমিক শর্ত থেকে ক্রম বিকশিত বিভিন্ন ফলাফলে বাজারের

প্রতিযোগিতাকে অত্যাবশ্যক বলে প্রতিষ্ঠা করা হত। প্রতিযোগিতাকে নানাভাবে বাধা মুক্ত করবার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের আবশ্যিক কর্তব্য বলে ভাবা হত। অর্থাৎ রাষ্ট্রের কাজকর্মের আলোচনায় প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সহায়কের ভূমিকা প্রধান বলে বিবেচিত হত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রের কল্যাণমূলক ভূমিকা পালনের জন্য রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের বিন্যাস করা হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের আয়-ব্যয়ের বিস্তৃত চেহারা বা ছবি রাষ্ট্রের বাজেটে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। বাজেট রচনার পদ্ধতি এবং অর্থনীতির উদ্দেশ্যগত বিভিন্ন দিকের সঙ্গে বাজেটের সম্পর্কের সম্বন্ধে প্রায় কোনও খবরই আমাদের তখনকার পাঠক্রমের ভিতরে ছিল না। আমাদের পাঠক্রমে বাজারই সব কিছু বলে ধরে নেওয়া হত।

মাইক্রোইকনমিক্সে তো বটেই, ম্যাক্রোইকোনমিক্সেও বাজার সম্পর্কিত জেনারেল ইকুইলিব্রিয়াম পাঠই প্রাধান্য পেয়েছে। পাবলিক ফিনান্স বা পলিসি বা প্রয়োগ সম্পর্কিত সবটাই সংযোজিত অংশ। এইভাবে তখনকার কলকাতার অর্থনীতি পাঠক্রম রচিত হত। অন্য দিকে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে, অর্থাৎ বম্বে, পুনা, আমেদাবাদ, বরোদা এবং দক্ষিণপ্রান্তে অর্থাৎ মাদ্রাজ, ব্যাঙ্গালোর এই সমস্ত জায়গায় বাজার নিয়ন্ত্রিত বিষয়টির বাইরে প্রয়োগ সম্পর্কিত অর্থনীতির গুরুত্ব অনেক বেশি ছিল। ওই সব জায়গায় সরকারি নিয়ম কানুন বাজেট তৈরি, বিধি ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্ররা পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে অনেকখানি ওয়াকিবহাল হত। পাঠক্রম রচনায় ইকনমিক পলিসিকেকে গুরুত্ব অনেক বেশি দেওয়া হত। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে গ্রোথ থিয়োরিকে ডেভলপমেন্ট ইকনমিক্সেরই একটা সর্ম্পকিত অংশ হিসাবে পড়ানো হত। কিন্তু কলকাতা এবং বাংলায় গ্রোথ ইকোনমিক্স ছিল প্রধানত ইকুইলিব্রিয়ামেরই বা জেনারেল ইকুলিব্রিয়ামেরই একটা প্রসঙ্গ। গ্রোথ ইকোনমিক্স যে ডেভলপমেন্ট থিয়োরির বিশ্লেষণের সহায়ক বিষয়— উন্নয়ন সম্পর্কিত তত্ত্ব বোঝার জন্য পাঠক্রমের অঙ্গ, এইভাবে কলকাতাতে ততটা ভাবা হত না। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি যাকে প্রধানত আমাদের এখানে থিয়োরি বলে ভাবা হত, তার গুরুত্ব খানিকটা কম রেখে উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনীতি সম্বন্ধে ছাত্রকে বেশি ওয়াকিবহাল করা হত।

বাজার ও তার পিছনে চালিকা শক্তি হিসাবে প্রতিযোগিতার প্রসঙ্গ বিবেচনা করা হয়। প্রতিযোগিতা, বাজার ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণাগুলিকে সামাজিক সর্ম্পক জনিত বিষয় বলে ভাবা হয়। কিন্তু প্রতিযোগিতার পাশাপাশি অন্য একটা শব্দ

বাংলাতে বলা যেতে পারে, এই শব্দটা হল সহযোগিতা। সহযোগিতা মানুষের মধ্যেই হয়। সহযোগিতা সমাজের একটা বড় গুণ বলে সাধারণ মানুষ স্বভাবতই মনে করে। সাধারণ মানুষ, যে কলেজে অর্থনীতি পড়েনি, তার কাছে সমাজ বললে প্রথমেই সহযোগিতার কথা মাথায় আসবে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের কাছে সহযোগিতা যতটা সমাজের পক্ষে অপরিহার্য বলে গৃহীত হয়ে থাকে প্রতিযোগিতা ততটা নয়। সহযোগিতার তুলনায় সামাজিক বিষয় হিসাবে প্রতিযোগিতা অনেক গৌণ। কিন্তু সহযোগিতার কথা অর্থনীতির পাঠক্রমে একেবারেই প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ওয়েলফেয়ার ইকনমিক্সে সহযোগিতার প্রসঙ্গ খানিকটা আলগাভাবে এসে পড়তে পারে, সব সময় যে আসে এমন নয়। পাবলিক ফিনান্সে সহযোগিতার ধারণা আলোচনার ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়েছে বলে ভাবা হয়ে থাকে। কিন্তু ভিত্তি হয়েছে কীভাবে তার ব্যখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় না।

সমাজ বিজ্ঞান হিসাবে তা হলে দাঁড়াচ্ছে যে অর্থনীতি চর্চাকে দুটো দিক থেকে দেখা যায়। একটা প্রতিযোগিতামূলক সমাজ আর একটা সহযোগিতামূলক সমাজ। সমাজে মানুষের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য সুযোগ সুবিধা সংগ্রহের একটা প্রতিযোগিতা আছে, এটা বাস্তব। আবার সহযোগিতা না থাকলে এবং সহযোগিতার উপোযোগী পরিবেশ, ব্যবস্থা ইত্যাদি না থাকলে মানুষ যে বেঁচে থাকতে পারে না, এটাও সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে অর্থনীতি তত্ত্বের অধিকাংশ জুড়ে বাজার সম্পর্কিত আলোচনার দ্রুত বিকাশ ঘটেছে। অর্থনীতি তত্ত্ব বলতে এখন সাধারণভাবে ছাত্রদের যা পড়ানো হয়, সেগুলি ভাগ ভাগ করে মাইক্রোইকনমিক্স, ম্যাক্রোইকনমিক্স, ইন্টারন্যাশানাল ট্রেড ইত্যাদি বলে উপস্থিত করা হয়। সেগুলি সবই বাজারের নানারকম অবস্থার আলোচনা। এখানে মানুষ বা প্রতিষ্ঠানকে যৌথ হিসাবে দেখা হয় না, এককভাবে দেখা হয়। এককভাবে কাজকর্মে রত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাজারের উৎকর্ষ বা বিকাশ ঘটায়। প্রতিযোগিতা বাজারের অঙ্গীভূত মানুষদের বা প্রতিষ্ঠানগুলির, যারা বাজারে যোগদান করেছে তাদের, দক্ষতা বাড়ায়। প্রতিযোগিতা, দক্ষতা বৃদ্ধি, সার্থকতা এই সবই একটা বাজারের ভারসাম্যের নির্ধারক। ফলে প্রতিযোগিতা, দক্ষতা, এককভাবে সার্থকতা অর্জন, সব কিছুই বাজারের ভারসাম্যের অবস্থার মধ্য দিয়ে পাওয়ার কথা। এই সব কথা কলেজের ছাত্র পাঠ্যের প্রায় সম্পূর্ণ অংশ দখল করে আছে। এককভাবে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সার্থকতা অর্জন এবং বিভিন্ন মানুষের প্রত্যেকের এককভাবে প্রয়াসের

মধ্যে ভারসাম্য ঘটানো এটাই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। আলোচনার মধ্যে বিশ্লেষণ এই একক মানুষের প্রতিযোগিতার লক্ষ্যকে মাথায় রেখে করা হয়েছে। একক মানুষদের প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সার্থকতা অর্জন বিষয়টি অধ্যয়নের পদ্ধতি হিসাবে গণিত এসেছে। বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে যে ধরনের গণিত এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেই ধরনের গণিতের লক্ষ্য হল বিভিন্ন রকম প্রতিযোগী প্রবণতার মধ্যে একটা ভারসাম্য আনা। এই ভারসম্যকে কখনও বলা হয় ইকুইলিব্রিয়াম কখনও উদ্দেশ্যর কথা বিচার করে বলা হয় অপটিমাইজেশন।

প্রতিযোগিতা তো সমাজের একটি দিক। পার্থিব সুখ সুবিধার বিচারে ভোগের অনুকূল অবস্থা নির্মাণের কথা ভেবে সহযোগিতার উপরেও তো অনেকটাই গুরুত্ব দেওয়ার কথা। সমাজ বন্ধন বলে একটা কথা আছে। এই সমাজ বন্ধন সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। কেবল মাত্র অর্থনীতির আলোচনার মধ্যে নিজের দৃষ্টি সীমিত রাখলেও মানুষের অস্তিত্বের জন্য সহযোগিতা অপরিহার্য। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, তা হলেও আলোচনার ক্ষেত্রের সীমানা বোঝানোর জন্য বলতে হয় রাস্তাঘাট, পয়ঃপ্রণালী, যথাযথভাবে না হলে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না থাকলে বাজার হাট করা যায় না। রাস্তা ঠিক মতো নির্মাণ না করলে ক্ষেত থেকে ফসল ক্রেতার কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না। অথবা বাজার থেকে ইট, সিমেন্ট, বালি রাস্তা না থাকলে বহন করে এনে মানুষ বাড়ি বা আশ্রয়ের জায়গা তৈরি করতে পারে না। আর এই কোনওটাই সুস্থভাবে করা যায় না যদি প্রতারক বা ঘাতক মানুষের হাত থেকে আত্মরক্ষার বা সুরক্ষার ব্যবস্থা না থাকে। এই নিরাপত্তা বা সুরক্ষার ব্যবস্থা শুধু একটা পাড়া, একটা গ্রাম বা একটা শহরের ব্যাপার নয়।অনেক গ্রাম অনেক শহর অনেক বিস্তীর্ণ জায়গা নিয়ে, রাস্তাঘাট নির্মাণ, মেরামত, দূষণ দূর করা, নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তারপরে আসছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলার প্রশ্ন। এগুলি একা মানুষের কাজ নয়, অনেক মানুষ এক সঙ্গে হয়ে খুব নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন বিধি ব্যবস্থা অনুসরণ না করলে করতে পারে না।

অনেক মানুষ একসঙ্গে হয়ে যে বিধি ব্যবস্থা স্থির করবে, সেই বিধি ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার জন্য মানুষদেরই আবার একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে হয়। নিয়ম করা হল কিন্তু কেউ মানছে না। সেই নিয়ম যা প্রয়োগ করা যায় না, মানুষ যেগুলি মানে না, সেগুলি থাকা না থাকা সমান। সামাজিক বিধি, নিয়ম কানুন তৈরি করা এবং সেগুলিকে প্রয়োগ করার জন্যই সরকার থাকে। সরকার তো আর কিছুই না, একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এই সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজবদ্ধ

মানুষরাই তৈরি করে। এবং সমাজবদ্ধ মানুষরাই সেই সরকারকে নিয়ম কানুন প্রয়োগ করবার জন্য উপযুক্ত অধিকার এবং শক্তি দেয়। অনেক মানুষের পছন্দ, প্রয়োজন বোধের ভিতর থেকে নিয়ম কানুন বের করা, অনেক মানুষের যে সমস্ত সাহায্য সেবা ইত্যাদি আবশ্যক, সেগুলির পরিমান নির্ধারণ করা— এ তো কোনও বাজারের প্রতিযোগিতা দিয়ে হয় না। ফলে অবশ্যই মানতে হবে যে, বাজারের প্রতিযোগিতা অর্থনীতিতেও মানুষের সমাজের বিশ্লেষণে একটি অত্যন্ত সীমিত দিক। মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের কথা মাথায় রেখে সহযোগিতার নানা রকমের রীতিনীতি নির্ধারিত হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। অর্থনীতি চর্চায় এই বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্ব দাবি করে। কোন ধরনের মানুষের সমাজ বা কোন দেশ সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার মধ্যে তুলনামূলক গুরুত্ব কতটা দেবে তা নিয়ে কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। আমেরিকাতে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব সুইডেন, নরওয়ের মতো রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতার গুরুত্বর থেকে বেশি। সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্কের মতো দেশে সহযোগিতাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে অনেক রকম অর্থনৈতিক কাজকর্ম রাষ্ট্রের আয়ত্তের অন্তর্ভুক্ত। সেগুলি আমেরিকাতে কিন্তু ততটা নয়।

অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কিত বিশ্লেষণ ও আলোচনাতে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের পাঠ্যসূচিতে প্রতিযোগিতা বা বাজারটাই প্রায় অধিকাংশ জুড়ে আছে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে এটা কেন। অর্থনীতিবিদরা কি সাধারণভাবে প্রতিযোগিতাকেই একমাত্র উল্লেখযোগ্য বলে মনে করে? হয়তো তা নয়। এমনও হতে পারে যে, সাধারণভাবে যে ধরনের গাণিতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি পাওয়া যায় সেটা প্রতিযোগিতামূলক সমাজের বিশ্লেষণের পক্ষে যতটা উপযোগী, সহযোগিতামূলক সমাজের বিশ্লেষণের জন্য ততটা নয়। সহযোগিতামূলক সমাজের বিশ্লেষণের জন্য একটু ভিন্ন ধরনের গাণিতিক পদ্ধতির প্রয়োজন আছে। এই ভিন্ন ধরনের গাণিতিক পদ্ধতি সম্ভবত অর্থনীতি চর্চায় প্রচলিত গাণিতিক পদ্ধতির থেকে কম ডিটারমিনিস্টিক। প্রতিযোগিতামূলক সমাজের আলোচনায় যতটা ডিটারমিনিস্টিক গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারতো, সহযোগিতামূলক সমাজের বিশ্লেষণে তার বদলে ইনডিটারমিনিসিম অনেক বেশি। এর মধ্যে এই আলোচনাতে আর যাওয়ার দরকার নেই। আমাদের দেশে এবং হয়তো পৃথিবীর সব দেশেই বিভিন্ন অর্থনীতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমস্যা নির্বাচনের ঝোঁক এবং সেই সঙ্গে বিশ্লষণ

পদ্ধতি অধ্যয়নের অভ্যাস বিভিন্ন রকম।

পশ্চিম বা দক্ষিণ ভারতে পাঠক্রমে সরকার, ব্যাঙ্ক নানা রকমের সমবায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নিয়ে বর্ণনামূলক তথ্যভিত্তিক পাঠক্রমের উপরে গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আমাদের দেশে কেন্দ্রের রাষ্ট্র পরিচালনায় এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন মন্ত্রক যেমন ফিনান্স বা প্ল্যানিং কমিশন বা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এইসব জায়গায় কলকাতার তুলনায় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত থেকে অর্থনীতিবিদদের বেশি নিয়োগ করা হয়েছে।

এরপরে সাধারণ মানুষের কথায় আসা যাক। সাধারণ মানুষ বিভিন্ন বড় বড় অর্থনীতির ঘটনার কথা কাগজে পড়ে। যেমন এই মুহূর্তে ব্রিটেন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ান থেকে বেড়িয়ে যাবে বলে ঠিক করেছে। কিংবা আরও কাছের ক্ষেত্রে, এই মুহূর্তে বাজারে আলুর দাম সময়ের তুলনায় একটু বেশি যাচ্ছে। অথবা এই মুহূর্তে কোনও একটা বড় কারখানা, ধরা যাক সাহাগঞ্জের ডানলপ, তার উৎপন্ন দ্রব্যের বাজারে বড় রকমের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। সাধারণ মানুষ এই জিনিসগুলি নিয়ে বেশি বিচলিত বেশি ভাবিত। সাধারণ মানুষ এই সমস্ত সমস্যার উত্তর চায়। সাধারণ মানুষ তার চার দিকের প্রত্যক্ষ অর্থনীতির সমস্যাকে বুঝতে চায়। এই সব সমস্যা নিয়ে খুব যে নিয়মিত বিশ্লেষণ, অনুসন্ধান কলকাতায় এবং বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে করা হচ্ছে এমন বলা যায় না। আরও বড় কথা সংবাদপত্রে অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ বা গবেষকদের অনুসন্ধানের খবর নিয়মিত প্রকাশ করার কোনও তাগিদ নেই। কলকাতার সংবাদপত্রগুলিতে এই সব নিয়ে— ভোগ্যপণ্যর অভাব, এই মুহূর্তে কোনও একটা জিনিসের অভাব, খুব চালু পণ্যের কারখানার বসে যাওয়া, চা খাচ্ছি— চা বাগানের লোকেদের কাজের অভাব, এইগুলি নিয়ে যে অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে নিয়মিত আলোচনা প্রকাশ করছে তাও না । এই ধরনের আলোচনা চললে সংবাদপত্রের বিক্রি যে বাড়ত না এমন কথা বলা যায় না। এ কথা কিন্তু দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতের সংবাদপত্রের সম্বন্ধে ততটা বলা যায় না।

যাই হোক, যেটা হচ্ছে সেটা হল অর্থনীতির পাঠক্রমে বিশ্লেষণ ভিত্তিক আলোচনার অনেকটাই প্রতিযোগিতামূলক সমাজের অর্থনীতিতে আটকে আছে। সহযোগিতামূলক সমাজ নিয়ে আলোচনা করাটা খুব জরুরি। অর্থনীতির আলোচনার নানা রকম বেড়া এখন অবশ্য ভাঙছে। গণিতের বদলে ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব অর্থনীতির আলোচনার সঙ্গে সম্মিলিত করা হচ্ছে। নৃতত্ত্ব একটা নির্দিষ্ট

বিষয়, যার ক্রমবিস্তারের একটা ইতিহাস আছে। নৃতত্ত্ববিদের আলোচনার লক্ষ্য ও পদ্ধতি যে অর্থনীতিবিদের সমস্যা নির্বাচনের সঙ্গে মিলবে এমন বলা যায় না। সাধারণভাবে দেশের এবং পৃথিবীর ইতিহাস চর্চারও একটা ধারা আছে। এখন অর্থনীতির আলোচনায় সমাজকে বুঝতে গেলে ইতিহাস এবং নৃতত্ত্বের সামাজিক দিকটাকে প্রয়োজন অনুযায়ী মিলিয়ে ভাবাটা একান্তই দরকার।

এবার ছাত্রদের কথা ভাবা যাক। অর্থনীতির ছাত্রদের তো পরীক্ষা পাশ করতে হবে। তাদেরকে শুধু ভাবালেই তো হবে না, তাদের পরীক্ষার সিলেবাস হিসাবে নির্দিষ্ট কিছু দিতে হবে যেটার ওপরে সীমিত থেকে ছাত্ররা কতটা শিখেছে তার প্রমাণ দেবে। এখন সেখানেও ভাবতে হবে যে সিলেবাস তৈরি কি প্রচলিত ধারার বইয়ের মধ্যে আটকে থাকবে? নাকি বাজার এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থা দুটিকে সমন্বিত করে নতুন নতুন যে সমস্ত সুনির্দিষ্ট ধারণা তৈরি হচ্ছে, সেই সব ধারণার উপরে লেখা বইগুলি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থনীতির সিলেবাসে এখানে বিশাল দায়িত্ব থেকে যায় শিক্ষকের। শিক্ষক নিজেও সমাজের মধ্যে আছেন। অর্থনীতির মধ্যে জীবনযাত্রায় তিনি একভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত পছন্দ ও অপছন্দর উপরে বিষয়ের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কী সেটা বিচার করতে হবে। পরীক্ষার মধ্যে তথ্য পরিসংখ্যান ঘেঁটে প্রবন্ধ লেখার কাজ যুক্ত করলে কেমন হয়? প্রবন্ধগুলি ছাত্র ও শিক্ষকদের আলোচনা সভাতে উপস্থাপন করার রীতি নিয়ে আসলে কেমন হয়?

এবার আমার নিজের একটা অভিজ্ঞতা বলে এখনকার মত কথা শেষ করবো। আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে কর ব্যবস্থায় অপটিমাইজেশন নিয়ে কাজকর্মের শুরু হয়। অর্থাৎ দক্ষতাকে রক্ষা করা, বৈষম্যকে কমানো ইত্যাদি সব দিক বিবেচনা করে করের হার কি হাওয়া উচিত এই সব ভাবনা নিয়ে কাজকর্ম শুরু হল। আমার মনে আছে খুব জোরাল একজন বিপ্লববাদী অত্যন্ত বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের কাছে এই কথাটা বলাতে তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন। তার কারণ পুঁজিবাদের জন্যেই যে পৃথিবীতে অনুন্নত দেশগুলির উদ্ভব হয়েছে, এই নিয়ে তখন একটা জোরাল তাত্ত্বিক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এটাকে বলে ক্যাপিটালিস্টিক আন্ডারডেভলপমেন্ট। সেই সব অত্যন্ত বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন অধ্যাপকরা রাষ্ট্রর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কোনও রকম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই সমর্থন করতেন না। কিন্তু গণতন্ত্র ব্যবস্থা ও তার মধ্যে থেকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ যদি সমর্থন করা না যায় তাহলে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রেখে কি করে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায় তারও বিধি বিধান কারও কাছে ছিল না। এই যে

বৈপ্লবিক উষ্মা, এটা কলকাতা এবং কলকাতার আশে পাশে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে বেশি দেখা গেল। হয়তো এই কারণে বছর পঞ্চাশ আগে থেকে কলকাতার অর্থনীতিবিদরা অর্থনীতির প্রয়োগ অর্থাৎ পলিসি নিয়ে অধ্যয়ন গবেষণা থেকে ক্রমশ সরে গেলেন। মানসিক দিক থেকে বা অধ্যয়নের দিক থেকে অর্থনীতিতে প্রয়োগ বা পলিসি থেকেএই ধরনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘটনা কিন্তু দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে ততটা ঘটেনি। কারণ দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতে ক্যাপিটালিজমকে, গণতন্ত্রকে কঠিনভাবে নিন্দা করার মধ্যেই সমস্ত প্রয়াস নিয়োজিত করা হয়নি।

আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিবিদরা ছাত্রদের সিলেবাস তৈরিতে পলিসির বিষয় জোর দেওয়ার থেকেও আন্দ্রে গুন্ডার ফ্রাঙ্ক, ইমানুয়েল ওয়ালেরস্টাইন, সমির আমিন ইত্যাদি নতুন যুগের অতি বামপন্থীদের লেখাপত্র সংযোজনে উৎসাহী ছিলেন। এইসব অর্থনীতিবিদরা যে তীক্ষ্ণধী ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। ধনতন্ত্রকে কঠিনভাবে শুধুমাত্র বর্জন করা বা শুধুমাত্র তার বিরূপ সমালোচনা করার ধারা দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির অত্যন্ত তীক্ষ্ণধী অর্থনীতিবিদদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। কিন্তু আজও দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতি ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রশ্নে দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা যতটা না সাহায্য করতে পেরেছেন, উত্তর আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা তার থেকে অনেক বেশি করেছেন। অর্থাৎ উত্তর আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা এসেই কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকার অর্থনীতি ব্যবস্থার পরিচালনাকে প্রভাবিত করেছেন। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা যে আসলে ধনতন্ত্রের অবদান সেটা খুব জোরালোভাবে বছর পঞ্চাশ ধরে দক্ষিণ আমেরিকাতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল। সামাজিক কাঠামোর মধ্যে বা সহযোগিতামূলক ভাবনার মধ্যে বুকানন, টুলক, ইত্যাদি অর্থনীতিবিদরা যে কাজ করছিলেন তার উপরে তখন প্রায় কোনও গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। তখন বুকানন, টুলক এদের কথা বললেই ভাবা হত যে এরা প্রতিক্রিয়াশীল। আর গুন্ডার ফ্রাঙ্ক, ওয়ালেরস্টাইনদের কথা বললে ভাবা হত যে এরা অতি প্রগতিশীল। কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় ভাবনা চিন্তা কিন্তু ওই বুকানন, টুলক এদের কাছ থেকেই এসেছে, এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতেও সেটাই গৃহীত হয়েছে।

আমার আকাশ

মহানন্দা কাঞ্জিলাল

ছোট্ট পাঁচ বছরের মেয়ে সমুদ্রের ধারে ঘুরতে এসে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। এদিক ও দিক। সমুদ্র এতো বড়, এতো ঢেউ, এতো নীল। বড় মানে কি? বাবাকে জিজ্ঞেস করল বাবা আকাশ কত বড়? বাবা হেসে বললেন: মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল মাঝে আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে। ধেৎ ভাল্লাগে না। বাবা যে কি ধাঁধা করে বলে। বুঝতে চায় ছোট্ট মেয়েটা। বুঝে উঠতে পারে না। মেয়েটা নিজে নিজেই মনে মনে মাপতে থাকে বিশাল আকাশকে।

বাড়ি ফিরে কলকাতার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সেই আকাশকেই দেখে সে। দেখতে দেখতে বড় হয়ে ওঠে। স্কুল পেরিয়ে কলেজ পেরিয়ে আরও এগোয়। চারতলার বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে আকাশের রং বদল দেখে। আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘের সারি দেখে মন উদাস হয়ে যায়। আবার শরতের আকাশের পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দেখে অকারণ খুশিতে ভরে ওঠে মন। মাঝে মাঝে বিকেলের কনে দেখা আলো রাঙিয়ে দেয় তার মন।

কিন্তু হঠাৎ এই আকাশের সঙ্গে সখ্যতা যেন হারিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির। এক দিন সে জানতে পারল ছোটবেলার বন্ধু রীতার বহু পুরনো সাবেকী বাড়িটা ভেঙে ওখানে গড়ে উঠবে বহুতল বাড়ি। এ বাড়িটার মাঝের খোলা দালানে হুটোপাটি করে কেটেছে তার শৈশব। রীতার পাড়া থেকে চলে যাওয়াটা যতটা না দুঃখের তার থেকে আরও কষ্টের মেয়েটির আকাশকে কিছুটা হারিয়ে ফেলা। কয়েক মাসের মধ্যে সশব্দে মেয়েটির আকাশের একটা বড় অংশ ঢেকে দিল বিশাল একটি বহুতল। মেয়েটি ভাবতে থাকল ওমা দূরের কটা

ছাত্রী: ১৯৯০-১৯৯২

কষ্ট করে বেঁচে থাকা আম গাছ, নারকেল গাছ আর দেখা যাচ্ছে না। কত দিন কালবৈশাখী ঝড়ের সময় মাকে লুকিয়ে ছাদে গেছে সে। ঝড়ের দাপটে গাছের পাতাগুলির এলোপাথাড়ি নড়াচড়াকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে সে। বন্ধুর মতো ওদের সঙ্গে কথাও বলেছে। আকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওরাও কি হারিয়ে গেল? আর ওদের দেখতে পাবে না।

একটাই আশার কথা, ডান দিকটা ঢেকে গেলেও বাঁ দিকের আকাশটা এখনও মেয়েটি দেখতে পায়। ও দিকের আকাশের দিকে তাকিয়ে রাত্তিরে সে অবাক হয়ে দেখে অজস্র তারা, পূর্ণিমার আলো করা গোল চাঁদ, বা লাল গ্রহ। আকাশটা যে বড় প্রিয় বন্ধু তার। আনন্দ, দুঃখ সব বলা যায়। আনন্দে যখন সে গান গেয়ে ওঠে বা দুঃখ হলে যখন চোখ জল আসে আকাশটা মন দিয়ে শোনে।

কিন্তু ভাল থাকা আর হল না মেয়েটির। কিছু দিনের মধ্যে ওই অর্ধেক আকাশ ঢেকে দিয়ে গড়ে উঠেছে আর একটা বহুতল। কিছু ভাল লাগে না মেয়েটির। ছাদে উঠলে শুধু মনখারাপ হয়। চারপাশটা যেন গিলে খেতে আসছে ইটকাঠের তৈরি বিশাল বিশাল বাড়ি। বইতে পড়ে সে জেনেছে মুম্বাইয়ের পরেই নাকি কলকাতার স্থান এই বিশাল বিশাল বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে কতগুলি আবার আকাশচুম্বী। মেয়েটি ভাবে ইস যদি কোনও দিন আকাশচুম্বী বাড়ির ছাদে উঠতে পারে তবে কি পারবে আকাশ ছুঁতে?

এই তো সেদিন ইউনিভার্সিটির বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হল তখনও সে এ কথাই বলছিল। সেটা শুনে বন্ধুরা বলল তুই একেবারে সেকেলে। এ যুগে অচল। দেবাশিস বলল আরে ভারতের জন বিস্ফোরণের সমস্যার একটা বড় সমাধান করছে এই বহুতল বাড়িগুলি। কতগুলি মানুষকে এক ছাদের তলায় থাকতে দিচ্ছে। এটা কি কম কথা। কিন্তু সোমা যা বলল শুনে ভাল লাগল না। ও কোনও জার্নালে পড়েছে বহুতলবাসী মানুষের বহু মানসিক সমস্যা তৈরি হচ্ছে। অতৃপ্তি, মানসিক চাপ, আত্মকেন্দ্রিকতা, দুর্বল সামাজিক সম্পর্ক, একাকিত্ব আরও কত কি? মেয়েটির মনে পড়ল, তাই তো মিত্র কাকু একদিন বলেছিল পৈতৃক বাড়িটা কেন যে প্রোমোটিংয়ে দিলাম এখন নিজের ছোট ফ্ল্যাট হয়েছে কিন্তু নিজের বাড়িতে নিজেকে ভাড়াটে মনে হয়। এত ঝাঁ চকচকে ছোট সাজানো ফ্ল্যাট পেয়েও মিত্র কাকু, কাকিমা মানসিকভাবে ভাল নেই।

এত বহুতলের চাপে মেয়েটির পাড়াটাও তো আর আগের মতো নেই।

আগে রাস্তায় বেরোলেই মুখার্জী জেঠু, মিত্র কাকু, ঘোষ মাসিমা কত কথা বলতেন, কুশল বিনিময় হত। পাড়ায় অত লোক ছিল না কিন্তু অসম্ভব আন্তরিকতা, প্রাণময়তা ছিল। এখন চারপাশের বহুতলে কত নতুন নতুন মানুষ এসেছে। বেশির ভাগই ফেসবুক বা অন্য সোস্যাল নেটওয়ার্কিং-এর সাইট যুগের আধুনিক মানুষ যারা মানুষের সঙ্গে কথা বলার থেকে যন্ত্রের সঙ্গে ব্যস্ত থাকতে বেশি ভালবাসে।

আগে তো মিত্র কাকুদের পুরনো বাড়ির বড় দালানে কত অনুষ্ঠান হত। পাড়ার সব বাচ্চারা মিলে নাচ, গান, নাটক কত কি হত। এখন সে বাড়িটাও নেই। উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে কারা থাকে তাই জানা যায় না।

পাড়ার ছেলে প্রবাল বউকে নিয়ে আমেরিকা যাওয়ার আগে পুরনো বাড়িটা বিক্রি করে দিল। কাকু কাকিমাকে বোঝালো ফ্ল্যাটে থাকলে কত সুবিধে, লিফট আছে, সিকিউরিটি আছে, কত মানুষ থাকবে। তাও কেন কাকু কাকিমা এখন এত একাকিত্বে ভোগেন। কিছুই যেন ভাল লাগে না ওদের। ফ্ল্যাটে যাওয়ার পর থেকে কাকুর নানা শারীরিক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কাকিমাও শ্বাসযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছেন। পাড়ার মধ্যে একটা পুকুর ছিল আর পাশে ছিল একটা ছোট মাঠ। ওই পুকুরেই তো মেয়েটি বন্ধুদের সঙ্গে সাঁতার শিখেছে। ছোট ছোট বাচ্চারা বিকেল হলেই হুটোপাটি করত ওই মাঠে। এক দিন মাঠ, পুকুর দুটোই হারিয়ে গেল। বিশাল বাড়ি তৈরির প্রস্তুতি চলছে। পাড়ার পুরনো মানুষরা কেউ কেউ আপত্তি জানালেও তা কেউ শোনেনি।

এক দিন কলকাতার রাজারহাটে গিয়ে মেয়েটি দেখে ওমা এ কি কলকাতা না অন্য কোনও শহর। সব বাড়িই তো আকাশচুম্বী। অবাক হয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল তার যদি ভূমিকম্প হয় বাড়িগুলি তো দেশলাই বাক্সের তৈরি করা বাড়িগুলির মতো ভেঙে পড়বে? এ শহর এত বড় বড় বাড়ি ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে তো? বন্ধুদের আড্ডায় কৌশিক তো জোর গলায় বলল শোন এ বড় বাড়িগুলি সব আর্থকোয়েক রেজিস্টেন্ট। হলেই ভাল বাবা, ভাবে মেয়েটি।

মনখারাপ হলে আগে ছাদে উঠে মন ভাল হয়ে যেত মেয়েটির। এখন ছাদে উঠলে মন আরও খারাপ হয়। চারপাশে ইটকাঠের তৈরি বিশাল বিশাল বাড়ি। অজস্র মানুষ, অজস্র কোলাহল। পুরনো পাড়াটা হারিয়ে যাচ্ছে। পাড়ার অতি চেনা মানুষগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। জীবনের আনন্দগুলি কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

কাকে বলবে এ কথা। বললে সবাই হাসবে, বলবে পাগল কোথাকার। কেউ বোঝে না, বুঝতে চায় না। বাবা তুমি কোথায়? তুমিও মহাকাশে কোথায় হারিয়ে গেছো। তুমি থাকলে বুঝতে যে আমার আকাশটা কেড়ে নিয়ে চারপাশের ইমারতগুলি যেন গলা টিপে ধরছে আমার। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় আমার। দম বন্ধ হয়ে আসে।

একইভাবে হারিয়ে যাচ্ছে পাড়ার পুজো, প্যান্ডেলে সারা দিন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা। পাড়ার পুজোটা এখন থিম পুজো। যখন তখন ঢোকা যায় না। পোশাকধারী সুরক্ষাকর্মীরা আগলে রাখে পুজো প্যান্ডেল। বিকেলের পর বিশাল লাইন। তখন চেনা পাড়াটা কেমন যেন অচেনা হয়ে যায়। মানুষ মুগ্ধ হয়ে মাদুর্গার চোখের দিকে তাকিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে না তারা ব্যস্ত প্যান্ডেলের রকমারি বাহার দেখতে। প্যান্ডেলটা ভারতের কোন মন্দিরের আদলে তৈরি, প্যান্ডেলটা কি দিয়ে তৈরি সবাই তাই আলোচনা করছে। মাদুর্গা হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকলেও মনে মনে ভাবেন, হায় রে ছেলেপুলে নিয়ে এত কষ্ট করে এত দূর পাড়ি দিয়ে মর্ত্যে এলাম, আর এত লোক প্যান্ডেলে ঢুকে এদিক ওদিক তাকিয়ে ফোন উঁচু করে খালি নিজের ছবি তুলতে ব্যস্ত। এক বন্ধুকে এসব বলাতে সে হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলল, তুই এ যুগে থাকার অযোগ্য। যা গ্রামে গিয়ে বাস কর। হায়, মেয়েটি যদি যেতে পারত গ্রামে। যেখানে আছে সবুজ ধানক্ষেত, জলভরা পুকুর আর মেয়েটির সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু নীল আকাশ। মেয়েটির অর্থনীতি পড়া বন্ধুরা বলে এত নগরায়ণ এত বহুতল বাড়ি হওয়ার ফলে অর্থনীতির সেবাক্ষেত্র নিঃসন্দেহে প্রসারিত হচ্ছে। কত মানুষের রুজিরোজগার বাড়ছে। কিন্তু তত্ত্বকথায় মন ভরে না মেয়েটির। ছোটবেলা থেকে দেখা তার পুরনো শহর, পুরনো পাড়া হারিয়ে যাচ্ছে। বিশেষত, চেনা আকাশটাও অজানা আকাশ হয়ে যাচ্ছে।

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও ভারতবর্ষে জনসংখ্যা-অর্থনীতি চর্চা

মৌসুমী মান্না

রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এমন একজন বাঙালি বুদ্ধিজীবী ছিলেন, যাঁর মনন ও চিন্তন সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন ধারায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করত। তিনি শুধু বহু সংখ্যকই লেখেননি, বহু বিষয়েও লিখেছেন। এবং আশ্চর্যের কথা, এই বহুল বিষয়েই তাঁর নিজস্ব চিন্তার ছাপ রেখে গেছেন। রাধাকমলের জন্ম ১৮৮৬ সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজের এই প্রাক্তন ছাত্র কর্মজীবনের শেষ দিকে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক, ও পরবর্তীতে উপাচার্যের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি নানা বিষয় নিয়ে লিখেছেন। কিন্তু এই লেখার ক্ষুদ্র পরিসরে আমি তাঁর এক বিশেষ বিদ্যায়তনিক অবদান নিয়ে আলোচনা করব। তা হল— জনসংখ্যা-অর্থনীতি চর্চায় তাঁর নিজস্ব ভাবনা।

মজার কথা এই যে তাঁর দীর্ঘ বিদ্যায়তনিক জীবনে জনসংখ্যা-অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর মতামতে বহুবার বদল ঘটে। কিন্তু প্রতিবারই তাঁর নিজস্ব মতের সপক্ষে তিনি জোরালো যুক্তি ও পরিসংখ্যান উপস্থিত করেন।

১৯১৬ সালের লন্ডনের লংম্যান, গ্রীন ও কোম্পানি থেকে রাধাকমলের অর্থনীতি বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ 'দি ফাউন্ডেশনস্ অফ ইন্ডিয়ান ইকনমিক্স' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি জনসংখ্যা-অর্থনীতি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেননি। ১৯২১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রিন্সিপলস অফ কমপারেটিভ ইকনমিক্স' এই বিষয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রথম প্রকাশ। রাধাকমল এই সময়ে মনে করতেন অর্থনীতির তত্ত্বের কোনও সাধারণ রূপ হতে পারে না। প্রতিটি অঞ্চলের

ছাত্রী: ১৯৮৫-৮৭

নিজস্ব আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত সেই অঞ্চলের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এইভাবেই আঞ্চলিক অর্থনীতির তাত্ত্বিক রূপ গড়ে ওঠে। তাঁর তুলনামূলক অর্থনীতির ধারণা এই বিশ্বাস থেকেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর এই তত্ত্বকে দাঁড় করানোর জন্য তিনি দুটি মূল উদাহরণ ব্যবহার করেন। একটি মজুরি তত্ত্ব, ও অন্যটি জনসংখ্যা-অর্থনীতি। তাঁর বিশ্বাস ছিল প্রতিটি অঞ্চলে শ্রমের মজুরি নির্ধারিত হয় সেই অঞ্চলের নিজস্ব 'বাস্তবিক', 'মনোস্তাত্ত্বিক' ও 'সামাজিক' অবস্থার উপরে। তিনি অর্থনীতির বাইরের সে সমস্ত শক্তি অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে, তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই কারণেই তিনি তুলনামূলক ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজনের কথা লেখেন। প্রচলিত অর্থনীতির ধারণা দিয়ে আঞ্চলিক অর্থনীতিকে বোঝা সম্ভব নয়— এই ছিল তাঁর মত। জনসংখ্যা-অর্থনীতিকেও তিনি এই আঙ্গিকেই বিচার করেন।

ম্যালথাসের ক্রমহ্রাসমান প্রতিদান বিধিকে তিনি কোনও সাধারণ তত্ত্বের মর্যাদা দিতে রাজি ছিলেন না। তাঁর মতে জনসংখ্যার তত্ত্ব বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ রূপ ধারণ করে। ইউরোপে মানুষের বেঁচে থাকার যে দর্শন, তার সাথে এশীয় মহাদেশের, বা প্রাচ্যের জীবনদর্শনের সাথে নিবিড় যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা অবান্তর। পাশ্চাত্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অনেক প্রতিযোগিতামূলক বিষয় কার্যকরী। যেমন পাশ্চাত্যে মনে করা হয়— যদি কোনও ব্যক্তি রোজগার না করে, তার খাদ্যের অধিকার নেই। কিন্তু ভারতে গ্রামীণ সমাজ ও যৌথ পরিবার মানুষকে এক ধরনের সহায়তা দেয়, যা পশ্চিমে আশার অতীত।

কোনও সমাজে উৎপাদনশীলতা ও উপভোগ তার জনসংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনশীলতা ও উপভোগ বৃদ্ধির হার প্রগতিশীল, ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমস্যার সৃষ্টি করবে না। রাধাকমল ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদদের 'স্টেশনারি স্টেট'-এর ভয়কে অমূলক ভেবেছেন। তিনি মানব সভ্যতার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা ভাবতেন। এখানে ম্যালথাসের নৈরাশ্যবাদী জনসংখ্যার তত্ত্বের কোনও গুরুত্ব তাঁর কাছে ছিল না।

সেই একই রাধাকমল ১৯৩৬ সালে ভয়ঙ্কর ম্যালথুসীয়ান হয়ে ওঠেন। ওই বছর লক্ষ্ণৌতে যে প্রথম পপুলেশন কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়, তিনি ছিলেন তার সভাপতি। ১৯৩১-এর সেনসাস রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে প্রবল 'ম্যালথুসীয়ান প্যানিকের' সৃষ্টি হয়। রাধাকমলও সেই জ্বরে আক্রান্ত

হয়ে পড়েন। রাধাকমল ম্যালথাসের তত্ত্বকে সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে মর্যাদা দিতে শুরু করেন। তিনি ভয় পেয়েছিলেন হয়ত বা ভারতবর্ষেও 'ম্যালথুসীয়ান ক্যালামিটি' একদিন সত্য হয়ে যাবে। কিন্তু ম্যালথাসের পজিটিভ চেক ও প্রিভেন্টিভ চেক-এর ধারণা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তিনি মনে করতেন পৃথিবীর সম্পদ পৃথিবীর সব মানুষের জন্য। এই সম্পদের ওপর কোনও মানুষের একচেটিয়া অধিকার থাকা উচিত নয়। তিনি জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে ততটা ভয়প্রদ মনে করেননি। কেন না তাঁর সময়ে জনসংখ্যার অনুপাতে পৃথিবীতে খালি জমির কোনও অভাব ছিল বলে তাঁর মনে হয়নি। তবুও ১৯৩১ সালে যখন সেনসাস রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তখন অন্য অনেকের মত রাধাকমলও এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিপজ্জনক মনে করেন।

কিন্তু রাধাকমল আরও একবার তাঁর চিন্তাধারা পাল্টান। ১৯৩৮ সালে তাঁর 'ফুড প্ল্যানিং ফর ফোর হান্ড্রেড মিলিয়ন' গ্রন্থ প্রকাশ পায়। তখনও তিনি ম্যালথুসীয়ান প্যানিকে ভুগছেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী। হার মানতে রাজি ছিলেন না। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ জনসংখ্যাকে কিভাবে খাদ্য যোগানো যায়, সেই ছিল তাঁর প্রধান চিন্তা। ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয় 'দি পলিটিক্যাল ইকনমি অফ পপুলেশন'। এর আগে পর্যন্ত তিনি ব্যস্ত ছিলেন কিভাবে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা যায়, অথবা কিভাবে কৃষির উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো যায়— তাই নিয়ে। কিন্তু ১৯৪২-এ তিনি আর এ বিষয়ে ততটা চিন্তিত ছিলেন না। বরং তিনি চিন্তিত ছিলেন বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্য নিয়ে। ঔপনিবেশিক শোষণ নিয়েও তিনি তাঁর নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। ধ্রুপদী অর্থনীতির সার্বিক ধারণা তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। কেন এক অঞ্চলের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা অন্য অঞ্চলে গিয়ে স্বাধীন বসতি স্থাপন করতে পারবে না— এ তাঁর কাছে প্রধান জিজ্ঞাস্য ছিল।

রাধাকমল পাশ্চাত্য অর্থনীতির তত্ত্ব আগ্রহী পাঠকের মত পড়েছিলেন। কিন্তু গ্রহণ করেছিলেন তাঁর দেশজ চিন্তার নিরিখে। ভারতীয় অর্থনীতির ক্যানভাসে তিনি জনসংখ্যা-অর্থনীতিকে পর্যালোচনা করেছেন— এই ছিল তাঁর স্বকীয়তা।

"এখনো গেল না আঁধার..."

অনুরাধা মজুমদার গোস্বামী

আমাকে লিখতে বলা হয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তনীদের একটা পত্রিকা বের হবে, সেইখানে। বহু বহু দিন, বছর কেটে গেছে কাঁটাকলের ক্যাম্পাস থেকে রেজাল্ট হাতে বেরিয়ে এসেছি। যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন। একটা 'এমএসসি' ডিগ্রি আছে অর্থনীতিতে আর বাঁধাগতে একই সিলেবাসের স্কুল কলেজের কিছু ছাত্রছাত্রী পড়াই, এছাড়া হালআমলের অর্থনীতি বিষয়ক তত্ত্ব, গবেষণা, নতুন পাঠক্রম কিছুই বিশেষ জানা নেই। কিন্তু অনুরোধটা এমন একটা জায়গা থেকে এসেছে যে সেটা উপেক্ষা করতে পারলাম না। অনেক সময়, অনেক রকম বিষয়েই মনে নানা প্রশ্ন জাগে, তার পিছনের আর্থ-সামাজিক কারণটাও খুঁজতে বসি, কিন্তু ঠিক মতো সন্তোষজনক উত্তর পাই না, কোথাও যেন একটা ধন্দ থেকে যায়, প্রসার, উন্নয়ন, জিডিপি গ্রোথ, ডেভেলপমেন্ট সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যায় চারপাশের সামাজিক চিত্র দেখে, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো দেখে।

সে দিন আমার বাড়িতে যে মহিলা রান্না করে দিয়ে যান, বেশ খুশি খুশি মুখে আমায় জানালেন তার ড্রাইভার স্বামী দুটো স্মার্টফোন কিনে এনেছেন, তাদের দুই ছেলের জন্য। তারা একজন ক্লাস নাইনে পড়ে, অন্যজন এ বছর মাধ্যমিক দেবে। আমি মুখ ফসকে বলে ফেললাম মাধ্যমিকের আগেই কেন মোবাইল কিনে দিল, তার চেয়ে পরীক্ষায় পাশ করার পরই তো কিনে দিলে ভাল হত। উত্তরে শুনলাম, দুই ছেলেই স্মার্টফোন কিনে দেওয়ার জন্য খুব ঝামেলা করছিল। আর বড় ছেলের পরীক্ষায় প্রোজেক্টের কাজের জন্য স্মার্টফোন ছাড়া চলবেই না। ক্লাসের প্রায় সব ছেলেমেয়েরই স্মার্টফোন কেনা

ছাত্রী: ১৯৮৬-৮৮

হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম, একটি অতি সাধারণ স্কুল, যেখানে শুধুমাত্র দরিদ্র, নিম্নবিত্ত বা বড়জোর নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা পড়তে যায় তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার আগে চাহিদা হল স্মার্টফোন। নিজের ছোটবেলার ওই সময়টা ভাবলে মনে পড়ল আমরা পরীক্ষার আগে টেস্ট পেপার বা রেফারেন্স বই ছাড়া তো কিছুই চাহিদা করিনি বড়জোর বাড়তি কিছু পেন, পেনসিল, জিওমেট্রি বক্স, সময় কত এগিয়েছে! প্রযুক্তির এত উন্নতি! দেশ কি তবে স্বাধীনতার এত বছর পর সত্যি সত্যি উন্নয়নের পথে জোর কদমে হাঁটছে। চিন্তাটা থমকে গেল। এদের হাতে স্মার্টফোন থাকলেও, পেটে সুষম খাদ্য নেই, রোগা ভোগা অপুষ্ট দুটো কিশোরের চেহারা চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রথম দিন ওদের দেখে রান্নার মহিলাকে বলেছিলাম, ছাতু, কলা, চিঁড়ে, কখনও সখনও ডিম খাইও ওদের। ও বলেছিল ছাতু খেতে চায় না ওরা, হরলিক্স দাও, ম্যাগি দাও, মোমো দাও তখন খাবে। এখানেও প্রযুক্তি। ঘরের ভিতর টিভির বিজ্ঞাপনের দৌলতে এদের মাথায় ঢুকে গেছে পাঁচ টাকার হরলিক্সের প্যাকেট কিনে রোজ খাওয়াতে পারলে ছেলেমেয়ে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে। বুদ্ধি খুলবে, শরীর বাড়বে। বাচ্চাগুলি বইপত্রের বদলে ছুটছে স্মার্টফোনের দিকে, এদের দরিদ্র বাবামায়েরা ছুটছে তাজা সবজি, ডিমের বদলে প্যাকেটে ভরা হরলিক্স, নুডলসের দিকে, বাবুর বাড়ির বাচ্চারা যখন এসব খাচ্ছে তখন নিশ্চয়ই লাভ হয়। অথচ এই দুঃস্থ ঘরের বাচ্চাগুলির জন্যই সরকারকে বিনা পয়সায় জুতো, টেস্ট পেপার, সাইকেল বিলি করতে হয়। ব্যবস্থা রাখতে হয় মিড ডে মিলের, যাতে একবেলা অন্তত পেট ভরে খাবার লোভে পড়তে আসে। পেটে ঠিকমতো ভাত তরকারি না জুটলেও যেন পকেটে স্মার্টফোন থাকে, তাতে থাকে নেট কানেকশন। আবার এই মহিলার বোনের বাড়িতে মোবাইল নিয়ে নাকি খুব অশান্তি। তার বোনও রান্নার কাজ করে মেয়েকে পড়াচ্ছে, স্বামী মারা গেছে। মেয়ের আবদারে মা কষ্টের উপার্জন থেকে জমিয়ে স্মার্টফোন কিনে দিয়েছে। সেই মেয়ের পড়াশোনা না কি শিকেয় উঠেছে। নিত্য দিন অশান্তি, মেয়ে সর্বদা মোবাইল নিয়ে ফেসবুক করছে, প্রেম করতে শুরু করেছে অচেনা কার সঙ্গে। রোজই তার বায়না, এটা কিনে দাও, ওটা কিনে দাও। সরস্বতী পুজোয় নতুন সালোয়ার স্যুট দেওয়া হয়নি বলে সে ঘর থেকে এক পাও বের হয়নি। পুরনোটা পরে বন্ধুদের সঙ্গে বেরোবে না। মা অসহায়। কিসের প্রভাব এটা? ইকনমিক ডুয়ালিজম আর তার সঙ্গে ডেমনস্ট্রেশন এফেক্ট? এসব বন্ধ করার

উপায়ই বা কি?

আবার অন্য এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলি। অধ্যাপনা করার সূত্রে কলেজের স্টাফরুমে নতুন এক ঝাঁক অধ্যাপিকার সঙ্গে রোজ দেখা হত। অনেকেই সদ্য পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। এরা সবাই উচ্চমধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর। এদের আমার অধ্যাপক বাবা মা, বা আমাদের ছাত্র অবস্থায় যে শিক্ষক অধ্যাপকদের পেয়েছি তাদের শিক্ষা, পেশা তাদের জীবনযাত্রায় একটা বিশেষ প্রভাব ফেলত। একটা সময় পর্যন্ত বেশভূষা হাবভাব দেখে বলে দেওয়া যেত ইনি নিশ্চয়ই কোনও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু ওই বিশেষ দলটিকে দেখে, মার্জনা করবেন, আমার কোনও দিন মনে হত না, এরা পড়াতে এসেছেন, কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বই, লেখাপত্র এসব সম্বন্ধে আলোচনা করতে তো দেখতামই না, বরং কেউ কেউ বিদেশি প্রসাধনী কোম্পানির জিনিসপত্র সামনে ছড়িয়ে কলেজের স্টাফরুমের পসরা সাজিয়ে বসে যেত, আর একদল হামলে পড়ত সেই সব জিনিসপত্রের ওপর। গুটিকয় দলছুট টেবিলের এক কোণে খাতা দেখায় বা বই পড়ায় ব্যস্ত থাকতেন। আমার যেন কেমন এক রকম কষ্ট হত কলেজের স্টাফরুমের এই রকম বেমানান চেহারাটা দেখে। আমি কিন্তু একবারও বলছি না, যিনি ছাত্র পড়াবেন তার অন্য কোনও বৃত্তি থাকতে পারবে না, বা তিনি হাল ফ্যাশনের সাজগোজ করতে পারবেন না। তবে সব কিছুরই একটা স্থান কাল, পাত্র, এবং রুচিসম্মত ব্যাপার আছে। কোনও অধ্যাপিকা, কলেজের স্টাফরুমে বসে প্রসাধনী বিক্রি করছেন, মেনে নিতে একটু অস্বস্তি হয়।

আমার একটি পরিচিত পরিবার আছে, হাওড়া জেলার, এক অনগ্রসর, বিদ্যুতহীন গ্রামের বাসিন্দা। পরিবারের কর্তা বৃদ্ধ অক্ষম, স্ত্রীও বাতে পঙ্গু। একমাত্র ছেলে ছুতোর মিস্ত্রি। তার স্ত্রী ঘরকন্নার কাজ করে। এই ছেলেটি এক দুরারোগ্য স্নায়ুরোগে হঠাৎ একেবারে অথর্ব হয়ে পড়ল। আমরা এখন শুনি কারপেন্টার, প্লাম্বার এদের এখন অনেক ডিমান্ড। মজুরিও অনেক। আদতে দেখতে পেলাম তিন-চার মাসের মধ্যে হু হু করে সেই পরিবারটির সমস্ত সঞ্চিত পুঁজি শেষ হয়ে গেল, অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য চিকিৎসায়। চিকিৎসা আর কতটা করাতে পেরেছে, মাঝপথেই তা থেমে গেছে, এখন পরিবারটি না খেতে পেয়ে ধুঁকছে। কোনও একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে একমাত্র কর্মক্ষম গৃহবধূটিকে নিয়ে ছুটেছিলাম কয়েকটি জায়গায় চাকরির সন্ধানে। যদি কিছু নিয়মিত অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দেওয়া যায়।

বর্ধমানের একটা রাইস মিলে অস্থায়ী কর্মীর, কিন্তু হাওড়ার সেই গণ্ডগ্রাম থেকে সেখানে প্রতিদিন কাজে যোগ দেওয়ার কোনও উপায় বার করা গেল না। তখন চেষ্টা শুরু হল হাওড়া শিল্পাঞ্চলের কলকারখানাগুলিতে। সেগুলির রুগ্ন চেহারা দেখে এত দিনে উপলব্ধি করলাম, বইতে পড়া রুগ্ন শিল্প আসলে কি। কর্মসংস্থান হল না। বাকি রইল ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে মেয়েদের স্বরোজগার প্রকল্পের দিকটি। একটা ক্ষীণ আশার আলো দেখা গেল। সেলাই, ফোঁড়াই কিছুই জানে না মেয়েটি। পাঁপড়, বড়ি দেওয়া, বা জেলি, চাটনি বানানো হয়তো শিখে নিতে পারবে, তা থেকে কিছু রোজগারও করবে, তবে এখনও পর্যন্ত যা বোঝা গেছে সেই রোজগার থেকে পূর্ণবয়স্ক চারটি মানুষের চারবেলা পেট ভরে খাবার সংস্থান হওয়ার মতো নয়, চিকিৎসা তো দূরস্থান। তা হলে এই গ্রামীণ স্বরোজগার যোজনা প্রকল্পগুলি কতটা সার্থক? কোনও কোনও সমবায়ের সাফল্য দেখে পুরো ব্যাপারটা কিন্তু 'জেনেরালাইজ' করা যায় না। গ্রামগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে জোর গলায় বলা যায় কি? পরিসংখ্যান নয়। পরিসংখ্যানই শেষ কথা নয়। আমরা চার দিকে কি দেখছি সেটাই শেষ কথা। আমরা কি আমাদের পরিচিতদের বাড়িতে বালিকা/কিশোরী কাজের মেয়ে দেখি না? অবশ্যই দেখি। রাস্তা ঘাটে, দোকানে বাজারে শিশু শ্রমিক দেখি না? অবশ্যই দেখি। যে দেশে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ সেই দেশেই সবার চোখের সামনে দিয়ে বড় জাঁদরেল সরকারি অফিসার তার দশ কেজি ওজনের বাজারের ব্যাগটি আট বছরের শিশু শ্রমিকের কাঁধে চাপিয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে যান বাড়ির পথে। আমরা কিছু বলি? বলি না। আত্মীয়ের বাড়িতে মিষ্টি পরিবেশন করা বারো বছরের বালিকাটির দিকে ফিরেও তাকাই না মিষ্টি খেতে খেতে। মনে প্রশ্ন জাগে না, এই ছোট্ট মেয়েটি পরিবার থেকে দূরে এখানে কি কাজ করছে? সংবিধান কর্তৃক দেয় অধিকারগুলি ভোগ না করে তাকে স্বাধীনতার এত বছর পরও দুটি মাত্র খাবার তাগিদে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছে কেন? কে দায়ী, সরকার? আমরা?

শহরের তরুণ ও যুব সম্প্রদায়ের অবস্থা বোধহয় আরও করুণ, আরও অসহায়। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নৈতিকতার দৈন্য ও দুর্বল প্রশাসনের কারণে গজিয়ে উঠছে সিন্ডিকেট রাজ, গুণ্ডামি, মস্তানি। গ্রাম, শহর, আধাশহর, শহরতলি, মেয়েরা যেমন নিরন্তর অত্যাচারিত, ধর্ষিত, ছেলেরাও কিন্তু কিছু ভাল অবস্থায় নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলেই প্রাণসংশয়। কিছু দিন আগেই আমি স্বচক্ষে দেখেছি এক মিউনিসিপাল নির্বাচনে ভোট বুথগুলির বাইরে গাদা

গাদা অচেনা ছেলে। কেউ কেউ নেশায় এতটাই চুর যে ঠিকমত দাঁড়াতেই পারছে না। এরা সকলেই না কি সশস্ত্র ছিল এবং শুনেছিলাম পাঁচশো টাকার একটা করে নোট, বিরিয়ানির প্যাকেট আর অঢেল মদ্যপানের ব্যবস্থা ছিল এদের জন্য। ভাবা যায় কি হতদরিদ্র দেশ আমাদের, কি হতভাগ্য এই রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার ছেলেপুলেরা। এতটাই অশিক্ষা, অভাব আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে এই সামান্য টাকা আর খাবারের লোভে পিলপিল করে এরা ছুটে এসেছে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে! কেন এসেছে এরা? কারণ এদের সুস্থ জীবন নেই। এদের শিক্ষা নেই, কাজ নেই, কাজের সুযোগ নেই। পেটে ভাত নেই। এই দেশের নেতারা উন্নয়ন নিয়ে গর্ব করেন। উন্নয়নের জোয়ার এসেছে, রথ ছুটছে। আর ও দিকে মেঠো ইঁদুর, সাপ, ব্যাং খেয়ে থাকা আদিবাসীরা ধুঁকছে। দেশের অর্ধেক শিশু না খেয়ে রাত্রে ঘুমোতে যাচ্ছে। এই আধপেটা খাবার দেশেই আবার কে কি নিষিদ্ধ জিনিস খেয়ে ফেলেছে বলে পিটিয়ে তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। তাই নিয়ে হাস্যকর প্রতিবাদও হচ্ছে। কোনওটাই কাজের নয়। কি হচ্ছে, কেন হচ্ছে, এইসব ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণ কি সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজাটাই আসল। উত্তরটা হয়ত এক এক জনের কাছে এক এক রকম। সকলের কাছে সবার উত্তর গ্রহণযোগ্যও নয়। বামপন্থীরা একরকম ভাবে, দক্ষিণপন্থীরা একরকম ভাবে, আজকের আরও আরও নতুন নতুনপন্থীরা তাদের তাদের মতো করে ভাবে, সাধারণ মানুষকে তাদের মতো ভাবাতে চেষ্টা করায়। কিন্তু সমাধান মেলে না। আজও মেলেনি আমাদের। দেশে আজও অনাহার, অর্ধাহার, দারিদ্র্য, বেকারি, অশিক্ষা শিশু শ্রম, লিঙ্গ বৈষম্য, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পীড়ন সবই বেশ প্রকট। উন্নয়নের রথে চড়ে এ কোথায় চলেছি আমরা?

এতক্ষণ কষ্ট করে যারা আমার আনাড়ি হাতের অগোছালো এই লেখাটা পড়লেন তাদের জানিয়ে রাখি এখানে যে উদাহরণগুলি দিয়েছি তা সবই আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ। আমার মতের সঙ্গে ভাবনার সঙ্গে অনেকেরই চিন্তার অমিল থাকতে পারে, প্রশ্ন খোঁজা ও তার সমাধানের চিন্তাও আলাদা হতে পারে। কিন্তু সমাধান খোঁজার সৎ প্রচেষ্টার সময় বোধহয় এসে গেছে। নয়তো এই উন্নয়নের ঝড়ে দেশটা ধ্বংস হতে দেরি নেই।

কাঁটাকলার কাঁদি

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

আমি সেভেন্টির ব্যাচে। আমাদের ব্যাচের রিইউনিয়ন হয় কয়েকবার। রচনা সংকলন বের হয়। কাঁটাকল নিয়ে লেখা বেশ কিছু গপ্পো তখন ছাপতে দিয়েছিলাম। ছাপা হয়েছিল। অন্য ব্যাচের পড়ুয়ারা পড়ুক এটা চেয়ে আবার ছাপতে দেওয়া। সবগুলো নয়, কয়েকটা। সঙ্গে কয়েকটা নতুন।...

২.

দেওয়ালে পোস্টার মারছি। হঠাৎ কাঁধে হাত। সন্তোষবাবু। বাঃ পোস্টারগুলো বেশ হয়েছে। দেওয়ালে লাগাচ্ছো? এরপর যখন অন্য পোস্টার লাগাবে তখন এটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার চেয়ে বরং দড়ি টাঙিয়ে তাতে ঝুলিয়ে দাও।

সন্তোষবাবু, পরে বুঝেছি, দেওয়ালে পোস্টার লাগানো আটকে দিলেন।...

৮.

আমরা তখন সেকেন্ড ইয়ারে। ফার্স্ট ইয়ারের একজন ছাত্রকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। অলোকবাবু তখন ডিপার্টমেন্টে। আমরা ঘরে ঢুকে বললাম। উনি বললেন আই স্টুড ফার্স্ট, নিরুপম স্টুড সেকেন্ড, আমি ওকে ওকে এখুনি ফোন করছি। পুলিশ কমিশনার নিরুপম সোমকে ফোন করলেন। ছেড়ে দেওয়া হল।...

৯.

ন্যাশনাল লাইব্রেরির পুকুর পাড়ে ৪ জন। অজিত, অভিজিৎ, শক্তি, আমি।

ছাত্র: ১৯৬৮-৭০

বাংলায় অর্থনীতির পত্রিকা বের করবো। নাম খুঁজছি। শক্তি খুঁজে পেল অন্য অর্থ।

কদিন বাদে আমাদের পরের ব্যাচ থেকে রাঘব, গৌতম। এরপর তারপর ব্যাচ থেকে অনেকে। প্রণব, প্রদোষ, নিলয়, সুদীপ, অমিতাভ, নবীন, অনির্বাণ।

পত্রিকা ঘিরে সংগঠন। সংগঠন চালানোর কর্মী সভাপতি। সব ম্যাচ থেকে একটাই নাম অরূপদা।

অন্য অর্থর সভাপতি অরূপ মল্লিক।

(সংক্ষেপিত)

পুনর্মুদ্রণ: *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ কাঁটাকল ৫০ বছর*

অর্থনীতিবিদ যখন সমাজকে ভুলভাবে ভাবায়, রাষ্ট্রকে জনবিরোধী নীতি গ্রহণে উস্কানি দেয়, তখন তার দায় এসে পড়ে পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ যে মানুষ, সেই মানুষের ওপর।

এ কথা যদি সত্য হয় তা হলে এটাও সত্য যে অন্য যে কোনও বুদ্ধিজীবীর তুলনায় অর্থনীতিবিদদের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতা রক্ষার গুরুত্ব অনেক বেশি। এই গুরুত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়, যদি না সে রাষ্ট্রতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস পাঠের ইডিওলজি তার শাস্ত্রটিকে কীভাবে প্রভাবিত করে, সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকে। আমাদের শাস্ত্রপাঠ এই দায়বদ্ধতা গঠনে অন্তরায় কেন না এই শাস্ত্রপাঠ একমাত্রিক। বহুমাত্রা বিকশিত করার জন্য সমাজবিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে এই শাখাটির যোগসূত্রটিকে যেভাবে রক্ষা করার দরকার ছিল, এক বিশেষ ইডিওলজির চাপে সেই দরকারি কাজটি অপ্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। একমাত্রিক এই শাস্ত্রটি দায়হীন সুবিধাভোগী এক দল মানুষের মতলবসিদ্ধ করার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

রতন খাসনবিশ (১৯৬৫-৬৭)

নাস্তিকের ডায়েরী,

অর্থনীতি ভাবনা ভাবনায় পরিবর্তন, ২০০৩, পৃ. ৫৪

কাঁটাকল— স্মৃতি সত্তা

মৃণালকুমার দাশগুপ্ত

ডিপার্টমেন্টে বাৎসরিক রি-ইউনিয়ন তখন খুব ধুমধাম করে অনুষ্ঠিত হত। তখন কোনও প্রথাগত Alumni Association ছিল না। কিন্তু তখনকার ছাত্রছাত্রীরা এবং আরও আগের ছাত্রছাত্রীরা, অধ্যাপকেরা সকলে মিলে মিশে এক মহামিলন মেলা সৃষ্টি করত। দু দিন ধরে অনুষ্ঠিত হত ওই রি-ইউনিয়ন এবং তার প্রস্তুতিও প্রায় দু মাস ধরে চলত। এই প্রস্তুতিতে গোপালদা (প্রয়াত গোপাল ব্যানার্জী যিনি দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার ছিলেন) বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা নিতেন। ক্রিকেট ম্যাচ, ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নাটিকার অনুষ্ঠান, ডিবেট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হত। ক্রিকেট খেলায় অধ্যাপক রাখাল দত্ত সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। আমাদের পরের ব্যাচের দীপঙ্কর (ড. দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, আইএসআই-এর অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক) নাটক, সঙ্গীত পরিচালনায় প্রভৃতি বিশেষ পারদর্শী ছিল। 'চলচ্চিত্র চঞ্চরী' নাটিকাটি ওর পরিচালনায় একবার রি-ইউনিয়নে খুব প্রশংসিত হয়েছিল।...

কাঁটাকলের অর্থনীতি বিভাগ আমাদের কাছে একটা নস্টালজিয়া বিশেষ। ১৯৯০ দশকের শেষে যখন আস্তে আস্তে কাঁটাকলের সঙ্গে সম্পর্ক ফিকে হয়ে আসছিল সেই সময়ে নতুন শতকে AACUED-এর উপস্থিতি আবার নতুন করে আশার বাণী নিয়ে এল। AACUED-এর লাইফ মেম্বার হিসেবে আর কোনও নির্দিষ্ট ব্যাচমেটের কথা মনে হয় না। একটি ছাত্রধারা— সকলেই যেন আমার কন্টেমপোরারী, বয়সের তফাৎ, ব্যাচের তফাৎ ঘুচে গিয়ে আমরা AACUED-এর সদস্যবৃন্দ আজ কাঁটাকলের উন্নতিকল্পে সংকল্পবদ্ধ। অ্যালামনির মাধ্যমে কাঁটাকলের সুখস্মৃতি নিয়ে আজ আরও বেশি একাত্ম, তৃপ্ত, গর্বিত বোধ করছি।

(সংক্ষেপিত)

পুনর্মুদ্রণ: *কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগ কাঁটাকল ৫০ বছর*

ছাত্র: ১৯৬২-৬৪

AACUED-এর জন্মকথা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাচভিত্তিক পুনর্মিলন কখন-সখন হয়। কিন্তু সমস্ত প্রাক্তনদের এক জায়গায় মিলিত হওয়ার কোনও মঞ্চ ছিল না। অর্থনীতির প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের এক মঞ্চে মিলিত হওয়ার প্রয়াস থেকেই AACUED-এর জন্ম।

২০০১-এর ১ ডিসেম্বর বিকেলে কিছু উৎসাহী প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচেষ্টায় শুভেন্দু দাশগুপ্তর বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে AACUED (Alumni Association of Calcutta University Economics Department) তৈরি হয়। AACUED-এর কিছু কর্মসূচিও রচনা করা হয়। নিছক বছর বছর পুনর্মিলন উৎসব করা এই সংগঠনের উদ্দেশ্য নয়। পুনর্মিলনকে কেন্দ্র করে প্রাক্তনদের সংগঠিত করা এবং সেই সেই সংগঠিত মঞ্চকে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ ছাত্র-ছাত্রীদের placement-এর ব্যাপারে সাহায্য করা অন্যতম উদ্দেশ্য। অন্য ভাবনা, অর্থনীতি বিভাগের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করা এবং কিছু কিছু আলোচনা সভার আয়োজন করে অর্থনীতির সাম্প্রতিক বিস্তারের সঙ্গে যতটা সম্ভব পরিচয় রাখা।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনার প্রথম প্রকাশ ঘটতে চলেছে ৭ এপ্রিল ২০০২ তারিখে, গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দরবার হলে। অত্যন্ত অল্প সময়ের প্রস্তুতিতে এই অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ২৫-৩০ জন প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী স্বেচ্ছায় এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। নিজেদের কাজ-কর্ম, সাংসারিক দায়বদ্ধতার পাশাপাশি সময় বার করে নিয়েছেন এই প্রয়াসকে সফল করার। চার-পাঁচ মাস ধরে চলছে এই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি। নিয়মিত বৈঠক। কখনও কারও বাড়িতে, কখনও ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার-এ, কখনও বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর সৌজন্যে চেষ্টা করা হয়েছে যত বেশি সংখ্যক প্রাক্তনের

সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়।

এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত না থেকে যে সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান এই প্রয়াসকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আমি AACUED-এর তরফ থেকে তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সমস্ত অনুষ্ঠানের মত এই প্রয়াসেও কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থেকে যাবে। তার দায়ভার আমাদের সবার। কারণ এটা আমাদের সংগঠন। আমাদের অনুষ্ঠান।

যে আবেগ থেকে এই সংগঠনের জন্ম হল, তার সুর যদি আগামী দিনে যারা এই সংগঠনের দায়িত্ব নেবেন তারা ধরতে পারেন, তারা যদি আমাদের স্বপ্নের উত্তরাধিকারী হন, তা হলেই এই সংগঠন তার উদ্দেশ্যপূরণের পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

সন্তোষ দাশগুপ্ত
সভাপতি
AACUED
৭ এপ্রিল ২০০২
পুনর্মুদ্রণ: *প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ*

"If there cannot be free atmosphere in a university, in an academic institution, then what type of lessons we can give to our students? An atmosphere must be free from prejudice, anger, violence, doctrines. It must be conductive to free flow of intellectual persuasions. Education means development of mind and constant interaction with teachers and fellow students."

— Sri Pranab Mukherjee, President
at the International Budddhist Conference
at Nalanda, Bihar, March 19, 2017
(Acknowledgement: *The Telegraph*, Kolkata,
March 20, 2017, p. 4)

Arthaniti Katha at Hundred Years

Economics, Society and Politics

The Misuse of Mathematics in Neoclassical Economics

Amiya Kumar Bagchi

Illustrations of Successful Use of Mathematics in Neoclassical Economics

In the literature of mainstream (read, neoclassical) economics I can think of three examples of successful use of mathematics whose theorems are verified by proper empirical tests. The first is the Slutsky equation which was put forward by the Russian statistician Yevgeny (Eugen) Slutsky, which was translated into Italian and published in the Italian journal *Giornale degli Economisti* (Chipman and Lenfant 2002).

The Slutsky equation is supposed to decompose the change in demand for good *i* in response to a change in the price of good *j*:

$$\frac{\partial x_i(\mathbf{p}, w)}{\partial p_j} = \frac{\partial h_i(\mathbf{p}, u)}{\partial p_j} - \frac{\partial x_i(\mathbf{p}, w)}{\partial w} x_j(\mathbf{p}, w)$$

where $h(\mathbf{p}, u)$ is the Hicksian demand and $x(\mathbf{p}, w)$ is the Marshallian demand, at the vector of price levels $\mathbf{p}$, wealth level (or, alternatively, income level) w, and fixed utility level u given by maximizing utility at the original price and income, formally given by the indirect utility function $v(\mathbf{p}, w)$. The right-hand side of the equation is equal to

Student: 1955-57

the change in demand for good *i* holding utility fixed at *u* minus the quantity of good *j* demanded, multiplied by the change in demand for good *i* when wealth or income changes. You do not really need a utility function to separate the income and price effects as the theory of revealed preference has shown. The Slutsky results were newly discovered by Hicks and Allen (1934; see also in this connection Chipman and Lenfant 2002).

A second successful use of mathematical and statistical techniques was made by Allen and Bowley (1935), when they demonstrated that the proportion of family expenditures on food and other items systematically varied as between the workers and other classes. Their results were extended with larger samples by Prais and Houthakker (1955), who also demonstrated that in the long run, income effects outweighed the price effects. This result is of great significance, since it can be shown why industrialized countries will suck in expenditures from primary-producing countries and why the latter will lag behind the industrialized countries unless they themselves can climb on the trajectory of dynamic industrialization. It can be further generalized to show that if the laggard countries become specialized in the production of manufactures with low income elasticities of demand, they will not be able to catch up with developed economies.

A third successful use of mathematical techniques occurred with Friedman and Savage (1948). In that paper the authors demonstrated why there are so many people entering the profession of a lawyer, when most lawyers earn so little, or so many people setting up as entrepreneurs when few of them make good. The reason lies basically in the aspiration of the entrants: even if few lawyers do very well, a few do very well indeed. They aspire to become another Matilal Nehru, or another Chittaranjan Das or another M. C. Setalvad. If you plot the number of persons in such professions on the y axis

and the income they earn on the x axis, you get a long-tailed curve, with most of the professionals in low-income brackets. This demonstration can be extended also to strategies of politicians in poor countries, with a permanent reservoir of unemployed and unemployable people. Major politicians dangle the bait of enormous legal or illegal gains to members of that underclass, and get them to do their bidding. Even if few of them become rich, others follow the great man or woman, hoping that someday he or she will look at them with favour, and they will come into untold wealth. Such people can also be used to threaten members of the opposition. Such reasoning can explain the success of a Doc Duvalier in Haiti, or for that matter, that of politicians in many states of India.

Illustrations of Misuse of Mathematics

One of the oldest examples of misuse of mathematics occurs with the rigorous formulation of general equilibrium theory, of which Debreu (1959) is a splendid example. The book is beautifully written, and is still a good read, when you are in a leisurely mood. But look at its assumptions. All markets exist in all commodities for all time to come. Thus at any point of equilibrium, all the prices and quantities traded are given for ever and ever. If you introduce any change into the economy, you move into a different world altogether, as in Arthur Clarke's science fiction or in Joan Robinson's world of tranquility. There is no possibility of carrying out any comparative static analysis. It is also a world without money. All the attempts to introduce money into a general-equilibrium world have so far been unsuccessful (Hahn 1971; Duffie 1997).

The introduction of the actuarial value of risky outcomes in a world of radical (uninsurable) uncertainty, that is the world of existing capitalism, has also led to numerous errors. Take, for example, the proposition that

you should be indifferent about two events which have the same expected value. Maurice Allais, however, showed that it is not true. People weigh a gamble with a great chance of loss or gain differently from a gamble with a small chance of loss or gain even though the expected value may be the same in the two cases. The following is an example of the Allais paradox, which arises when comparing participants' choices in two different experiments, each of which consists of a choice between two gambles, A and B. The payoffs for each gamble in each experiment are as follows:

Experiment 1				**Experiment 2**			
Gamble 1A		**Gamble 1B**		**Gamble 2A**		**Gamble 2B**	
Winnings	Chance	Winnings	Chance	Winnings	Chance	Winnings	Chance
$1 million	100%	$1 million	89%	Nothing	89%	Nothing	90%
		Nothing	1%	$1 million	11%		
		$5 million	10%			$5 million	10%

Several studies involving hypothetical and small monetary payoffs, and recently involving health outcomes, have supported the assertion that when presented with a choice between 1A and 1B, most people would choose 1A. Likewise, when presented with a choice between 2A and 2B, most people would choose 2B. Allais further asserted that it was reasonable to choose 1A alone or 2B alone.

Other examples of the failure of expected utility theory have been given by Daniel Kahneman and Amos Tversky in several papers (e.g., Kahneman and Tversky 1979).

"Choices among risky prospects exhibit several pervasive effects that are inconsistent with the basic tenets of utility theory. In particular, people underweight outcomes that are merely probable in comparison with outcomes that are obtained with certainty. This tendency, called the certainty effect, contributes to risk aversion in choices involving sure gains and to risk seeking in choices involving sure losses. In addition, people generally discard components that ae shared by all prospects under consideration. This tendency, called the isolation effect, leads to inconsistent preferences when the same choice is presented in different form (Ibid, p. 263).

Yet another example of misuse of mathematics to derive empirically invalid results are the mean variance analysis of portfolio choice and its extension to capital asset portfoliomanagement (CAPM) model developed by Harry Markowitz, James Tobin and William Sharpe. Tobin's construction was supposed to provide a rigorous basis for Keynes's liquidity preference theory. In fact, it cannot do that. Keynes's theory essentially depends on dispersion of expectations, given the means and variances of returns of various investment projects. Moreover, a key result of the Capital Asset Pricing Model (CAPM) is that the market portfolio—the portfolio of all assets in which each asset's weight is proportional to its total market capitalization—lies on the mean-variance efficient frontier, the set of portfolios having mean-variance characteristics that cannot be improved upon. Therefore, the CAPM cannot be consistent with efficient frontiers for which every frontier portfolio has at least one negative weight or short position. "We call such efficient frontiers "impossible", and derive conditions on asset-return means, variances, and covariances that yield impossible frontiers. With the exception of the two-asset case, we show that impossible frontiers are difficult to avoid" (Brennan and Lo 2008).

"Another illustration of the absurdity of the

neoclassical approaches to risk is the efficient market hypothesis (EMH) relating to the behavior of the stock market. According to EMH, stock prices display a random walk, so that nobody can make more than normal profit by playing in the market (Fama 1970). As soon as the EMH was floated, counter-examples began to proliferate. For instance, there was the Mehra-Prescott equity premium puzzle. Restrictions that a class of general equilibrium models place upon the average returns of equity and Treasury bills are found to be strongly violated by the U.S. data in the 1889-1978 period. This result is robust to model specification and measurement problems. We conclude that, most likely, an equilibrium model which is not an Arrow-Debreu economy will be the one that simultaneously rationalizes both historically observed large average equity return and the small average risk-free return" (Mehra and Prescott 1985, p. 145). Shleifer (2000) has given many other examples of the inefficiency of stock markets).

The final example of the absurdity of the neoclassical approach to markets and choices under risk is the options pricing formula of Fischer Black and Myron Scholes (1973) and Robert Merton (1973). A basic assumption of that formula is that the stock market can discover the fundamentals of a firm. Even before the advent of the theory of behavioural finance, pioneered by Robert Shiller, James Campbell and others, anybody who had read chapter 12 of Keynes's *General Theory* would have known that the stock market was noisy and was moved by irrational impulses. (Keynes, by the way, became wealthy by playing the stock market, so he knew what he was talking about.)

Most of the people who peddled these absurd theories – Gerard Debreu, Eugene Fama, Robert Merton and Myron Scholes (Fischer Black had died before the prize was awarded) - were awarded the Swedish Bank prize (misleadingly called the Nobel Prize). So it is mainly

ideology rather than scientific contribution that motivates the award of the prize.

Acknowledgement

I owe the illustrations of the Slutsky equation and the Allais paradox to Wikipedia.

References:

Allen, R. G. D. and A. L. Bowley. 1935. *Family Expenditure: a study of its variation*, London: P. S. King & Co.

Black, Fischer and Myron Scholes .1973. The pricing of options and corporate liabilities, *Journal of Political Economy* 81(3): 637–654

Brennan, Thomas J. and Andrew Lo. 2088. *Impossible Frontiers*, Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research Working Paper 14525.

Chipman, John S., and Jean-SébastianLenfant. 2002. Slutsky's 1915 article: How it came to be found and interpreted, *History of Political Economy,* 34(3): 553-597.

Debreu, Gerard. 1959. *The Theory of Value*, New Haven, Conn., Yale University Press.

Duffie, Darrell. 1997. 'Money in general equilibrium', pp. 81-100 in *Handbook of Monetary Economics*, edited by B. M. Friedman and F. H. Hahn, Amsterdam: Elsevier Science.

Fama, Eugene F. 1970. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, *Journal of Finance*, 25(2): 383-417.

Friedman, Milton and L. J. Savage. 1948. The utility analysis of choices involving risk, *Journal of Political Economy*, 56(4): 279-304.

Hahn, Frank. 1971. Equilibrium with transaction costs, *Econometrica*, 39: 417-439.

Hicks, J. R., and R.G.D. Allen. 1934. A reconsideration of the theory of value, Parts 1 and 2, *Economica, N. S. 1*, (February, May): 52-76, 196-219.

Kahneman, Daniel and Amos Tversky. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk, *Econometrica*, 47(2): 263-291.

Markowitz, Harry 1952. Portfolio selection, *Journal of Finance*, 7 (1):77-91.

Mehra, Rajnish and Edward C. Prescott. 1985. The equity premium: a puzzle, *Journal of Monetary Economics*, 15: 145-161.

Merton, Robert C. 1973. Theory of rational option pricing, *Bell Journal of Economics and Management Science* (The RAND Corporation) 4 (1): 141–183

Prais, S. J., and H. S. Houthakker. 1955. *The Analysis of Family Budgets*, Cambridge: Cambridge University Press.

Shleifer, Andrei. 2000. *Inefficient Markets: an introduction to behavioural finance*, Oxford: Oxford University Press.

Sharpe, William F. 1964. Capital asset prices: Theory of market equilibrium under conditions of risk, *Journal of Finance*, 19(3): 425-442.

Tobin, James. 1958. Liquidity preference as behaviour towards risk, *Review of Economic Studies*, 25(67):65-86.

Dark Alleys of Development

Kalyan Ray

Introduction

Development paradigm has so far by passed the concept of demographic equity. With a population of billion plus people and a limited job market, demographic equity poses a major challenge for India's socio-economic structure. The latest available demographic statistics show a population figure of 1.21 billion; a close second to China, with a population of 1.39 billion. Having an annual growth rate of population of 1.25% per annum, India is expected to surpass China by 2022, according to the United Nation's report on population released on July, 2015.India is the world's biggest young nation with nearly 2/3rd of the population below 35 years and nearly half below 25. Every month 2.1 million people will turn 25 and this will continue till 2025. To gain the demographic dividend of a young productive population, we have to continuously create jobs of this magnitude. This will require a major restructuring of our economy to make it more employment oriented. There has to be parity between development of skills of the young manpower and job creation.**Our economic development has been GDP (Gross Domestic Product) oriented and not employment oriented.** The economic barometer for development since globalisation of the economy has been growth in GDP and not employment generation or

Student: 1960-62

poverty eradication. **Social justice has become an anachronism in economic parlance. It is only unbridled competition, market mechanism and Economic Darwinism.** Malthus's theory of growing population and poverty, which had been given a decent burial long back, has raised its ugly head once again. U.N. report warns that large-scale joblessness may create a situation of major civil unrest, crime and violence. Increasing rate of violence and crime amongst the young people particularly in urban areas shows that this is not an empty threat. It is necessary to ensure that this section of the population is gainfully employed.

GDP growth vis-à-vis Demographic Equity

India switched over from socialistic pattern of economy to market driven economy in 1991. This was done to enable India's economic talent to reach its full potentiality in the global market and integrate India in the global economy. We have been showing a GDP growth figure of above 6%. In 2014, we had a growth figure of 7.4%. But our employment position has remained stagnant, with acute joblessness.

Economic **inequality has been rising with some earning astronomical remunerations, while majority languishes at the bottom of the ladder.** There has been a complete mismatch between economic development and emerging demographic pattern. This is visible even to any ordinary observer. Warning bells on increasing inequality and unemployment have been sounding for quite some time and can no longer be ignored.A major warning has come from no other quarter than the Chief of IMF, the Czar of global financial system. Managing Director of the IMF, Christine Lagarde said 'In India, the net worth of the billionaire community increased twelvefold in 15 years, enough to eliminate absolute poverty in this country twice over.' (Richard Dimbleby Memorial Lecture delivered in London on 3rd February, 2014). According

toChristine Lagarde, inequality is not only morally bad, but is also bad economics.

John Willmoth, Head of UN's Population Division, said 'the concentration of growth would make it harder to eradicate poverty, combat hunger and expand schooling and health systems.'World Institute for Development Economics Research of the United Nations in a report published in 2011 has analysed that India's strong GDP growth has not similarly reduced poverty. They have compared two Asian giants, India and China. At the US $1.25 level (minimum subsistence level), China's urban and rural poverty rates are estimated at 1.7% and 26.1%, with the latter above the global median of 17.9%. Poverty is as such a rural problem in China. In contrast at 36.2% and 43.8% respectively, India's urban and rural poverty rates are well above the global median of 17.9%. Both rural and urban poverty continue to be major problems in India. At present the problem is sought to be alleviated by subsidised rice and other freebies as election issues. Although this has been criticised by economists and others, it has been useful, as is seen from the election results. But these are no substitutes for creation of job opportunities and will only create a dependency syndrome.

According to International Labour Organisation report, India has been experiencing jobless growth, as the total employment grew by only 1.1 million from 2004-04 to 2009-10. Unemployment amongst the educated population has been on the rise. In fiscal year 2012-13, report of the Bureau of Labour Statistics of Government of India, gives an unemployment figure of 32% among graduates. This means one out of three graduates is unemployed. In UP on September, 2015, about 23 lac candidates that included graduates and PhD holders applied for 368 posts of peons. Even many technical graduates areunemployed, as technical job market is stagnant.

Unemployment and Industrial Unrest

The growing problem of unemployment among educated youth is a matter of serious concern. Highest unemployment rates are in the states of West Bengal (54%), Kerala (42%) and Odisha (39%), according to the above mentioned report. Gujarat has the lowest unemployment rate at 12%; followed by Maharashtra (14%) and Karnataka (14%). Better industrialised states have lower unemployment rate in the educated youth category. Eastern Indian states have paid dearly for the anti-industry campaign launched by some of the civil society groups and political parties.

Constant industrial unrest in the name of labour movement has led to deindustrialisation of West Bengal. Left groups led the anti-industry drive to dismantle the capitalist industrial structure built up under the British Government. This was done ostensibly with a pro-labour and social justice agenda. The policy was one of dismantling the industrial structure, without putting any alternative system in its place. Even State run industries suffered from continuous labour unrest and violence, making them sick. The confrontationist and short sighted policy proved to be counterproductive and bred massive unemployment. In fact labour came out worst in the bargain. Private owners of the industries came out much better in the bargain. They had an easy alibi in closing down the factories. Most of the plants and machinery in these factories had become obsolete, due to lack of investment to upgrade the same.

Business owners had no difficulty in transferring the investable funds to speculative channels. Real estate prices boomed and money found its way to various illegal speculative channels.Kolkata was the nerve centre of the financial scam of 2001 and played a major part in thefinancial scam of 1992. The Report on Stock Market Scam by Joint Parliamentary Committee, presented on December 2002, had pointed out serious irregularities in

the functioning of Calcutta Stock Exchange. According to the reports, most of the financial transactions took place in the form of unofficial Badla transactions (forward contracts), in the huge grey market, which had flourished in Kolkata for decades. Kolkata was thelargest illegal trading centre in the country, and its money power to finance private trading positions was completely disproportionate to its sick economy. (The Scam by Debashis Basu & Sucheta Dalal, 2002, Ken Source Information Service (P) Ltd.) Money released from productive channels found its way to unproductive and illegal speculative channel. It was in fact a Pyrrhic victory for the champions of labour.

Unemployment in the Rural Economy

Unemployment rate for 15-29 age groups among illiterate and semi-literate people has fallen from 9% to 3.7% in 2012-13. Most of these jobs are in the informal sector. The sudden rise in employment in this sector is mostly due to MGNREGS (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme). This is a scheme in the typical Keynesian pattern of 'digging holes and filling them'. It was a prescription for economic depression of the nineteen thirties, prescribed by Keynes. It can be used only in an emergency and is not a long term solution. It is more in the nature of unemployment relief. It is unlikely thatthe Central Government can continue the scheme indefinitely, without running a huge current account deficit. As such, it is necessary to find alternative employment opportunities in rural areas. Agriculture sector has remained stagnant and there are reports of farmer suicides throughout the country. In the globalisation drive, agriculture has been a major casualty. Rural development has been neglected in the last few decades. Crop insurance has to be taken up in a large scale, so that farmers are hedged in against crop failure. Cooperative institutions, which had played a major part

in rural development, in earlier stages have become moribund, due to large scale corruption and mismanagement. These have to be revived and professionally run for better service to the rural sector. It will be difficult for urban based institutions to fully cater for rural finance and other supporting services.

Development Efforts and Demographic Equity

We have been experimenting with different patterns of developmental models since independence. The First Five Year Plan was launched in 1951 with high hopes for banishing poverty from the country. It was not launched for creating millionaires and billionaires. In the words of its main architect, Jawaharlal Nehru 'Our work will not be complete, till the ambition of the greatest man of our time, Mohandas Karamchand Gandhi, to wipe away tears from the eyes of a single Indian remains unfulfilled'. Rousing words indeed and not a mere election slogan! No cynic can doubt its crystal clear sincerity of purpose.

Preamble to the First Plan starts by quoting Article 39 of the Constitution of India. It is necessary to reiterate it here:

'The State shall, in particular, direct its policy towards securing –

That the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood;

That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good;

That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment.

Having regard to these rights and in furtherance of these principles, as well as of the declared objective of the Government to promote a rapid rise in the standard of living of the people by efficient exploitation of the resources of the country.'

These were the objectives with which the movement to achieve economic independence for every Indian started. Those were heady days, full of ideals of a bright future for the nation and every Indian. This was a bold and visionarystep. Development economics, which became fashionable from the late fifties, was yet to make its appearance. Nehru was not bogged down by economic theories. Nehru had a vision for his country and charted his own course. Those were the days of charismatic leaders. People believed in his leadership. He brought together a team of scientists and engineers to work on his vision. This resulted in huge multipurpose dams and giant steel mills, which Nehru dedicated to the nation as the Temples of Modern India.The country was on its way to become a major industrial power. India got a head start in industrialisation, ahead of China. It is another thing that all these gains were frittered away. Greed, patronage, local pressure and irresponsible trade unionism, amongst others severely hampered the development process. New found prosperity created various pressure groups, who believed in self aggrandisement. Society had become more venal with a class of new rich emerging and money making replaced nation building. In spite of all these, much has been achieved. We would not have the economic infrastructure of today, but for the vision of Nehru, translated into action.

Development of infrastructure facilities like creation of large-scale irrigation facilities was a major achievement of India's development planning. This together with a pro-active agriculture research policy of lab (laboratory) to land, ushered in Green Revolution.India achieved self sufficiency in food grains production, proving prophets of doom like Malthus and his elk wrong. Theory of population propounded by the nineteenth century English Economist, T.R.Malthus, was popular among the Economists and general public. Malthus stated that population tended to increase in a geometrical

progression (1,2,4,8,16,32, - -) while subsistence increased only in arithmetical progression (1,2,3,4,5,6, - -). Malthus believed that poverty was inescapable and population can only be kept in check by famine, war and disease. Malthus was a pessimist and his theory was crude. But he was an influential economist. Ricardo and classical school of economics were greatly influenced by Malthus. Law of diminishing returns, which ruled economic theories for long, was conceived under the influence of Malthusian theory. Economic development has so far proved this theory wrong. Food supply has so far kept pace with the growth of population. There has been no major famine due to shortage of food. Famines have taken place basically for lack of purchasing power and failure of the distribution system.

Growing Problem of Unemployment

Unemployment is a major problem in the global economy in both the developed and developing countries. Full employment has not been possible in any country at any time. Most of the developed countries are managing the problem by unemployment subsidies. The consequences of such subsidies have been sometimes disastrous, specially for countries with weaker economies. We have recently seen the collapse of the economy of Greece due to payment of high subsidies on borrowed funds. Even within the Eurozone, what is sustainable for a highly developed country like Germany is ruinous for a country like Greece.Countries should have their own strategies of development, instead of following others blindly.

With a population of over 1.21 billion, development strategy has to be people centric, rather than only finance oriented. Development measured in terms of rise in G.D.P. does not necessarily give a correct picture of human development. In the jungle of financial statistics, one too often forgets human welfare. It is a well established fact that rising G.D.P. does not create a

proportionate increase in jobs. Jobless growth has become a major social and economic problem today. Monetary policy should be oriented towards maintaining full employment and living wages and not create speculative bubbles. Economic and financial globalisations have given rise to large scale crony capitalism and no country is free from it. World economic policies of last two decades have produced large number of billionaires in developing countries, while poverty index everywhere has been on the rise.

Era of Globalisation and Liberalisation and the Obstacles on the Path

In the fiscal year 1991-92, India had to globalise its economy to allow full play to international financial capitalism. This was done under directive of I.M.F., when India was about to default on its international debt obligations. Surprisingly, India's foreign institutional debt was all along being monitored by I.M.F. and Indian experts and no warning bell was sounded at any time, till the Indian economy reached a financial precipice. This seems to be the usual pattern in the world economic scenario, since the 1990s. Countries are led up the garden path by large scale borrowing of foreign funds, with strings attached, under World Bank and I.M.F. patterns of development. The Government of the day is too happy with such foreign funding and hardly bothers about the long term consequences. The promise of accelerated development, with which these foreign loans are packaged, proves tantalising for the corporate and media. This is also very useful in times of electioneering. 'It does not matter what long-range damage we do; it is the present moment alone, the short run – consisting of public opinion, demands, votes, and all the stuff and bribes of demagoguery – which counts'(F.A.Hayek, The Fatal Conceit).After the damage is done, nobody takes responsibility and the new dispensation promises another miracle.

Era ofeconomic globalisation and liberalisation, which was to usher in an era of business friendly regime, not encumbered by licence control Raj, has not kept up to the promises. The economic regime since the nineties has certainly not been business friendly. There has been no relaxation of laws for starting any enterprise, due to pressure from various sources. The fact remains that there are too manystake holders (real or notional) involved in any issue concerning any developmental project. In reality, there have been more of restrictions in setting up any project in the last two decades than in any earlier period, since independence. Major projects have been stalled due to various reasons. This has led to blockage of funds of public financial institutions, which borrow from the general public. This has created imbalance in the banking system, with huge debts in the form of nonperforming assets. There has been blockage of scarce funds and a stagnant job market. In effect licence control Raj has been replaced by NGO Raj. Unlike the government, NGOs are not accountable to anyone. It has become very easy for even a single individual to block a project by filing a PIL or approaching any of the tribunals. Judicial process takes time and once the matter is dragged into litigation, there is serious cost overrun and other problems, leading to jeopardising the project. Instead of single window clearance, it has become multiple level clearances. If one wants to set up a project, one has to get clearance, not only from Centre and State Governments, but also from local Panchayats. Even after all this, the project can be stalled by anybody by taking recourse to judicial or agitational methods. The Environmental Laws are extremely opaque and can easily be used for stalling any project by any interested parties. It has become a subtle weapon in the hands of business rivals. It has also become a major source of social tensions.

In India, various lobbies, represented by different groups of people, can stop implementation of any project.

In the last ten years, we have seen major projects like POSCO in coastal Odisha and Vedanta Aluminium in western part of the State, being stalled and ultimately abandoned. There is no doubt that these projects, if allowed to be implemented, would have revolutionised the industrial situation in Odisha, with a huge chain of ancillary industries. The projects, in spite of government clearances, have failed to be established, due to resistance from a group of local people and environmental lobbyists. It is not that all the local people are against these projects. There is a large section of people, who support these projects, but there is a small and vocal section, which oppose these projects. This often creates social tensions and gives rise to violence. It is obvious that if everybody's concern has to be taken into no major development scheme can be completed. There has to be a balance between general welfare and individual problems. Major development projects need some amount of relocation. Even adequate compensation has not been able to solve this problem.

China, a Communist country, now has become industrialised in a big way. China today is an open country and any major human rights violation is not possible. Western governments, media and NGOs may not be happy with China. But could China have become a major industrial power, if she had toed their line? India need not and cannotfollow China, as her political and social systems are different. At the same time, the democratic political structure need not act as a deterrent to development. According to the Constitution, democraticallyelected government should have the final say in the matter. Not trusting a democratically elected government, which is accountable to people is a danger sign for democracy. It is not desirable for the government and society to be dictated by small groups, which have their own agenda and are accountable only to their funding agencies. Democracy is not after all a Tower of

Babel, where everybody speaks in a different voice, creating a cacophony of noise.

In the present situation, one is reminded of the well known story from the Aesop's fables 'The Man, the Boy and the Donkey'. It is worth repeating the story, for it sums up the present situation very well. Father and son were going to the market with their donkey. On the way, some people mocked them as fools for not riding on the donkey. The man put his son on the donkey and continued the journey. Before long, they met some people, who rebuked the young man, for letting his elderly father walk, while he enjoyed the ride. The man asked his son to get down and mounted the donkey. In this way, they proceeded for some distance, when they met a group of women, who commented that the unkind man was making the poor boy walk. The man thought that the best way would be for both of them to ride the donkey. Accordingly, both of them got up on the donkey and continued their journey. Ere long, they came across some people, who chided them for being cruel to the donkey. The man was at his wits end and decided that the best way, would be to carry the donkey. They then tied the donkey's legs to a pole and carried it upside down. When they neared the market place, they had to cross a bridge on a river to reach the town. As it was a market day, there was a huge crowd, which was astounded by this strange sight. The crowd of people started jeering the father and son duo carrying the donkey on their shoulders, as they were crossing the narrow bridge. There was a big ruckus and the donkey took fright. Thetwo could not control the creature and it slipped out of their grip into the river and wasdrowned. The moral of the story 'Try to please everybody and you will please none'. This simple story is there almost in every culture in different form and constitutes the wisdom of ages. In this story, we can see the replica of different lobbies. Lastly, the views of the animal rights group were instrumental in the duo carrying

the animal. Confusion is the worst enemy of any human activity.

Country can hardly make any tangible progress, unless quick decisions are taken in the economic front. In any business decision, time is money and any delay leads to waste of public money, since all projects are funded by financial institutions, which borrow from the public. There was a huge backlog of projects, pending projects, particularly for environment clearance at different levels. There were number of scams like telecom scams, coal scam and Commonwealth Games scam in the last decade. Corruption became a national issue and economic development took a back seat. The continuous tussle between Prime Minister's Economic Council and National Advisory Council created confusion in policy matters. All these led to complete paralysis in policy matters and decision making. A liberalised and business friendly economic climate as expected did not occur, after economic liberalisation.

The policies have led to concentration of wealth in the hands of few individuals, who have used the liberalised financial sector to their advantage. The result has been an era of scams. Economic liberalisation regime (started in March, 1991), was immediately greeted by the Securities Scam of 1992. This was a financial scam of unprecedented magnitude. The investigation machinery was not equipped to handle a financial scam of such magnitude, where brokers, bankers and accounting firms are involved. Such a scam is not the work of a single individual, but the result of collusion between powerful forces controlling the financial system. Nothing was learnt from the Scam and no safety measures put in place. Since then, there has been one scam after another, bedevilling the Indian economy.

The regime of easy money, since the nineties in the name of facilitating investment, has created major inflationary situation in the Indian economy. This has

robbed the common people of their savings. Recently RaghuramRajan, Governor of Reserve Bank of India, in an international Central Bankers' meet at Frankfurt, along with his German counterpart have said that easy money policy of the Federal Reserve of the USA, is harming the economy of India by creating financial volatility. While money supply has risen many fold, industrial output is stagnating at 3% growth. India's one of the major problem post nineties has been the failure of the manufacturing sector to grow. This has led to stagnation in industrial employment.

The genie of development, which has been released, has created large-scale inequality. Along the path to economic development, we have forgotten the directive of the Constitution to provide the right to livelihood to every citizen. Equity and social justice, enshrined in the Constitution, have become obsolete and are against the current economic logic. Managing Director of the IMF, Christine Lagarde said 'In India, the net worth of the billionaire community increased twelvefold in 15 years, enough to eliminate absolute poverty in this country twice over.' (Richard Dimbleby Memorial Lecture delivered in London on 3rd February, 2014). Lagarde held that lopsided economic growth has resulted in a situation, where the richest 85 people in the world own the same amount of wealth as the bottom half of the world's population. Lagarde rued'Economists have underestimated the importance of inequality. They have focused on economic growth, on the size of the pie rather than its distribution. Today, we are more keenly aware of the damage done by inequality. A severely skewed income distribution harms the pace and sustainability of growth over the longer term.It leads to an economy of exclusion, and a wasteland of discarded potential.'

'Make in India' is a good policy and needs to be followed up. Government of India is setting up an 'Atal Innovation Mission' to promote a culture of

entrepreneurship and innovation. NitiAayog has suggested a scheme of 'grand prizes' in the pattern of US to find ultra low cost solutions to India's most intractable problems. 'Swachha Bharat' campaign need not confine itself to traditional broom sticks only. Waste disposal and recycling of waste productsare areas, which have been completely neglected. These have been entrusted to Municipal and local bodies, who have treated these activities in a routine manner. Our caste system has proved to be a big barrier in giving proper importance to this sector. None of the engineering institutes in the country has carried out any practical research in this direction. There is need for innovations in this sector. Number of small and medium industries can be set up in this sector.

Agriculture sector has remained stagnant for long. There is need for enterprise and innovation in this sector; mere government sops will not do. Indian agricultural sector has remained basically traditional and conservative, with age old ideas. Failure of Indian agriculture has been basically a managerial failure. Indian agriculture still remains a gamble on the Monsoons. If a desert country like Israel, with its perennial problems can turn agriculture into a profitable venture, there is no reason why India with much greater natural resources cannot do the same. Rural India has to be modernised and this can be done only by quality education and not by traditional methods.

Knowledge for All

Availability of Internet has opened up vast opportunities for non-formal learning and this can revolutionise knowledge. Now knowledge is available to everybody and the exclusiveness of knowledge has been broken. With the free availability of knowledge through the internet, monopoly of knowledge of the educational institutions would cease. This is a revolutionary idea in

the Indian context, where the teacher is elevated to the level of Guru. In India, a tradition has come down over the ages that no knowledge can be inculcated, except through a Guru. This person is in absolute possession of knowledge, which can be acquired by complete submission to him. The story of Ekalabya (real or imaginary), which is even now touted as an example of absolute devotion to Guru, is a prime example of this. This is a throw-back to a time, when education was oral and hereditary. With printing press and now the internet, the concept of Guru has become redundant. There is certainly scope for self-taught individuals. There is no dearth of individuals, who have achieved great heights, without formal education. Internet will create a level playing field for the larger number of people, who are denied the advantage of higher education. Democracy in knowledge should prove to be the first step for inclusive development, which has evaded us so far.

Competition Law and Corporate Control over Global Agri-Business: A Critique

Arup Ratan Mukhopadhyay

Introduction

The paper seeks to present a critique of Competition Law in the perspective of trans-national corporations (TNCs) control over global agri-business.

Since the adoption of Sherman Act,1890 countries in both the developed and developing world have been trying to control the emergence of dominant power in the market so that the market force can operate freely. A number of acts viz., Clayton Act, 1914, The Federal Trade Commission Act, 1914 the Celler-Kefauver Act, 1950 (US), Monopolies and Restrictive Practices (Inquiry and Control) Act, 1948 (UK), Merger Regulation, 1989(EC), MRTP Act, 1969(India) and Competition Act, 2002(India) have come into force to control the emergence of monopoly power in the market and to clear all impediments to free trade and competition.[1]

But in spite of all these efforts growth of dominant power in the market either in the form of monopoly power or in the form of duopoly/oligopoly power could not be restrained. World markets in the organized sector continued to be under imperfect competition. The growth

Student: 1983-85

of dominant power in the market poses a challenge to Competition Law. The conflict between regulation and market mechanism being a hot topic in applied economics and law, the Nobel Committee has conferred this year's Nobel Prize in Economics to French Prof. Jean Tiroli for his analysis on 'Market Power and Regulation. Prof. Tiroli argues that, an uniform regulation is not sufficient to control the growth of monopoly power in different trades as different industries have dissimilar features which call for micro level analysis in each industry.

In this paper, attempt has been made to trace the nature of dominance in global agri-business over last 50 years and how it makes the concept of competition void.

First, the paper presents the elements of Competition Law which is being adopted globally. The transition of law in India from Monopoly and Restrictive Trade Practices Act, 1969 to Competition Law 2002 has been made in pursuance of the policy of globalization and liberalization of trade followed since 1990. Discussion has been made on the foundation of competition law in economic theory which is found in the thought of Chicago School of which Milton Friedman was the main proponent. An alternative thought that existed in Keynesian School has also been discussed. The control exerted by the TNCs in global agri-business has been discussed in the light of Competition Law.

Third, the paper puts a critique of Competition Law in the perspective of spread of oligopolistic control in the global agri-business over last 50 years when the Competition Law was in existence in some form or other in the countries across the globe.

Competition Law and Economics

Competition Law by definition is designed to protect competition in the market for the interest of the consumers and for the greater interest of the society/state. The origin of the competition law is found in American Sherman Act

of 1890. Over the years the competition law has been modified to enable the market mechanism to operate freely without any hindrance in the hand of private power or the State power.

Initially the objective of the competition law was to curb restrictive trade practices and to discourage formation of monopoly power in the market. The Sherman Act 1890, prohibited contracts, combinations or conspiracies in restraint of trade and also prohibited monopolization or attempts or conspiracies to monopolize. Clayton Law 1914, was designed to control mergers, tying, price discrimination and exclusive dealing. The federal Trade Commission Act 1914 created an autonomous enforcement agency to control market abuses. Celler-Kefauver Act 1950 attempted to exert more control over mergers. In UK initiative had been taken to restrict monopoly and restrictive practices by enacting Monopolies and Restrictive Practices Act 1948. In 1989 the European Commission adopted Merger Regulation to restrict the anticompetitive mergers in business. [2]

In India the Monopolies Enquiry Committee recommended to frame a law to restrict the growth of monopoly power in the market and to curb restrictive trade practices by the private capital. MRTP Act came into force in 1969. With the change in economic policy in favour of globalization, liberalization and privatization there was the need to formulate a business friendly competition policy and the Competition Law 2002 was the outcome.[3]

The principal objective of all the competition laws enacted in different countries across the globe was to create an environment so that the market forces can work freely for the greater interest of the society.

The basis of competition law is found in the capitalist economic theory which pleads for free trade and free operation of the market. The proponents of the free market theory says that, competition in the market can

only ensure perfect utilization of factors of production and encourages individual entrepreneurship. Competition in the market ensures efficiency and propensity to invest. This theory of free market is propagated by Chicago School whose main architect was Milton Friedman. However the origin of this concept in capitalist economics is found in the writings of Doglas North[4] and John Hicks[5].

According to this School of thought, individual entrepreneurship is the main driving force of market economy and that can be encouraged by removing all sorts of control over the market. The theory further states that, there should be a balance between individual return and social return of any investment. The role of State in ensuring this free market mechanism is vital in framing rules for removing impediments to market competition and also to overcome 'free rider problem' in new investment in research and development.

Chicago School is very profound in stating that, the role of State should be restricted only in framing law for ensuring individual ownership over investment and to ensure competition in the market. But the State should seldom interfere in market mechanism. In fact, Milton Friedman claimed that, participation of State in production system has slowed down the development of capitalism in developing countries— underdevelopment, poverty and inequality are the ultimate outcomes. According to Friedman, the State should play a passive role and economic activity should be entrusted to the market.

An alternative view is also found in the framework of capitalist economic theory. The Keynesian School says that, since there is an element of anarchism in the capitalist system, therefore the role of State is vital in bringing / ensuring stability in the market. This has been felt in the face of recent recession in 2008 when the market mechanism failed to stabilize itself and intervention of

Government in US and EC became necessary.

This concept of Competition Law which takes the form of free trade in economics is in sharp contrast with the 'infant industry protection argument' in trade theory, forwarded by Prebish-Singer, applicable to the developing countries. The model states that, since the infant industries in developing countries are not matured enough to face competition with the enterprises of the developed countries, protection is needed at least at the initial stage of industrialization of the developing countries.

Competition law has been designed to prohibit anti-competitive agreements between enterprises that put hindrance towards competition. The agreements between enterprises at the same stage of the supply chain i.e., 'horizontal agreements'—and agreements between enterprises at different stage of the supply chain of the same product—i.e., 'vertical agreements'— both are being addressed in the Competition Law.

Merger is an economic activity which is likely to adversely affect competition. All types of mergers, viz., horizontal, vertical and conglomerate between enterprises are aimed to expand oligopolistic control over the market by centralizing economic power in the hands of a few.

Though the competition authorities are usually concerned about horizontal mergers which are likely to create dominant position in the market and ultimately lead to a cartel-type arrangement in the market but the effects of vertical mergers and conglomerates are not benign.

Jean Tiroli, the Nobel Prize winner in economics in 2014 has made an intensive theoretical analysis on 'market power and regulation' in the branch 'Industrial Organization' of economic theory.

This paper seeks to analyze that, the merger agreements that took place in global agri-business over last 50 years has led to evolve dominant position in the market in the hands of a few TNCs which colonize the

food chain and this phenomenon too took place when Competition Law has been enacted in different countries across the globe.

TNCs Control Over Global Agri-Business

Today's agri-business system consists of the farmers on one hand as the producers of food and the organized industrial sector on the other hand as the suppliers of agricultural inputs, viz., seeds, fertilizers, pesticides etc., which together form the backward linkage of production and processing, packaging and food industry which together form the forward linkage of production to the market. The present phase of global agri-business system has emerged through different stages:

i) Growth of agrarian capitalism;
ii) Emergence of monopoly capital in agriculture and
iii) Maturing the capitalist agricultural system.

The history of agrarian capitalism can be traced back in the pre-capitalist mode of production when the means of production were in the possession of peasants and the nature of exploitation was through 'extra-economic' powers.

In the sixteenth century, English agricultural producers were market dependent because of the system of property relations. Their access to land itself was mediated by the market of leases in which prospective tenants had to compete. Ability to pay the rent called for more productive farming, which emerged as the pre-condition to survive in the system as producers or to join the class of landless labourers. Thus market imperatives intensified exploitation of labour to attain higher productivity.

It is to be noticed that, the growth of agrarian capitalism in England was not dependent on the existence of proletariat class but on the market-dependent tenant-producers. The wage labourers remained very much a minority in seventeenth century England. The competitive pressure of the market, operated not only on the tenant-

producers but also on the individual farmers. This market dependence was a cause not a result of mass proletarization.

Agrarian capitalism, a localized product of very specific historical conditions of 16th. & 17th. Century England, took the form of colonial expansion and imperialism in search of new markets and resources. Emergence of market as an economic discipline or regulator was the driving force of the agrarian capitalism in England.[7]

Development of industrial cities in England and US was acted as a driving force behind the commercialization of agriculture. The process of commercialization is characterized by two features:[8]

First, trend towards production-trade combination for mutual reinforcement and second, trend towards splitting of economic activities into different specialized components.

As a process of specialization, the 'seed to plate' integrated food system was transformed into a multi-stage food system, in which a number of firms were in operation at various stages. This early stage of development of capitalism in agriculture was characterized by perfect competition. Later the relation between the firms had been altered by the processes of horizontal and vertical integration of agriculture related produces leading to the growth of monopoly capital in agriculture.

In a complete agricultural system, production of agricultural outputs, processing of the products, transportation to the market, packaging, supply of inputs of production are considered as different stages of operation.

Increase in size and decrease in the number of firms in a particular stage of the system manifests horizontal integration in the system. This horizontal integration had given rise to oligopoly control over the market, for example, four largest companies had controlled the processing of agricultural commodities in US in 1997.

Market concentration of these firms ranged from 57 to 76 percent. Out of these 4 firms, operating in product market, Cargill has also been operating in the input market (seeds) too since 1981.

The petroleum companies, already producing fertilizers and pesticides, found the business of seed advantageous to them, as the same advertising and distribution channels were employed for marketing seeds.

The intensive research on genetics and chemicals opened the opportunity to integrate the three different fields, viz.,seed, fertilizer and pharmaceutical and thus the chemical conglomerates became world's leading seeds-men. Agrochemical and seed ventures were grouped within the same corporate division. Bayer, Ciba-Geigy, Shell, Monsanto, Hoechest, the world's largest pesticide and pharmaceutical giants took the control of global seed industry. The chemical and fertilizer giants followed the path of acquisition and mergers to take hold of the seed industry. Seed was placed within the agro-chemical programme of these companies.

Kema Nobel, Europe's leading supplier of fumigants for fruits & vegetables, bought Europe's leading garden seed companies. Reichold Chemicals, a supplier of pesticides for lawns and gardens acquired lawn and garden seed companies in US. Stanffer Chemicals, a giant in maize pesticide merged with maize seed company to take hold in maize business. Ciba-Geigy, the dominant maize pesticide company in US, collaborated with Funks Seeds, a leader in maize breeding in the same market. Celenese, supplier of seed coatings of garden seeds, bought out Harris Seeds, a leading garden seed house.

The growth of corporate control over the seed sector was pronounced by coating the seeds with chemical protectors (seed treatment chemicals against fungicides), by designing advertisement packages to promote the seed along with the chemical component of the company and last but not least by dove-tailing pesticides & seeds

research to produce compatible seeds/biocides that might be tolerant to each other.

As for example, the chemical giant Ciba-Geigy had wrapped its proprietary grain sorghums in three chemicals one of which was to protect Ciba's seeds from its leading herbicide Dual, which is normally toxic to grain sorghum. The dove-tailing research and development programme of pesticide and seed had provided the chemical TNC to sell more herbicide.

A study of Klopenburg Jr. reveals that, in 1981, around 68% of the global seed market was dominated by six TNCs inferring the growth of oligopoly in global seed market. Out of ten leading seed giants, Pioneer Hi-bred itself controlled 33% of global trading of seeds.

The growth of corporate control over global agricultural scenario was intensified with the advent of biotechnology and its application in agriculture. The TNCs who had been controlling the markets of agro-chemicals and seeds, developed in-house biotechnology research capability by equity participation with the subsidiaries.

The process of merger and acquisition had given rise to oligopoly control in global seed and agrochemical markets. The composition of the controlling firms had also been changed over time.

By the 1990s the chemical companies had gained a very dirty reputation for chemical reaction in food, chemical pollution in ground- water and development of toxicity in soil. So in the mid and late 1990s they sought to change their identities from chemical dinosaurs to biotech saviours by attaching a new concept 'life Science' with their names.

In April 2002, Monsanto entered into an agreement with DuPont for technology sharing with latter's Pioneer Hi-Bred International Inc. Do-Pont and Monsanto ranked number one and two in seeds in 2001 and between them hold up to 40% of all significant patents on agricultural

biotechnology. Having purchased a global spread of seed companies (nearly 10 billion spent since 1996), Monsanto became a subsidiary of Pharmacia in 2000.[9]

Aventis Crop Science was formed with the merger of AgrEvo and Rhone-Poulenc Agro, the agrochemical and crop science divisions of Hoechst (Germany) and Rhone-Poulenc (France) respectively. In April 2002, the agrochemical giant Bayer bought Aventis Crop Science and became global number two in pesticides. BASF has bought MicroFlo and American Cyanamid in 1999 and 2000 respectively to become world's fourth largest agrochemical company.[10]

34% of the global agrochemical market is being controlled by top 2 companies and 84% of the market is being controlled by top 10 companies in 2000.[11]

Global seed business had been controlled by a handful of 10 TNCs during 1999 to 2001. They controlled almost one-third of the $24.7 billion global commercial seed market. Indeed two companies —Monsanto and DuPont controlled almost 15% of the market. Corporate control is steeper if one makes a crop specific micro level analysis:[12]

1. 40% of US vegetable seeds come from a single source.
2. Top 5 vegetable seed companies control 75% of global vegetable seed market.
3. Do-Pont and Monsanto together control 73% of US seed corn market.
4. Just 4 companies (Monsanto, Du-Pont, Syngents and Dow) control at least 47% of commercial soybean seed market.

Corporate control over the seed sector is likely to continue as most of the largest seed companies are also the largest pesticide companies and agri-biotech companies. Most of their research has been directed towards integrating their pesticide and seed businesses by developing genetically engineered seeds. The seed/

chemical conglomerates have taken the protectionist strategy to restrict the transfer of genetic modification (GM) technology. The push towards biotechnology is the principal reason for the growing concentration in the seed market. The market for GM seeds is overwhelmingly dominated by Monsanto.

Monsanto[13] is a US-based TNC producing world's largest selling herbicide 'Round Up'. Round Up being a non-selective herbicide kills all plants. Monopoly over input sector is achieved with the development of 'Round Up Ready' crops which are engineered to be resistant to this lethal Roundup herbicide. Monsanto's latest development is terminator seed or sterile seed which has the potentiality to provide TNC with the monopoly power to control the world's food supply. Monsanto is exerting its control over major seed companies through acquisitions, mergers and patents. The product profile of Monsanto reveals its desired link between farm, food and pharmacy. Monsanto, merged with AHP, alone controls one-fourth of the global market for agrochemicals.

The above discussion explains the control over the market of agricultural inputs by a few TNCs. Similarly the market of agricultural produce is also being controlled by a few TNCs. Thus the whole agri-business came under an oligopolistic marketing system with specialized functions, transformed from an integrated food system controlled by the farming community.

Critique

Analyzing the strategy followed by the leading TNCs engaged in agri-business it is inferred that, the mergers that took place in global agri-business are by nature 'horizontal' mergers and 'conglomerates'. The TNCs colonize the food chain both in the input sector and in the output sector. The control over inputs of production has been facilitated by control over technology. TNCs engaged in agro-chemicals used the seed technology to

produce seeds that will enhance the business of agro-chemicals also. Integration of the three different fields, viz., seed, fertilizer and pharmaceutical of agricultural production facilitated the growth of oligopoly in the input market. Over the years, through mergers and acquisitions this oligopoly in some cases took the form of duopoly, manifestation of extreme concentration of power in the market. More and more the technology is upgraded control over it became sharper. Control over capital and technology together made the competition in the global market of agri-business more and more imperfect. The same thing is happening in the output market also. Combination of these two, i.e., control over backward and forward linkages of agricultural production is actually leads to colonize the food-chain in the hands of a few TNCs.

Surprisingly the concentration of economic power in the hands of a few have been taking place when the Competition Law is being enacted across the globe. Why Competition Law fails to control this concentration of economic power?

The Competition Law confines itself in the market, a place or an institution where exchange takes place. Behind it is the domain of production. Former is the appearance and latter is the essence. Concentration of economic power is taking place in the domain of production which is being manifested in the domain of exchange. In the domain of production, concentration of economic power has been encouraged by enactment of other laws, viz., Patent Law, Plant Breeders' Right etc. So there is a contrast of laws in different domains. Market being a mirror- image of production system, control over economic concentration in the market will no longer be fruitful so long as the concentration of economic power in the domain of production is controlled. Here lies the fallacy of competition law. The regulation needs to be more industry oriented to address the elements of growth of

market dominance in different industries. An uniform law can hardly address the problem of dominance in economic power in the market.

References:

1. Tilottama Ray Chaudhuri & Vaneeta Patnaik, *Study Material on Competition Law*, NUJS 2014.
2. Vinod Dhall, *Overview: Key Concepts in Competition Law*, compiled in study material NUJS 2014
3. Amitabh Kumar, *The Evolution of Competition Law in India*, compiled in study material NUJS 2014
4. Doglas North, Robert Thomas, *The Rise of the Western World*, Cambridge University Press, 1973
5. John Hicks, *A Theory of Economic History*, Oxford University Press, 1969
6. Ellen Mciksin Wood, *The agrarian origins of capitalism*, Monthly Review, New York, vol. 50, no. 3, July/Aug. 1998
7. Willium D. Defferman, *Agriculture and monopoly capital*, Monthly Review, New York, vol. 50, no. 3, July/Aug. 1998
8. Pat Roy Moony, *The Law of the Seed*, ch. The Global Seedsmen
9. Jack Ralph Kloppenburg Jr. *First the seed: The Political Economy of Plant Biotechnology*, Cambridge University Press, London, 1981
10. Helena Paul, Ricarda Steinbrcher, *Hungry Corporations*, Zed Books, 2003
11. *World Seed Conference*, www.rafi.org, 3 Sept. 1999.
12. Shibani Chowdhury, *Monsanto: Peddling Life Sciences or Death Sciences*, Research Foundation for Science, Technology and Ecology, New Delhi, July 1998.

Inequality and Economic Growth – Dynamics of Capitalism in Oligarchic Market Structure

Dhiraj Kumar Bandyopadhyay

Introduction

The main objective of our present study is to capture the linkage between inequality and economic growth in the perspective of the dynamism of capitalism under oligarchic market structure. In order to capture the said linkage we have tried to examine the issue of inequality in light of Thomas Piketty's analysis of growth of capitalism. The issue of inequality is now back at the center of global debates as a growing number of economists suspect that widening inequality has been an important cause of the Great Recession. This represents an important shift from previous mainstream economic thinking, which held that inequality should not be the focus of economic analysis, and from the politically-loaded argument that "growth should take the driving seat and distribution the backseat". Since Kuznets' influential 1955 research work, economists have attempted to determine the linear relationship between income distribution and growth (the Kuznets Curve). However, this relationship has been contentious, and indeed, both the theory and the empirical evidence are, at best, ambiguous. Kuznets was understood to suggest that income inequality evolved along an 'inverted-U',

Student: 1985-86 (M. Phil)

widening in the initial stages of development and narrowing down later on. While his analysis centred on the role of industrialization, urbanization and the concentration of savings among the wealthy, analysts have proposed other factors that could explain the same curve. As for example, after the turning point, finance may become increasingly accessible, land less significant (Barro, 2000). It is important to note that the lack of empirical support for the Kuznets Curve raises another important question: "Does inequality matter in economic growth?" The 'independent' role of inequality has been ignored by neo-classical economists and Kuznets' view has commonly been interpreted as offering a 'natural law' on the relationship between inequality and economic growth. Indeed, in neo-classical or neo-liberal theories, inequality is ideally dependent of growth. In as much as inequality results from the market, it is said to represent the efficient distribution of resources to the most productive elements of society. So, it means the dynamics of income and consumption distribution have no welfare implications.

We know that "Trickle-down economics" has always been with us, but was trumpeted as economic wisdom only from the Thatcher-Regan era of the 1980s. This was the product of economic theories of Friedrich Hayek and Milton Friedman. It got the ultimate boost with the collapse of communism in the Soviet Union, and the evil of Post-War Keynesian Consensus was finally exercised. We argue that there are basically two arguments put forward by the proponents of "trickle-down economics". One stresses that it is perfectly all right if the economic system makes the rich richer while the income of the bottom 40 per cent remains flat. It means some people are getting better off while nobody gets worse off. The other argument is that a gap between the rich and the poor provides strong incentives for the poor to work harder, study longer and take greater risk to improve their

economic lot. But, both these contentions have been convincingly refuted by a recent report of the Organisation of Economic Cooperation and Development (OECD (2015)). In It Together: Why Less Inequality Benefits All. The subsequent periodic economic crises of the 1990s and the first decade of this century were mysteriously explained away by the leading economic policymakers in the West until the banking crisis shook the World economy to its very foundation. Some closet Keynesians, like Joseph Stiglitz and Paul Krugman, became vocal critics of "trickle-down economics". Interestingly, the current official positions of the developed as well as many developing countries like India are antithetical not only to the humane discourse that Gandihji was propounding, which postulated that no section of the population should consider itself better off by some policy if some other sections belonging to the non-affluent were pushed into greater distress by it, but also what even conventional economic theorising suggests. Vilfredo Pareto, the Italian philosopher, economist, had suggested a criterion for comparing alternative states of society, which has acquired wide currency in economics. According to it, between social states A and B, if there are some persons who are better off, and nobody is worse off, in A compared to B, then A is socially preferable. On the other hand, if some persons are worse off in A compared to B while others are better off then we cannot say that A is to be preferred to B. Taking to be social state where rich becomes richer and the poor becomes poorer relatively, it clearly follows that we cannot consider that state is socially preferable to a state where there is less inequality with low income growth – egalitarianism may override Pareto, but not the converse.

What is more, the interaction between the corporate sector and the state is an unavoidable feature of capitalism. In the past two to three decades this has bred

both impressive business dynamism and even more impressive accumulation of extreme wealth in the developed capitalist countries as well as in developing economies and India has embraced in this issue. There is a real question as to whether an oligarchic business structure and a corruptible state will lead to the propagation of inequality and create distortions that hurt the growth process. What is more, in recent years, a growing body empirical research has indicated that there is another major mechanism through which inequality matters, often significantly, that is, inequality can create shortfalls in consumption demand and, if these shortfalls are not fully offset by other macro variables such as investment (public as well as private), they may reduce growth or cause economic instability. It is important to note that aggregate demand is affected by both functional income distribution (that is division of income between capital, labour and land) and personal income distribution (division of income among individuals, can be taken as proxy to it, households consumption expenditure data provided by NSS in India). A classic way on issues of both functional and personal income distribution of inequality has been dealt by Thomas Piketty in his latest work by a publication of book *Capital in the Twenty-First Century* (2014). The excitement over the book has spread to many corners of the world. When he visited the U.S. ear1y in April, 2014, he was greeted to a number of Nobel Laureates such as George Akerlof, Robert Solow, Paul Krugman and Joseph Stiglitz. Many more have lavished praise on his work.

The main Contribution of Thomas Piketty is the massive amount of historical data that he has collected on inequality for several countries, and broad patterns that he has deciphered in terms of historical changes. For him, inequality is a social and phenomenon embedded in the larger canvas of wealth flows and income distribution and he wished to study them in the manner

that classical economists like Ricardo, Malthus and Marx studied. Piketty says, "For far too long, economists have neglected the distribution of wealth, partly because of S. Kuznets' optimistic conclusions and partly because of the profession's undue enthusiasm for simplistic mathematical models based on so-called representative models".

Having said these, the rest of our study is organized into four sections. Section-II likes to examine Kuznets curve by re-examining inequality and functional distribution of income shares of capital and Labour in line with the argument provided Thomas Piketty. Section-III examines inequality and economic growth in an oligarchic Indian corporate market structure of capitalism – interaction between the corporate sectors and the 'state'. Section-IV finally concludes.

Debunking Kuznets curve by re-examining inequality and Functional distribution of income Shares of Capital and Labour

Thomas Piketty was more eager to study the historical dynamics of wealth distribution. He used of tax data dating back to three centuries to study the ratio of wealth-income trends and their *inter se* relations. He wanted to establish the idea by saying, "The history of inequality is shaped by the way economic, social and political actors view what is just and what is not, as well as the relative power of those actors and the collective choices that result". Basically, Piketty does not believe that there are any automatic stabilizers to correct the growing destabilizing and inegalitarian forces. The most significant contribution made by Piketty is the destruction of faith in the so-called Kuznets Curve. To be very specific, the Kuznets presumption that has prevailed in 'Economics' for many decades that inequality goes up in the initial stages of development and then mercifully starts declining is found by Piketty to be limited by short range of data

Kuznets looked into, and highly misleading about historical trends when seen in the larger perspective that is provided in the analysis by Piketty. Instead it shows that the wealth-income ratio and the associated inequality was high in industrially advanced countries until about the first world war, then declined stabilised in the period 1910-70, and has been rising remarkably since then. The data yielded a 'U-shaped' curve over the course of 20th century and disapproved the underlying faith in Kuznets curve. In the issues of income inequality in recent years the emphasis has been more on that between skilled and unskilled workers, but for Piketty that is second order, as the inequality he unearths is not dominantly about inequality of skill. Pickett's argument against pro-market neo-liberal U.S. economists is that they pay too much attention to wage gaps between workers with different skill levels but have avoided a crucial question for the long run but not very relevant to understanding why the 1 per cent have pulled so far ahead – which is a dominant phenomenon from a macroeconomic point of view. Looking forward, if no policy corrections are made, he finds in the future of industrially advanced countries the looming shadow of "patrimonial capitalism" of the earlier centuries. Another valuable contribution made by Piketty is the study of relative shares of capital and labour. We know that conventional assessment of income inequality is made on the basis of incomes such as wages, salaries etc. By broadly defining capital he lumps all forms of capital (wealth) which yield income streams. After defining these, he offers a simple formula:

$$r > g$$

Where, 'r' stands for average rate of return on capital such as profits, dividends, interest, rents and 'g' stands for the rate of economic growth. His studies show that the rate of return on capital has been between 4 per cent and 5 per cent, while the growth rate has been lower, between 1 per cent and 2 per cent. It is interesting that

across the globe, except in Africa, he does not expect g to rise above 2 per cent in the coming decades. What is more, Piketty ascribes capitalism's principal destabilizing force to this relationship between capital and labour.

Interpreting a little bit elaborately, we can say that Piketty uses a rather inclusive definition of capital, to include all nonhuman tradable assets net of debt, including land and real estate, finance, intellectual property rights in the form of commercial patents and, of course, physical capital. He observes in the data that over the long span of history the rate of return (he denotes it by r) to capital in this broad sense has been larger than the rate of growth (he denotes it by g), except in the period 1910-50. In the long run (i.e. steady state) wage incomes will rise at most at the rate g and the growth of even the merit based high incomes will be limited by this g, whereas incomes from wealth will grow roughly at the rate r (barring the small drain of capitalist consumption). As long as $r > g$, income and wealth of the rich will grow faster than the typical income from work. He calls $r > g$ the central element (i.e. contradiction) of capitalist dynamics that drives inequality.

Now, going back to $r > g$, Piketty's fundamental force for divergence under capitalism, which has historical evidence and is quite striking, we like to analyse the forces that keep the rate of return to capital systematically higher than the rate of growth. In the real world situation we can, however, think of many factors which can keep r above g: for example, (a) if the wage rate is institutionally determined rather than by the forces of marginal productivity as in the standard model, and if the labour organizations decay due to social and economic forces; (b) if, even in the world of marginal productivity theory, economies of scale or endogenous growth factors offset the force of diminishing returns that tends to depress the rate of return to capital; (c) if "imperfections" in land, real estate and finance markets, which are included in

the definition of capital, jack up *r*; (d) if wealthy owners of capital through their enormous influence on the political and fiscal process can keep *r* high. This is not surprising for India (which seems valid for (c) and (d) above) where most private corporate business is family controlled. This is even more likely to be the case for the numerous rich who have not yet made it to the dollar billionaire list. We have collected more serious information from *Forbes* research group on the impact of inheritance in wealth accumulation, which can give valuable insights into the dynamics of capitalist growth in India (including the ways barriers to entry in business and the oligarchic influences on politics work). It has been observed that in 2012 of the total billionaire wealth in India about 60 per cent was derived from what they call "rent-thick" sectors (like land, real estate, construction, mines, etc). In these sectors, political allocations of scarce resources are salient, and entrepreneurial, rentier, and crony capitalism merge. Now, these sorts of important issues, we like to deal in the next section.

Inequality and Economic Growth in an Oligarchic Indian Corporate market Structure of Capitalism – Interaction between the Corporate Sectors and the State

One of the most striking features of India's growth since the 1990s has been the sharp rise in extreme wealth. Since the early 1990s, the number and wealth of India's billionaires has risen dramatically, in relation to India's own growth and in relation to other countries. India is now an outlier with respect to the size of billionaire wealth relative to the size of her economy, especially for a relatively poor country. In order to show the trends of wealth of Indian billionaires, we have used data from the annual billionaires list compiled by *Forbes*, which are publicly available on forbes.com, and based on research by *Forbes* staffs. It aims to include all sources of individual or family wealth. But, there are many caveats: it only

includes disclosed wealth, and wealthy individuals may well under-report. However, it seeks to apply a consistent methodology across countries and over time, and we believe it is of value in making comparisons. How does growth of extreme wealth compare with India's overall growth? Total billionaire wealth to gross domestic product (GDP) provides a proxy. This ratio rose from around 1 per cent in the mid-1990s to 22 per cent at the peak of the boom in 2008, and was still 10 per cent of GDP in 2012, reflecting both new entrants and increased wealth of existing billionaires. We have observed from the above mentioned data sources that India's billionaire wealth to GDP ratio in the international context for 1996 and 2012. In 1996, China and India had very low ratios. Now, among the rich countries, the United States (US) and the United Kingdom (UK) had ratios in the range of 4 per cent to 6 per cent of GDP; but Japan was significantly lower. Now, we turn to the sources of wealth of India's billionaires from two perspectives: inheritance and sector of origin. We have found an interesting pattern across countries: they find a positive association between growth and self-made billionaire wealth, but a negative one with inherited wealth. While no causality can be inferred, this is aligned with the view that self-made wealth is more likely to be associated with aggregate economic dynamism. Then in addition to self-made and inherited, *Forbes* also has a category of "inherited and growing", for billionaires who inherited their wealth but subsequently experienced substantial growth in wealth. It is impotant to note that while the largest number of Indian billionaires are "self-made", some 40% of total billionaire wealth is in the "inherited and growing" category, including, for example, Mukesh and Anil Ambani. We now like to focus the issues of sectoral sources of wealth and 'economic rents'. All of India's billionaires are linked to corporate activity. We have observed that there is an array of sectoral sources, including mining, energy, petrochemicals,

pharmaceuticals, information technology, construction, real estate and finance. Then this allows us to explore whether wealth had its origins in domains with extensive "economic rents" and links with government. By economic rent we mean a return to a factor of production in excess of what could be obtained from an alternative use in a fully competitive activity. We know that economic rents often flow from monopolistic economic power or from the need to get licenses from government. In fact, natural resources, land, and the spectrum have intrinsic economic rents, and typically high levels of state control, as do a range of activities involving government contracts. On the other hand, there are also "Schumpeterian" economic rents associated with discovery and creation of new products. Information technology revolution led products and services are often put in this category. The broader debate in recent years over whether India's capitalism is heading towards oligarchic or competitive structures is closely linked to what kind of economic rents are driving business activity. Here we use rents to refer to the former category, associated with market power, influence or preferential access to licensing. As a highly tentative exploration of patterns, we like to draw a distinction between activities in "rent-thick" sectors and "others" – even if they involve some interaction with the state. This sort of classification should be considered as a cautious of first step. This issue draws on a survey of business views on corruption by KPGM (2011), anecdotal evidence on regulatory intensity, and reports of alleged scams – "rent-*thick*": Sectors such as real estate, infrastructure, construction, mining, telecom, cement and media have been classified as "rent-thick", because of the pervasive role of the state in giving licences, reputations of illegality, or information on monopolistic practices. Cement manufacturers have allegedly been involved in a cartel for almost two decades. In 2007 the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission initiated an

investigation and a fine was eventually imposed in 2012. Seven Indian print media is deeply embroiled in the paid news scandal, and the Press Commission of India launched an investigation after the 2009 elections. However, it is notable that impressive wealth creation occurred in sectors with substantial potential for rent-extraction and rent-sharing between private and government players. We argue that this rise in the billionaire class herald enhanced business oligarchy. It has a larger significance. The corporate sector has clearly played a critical role in India's economic growth. The share of investment in GDP rose from around 25 per cent in 2000 to around 35 per cent in 2010, with a substantial rise in the share of the private corporate sector. Mody, Nath and Walton (2011) provide empirical evidence to support the view that profit behaviour of listed firms in the corporate sector – including the large business houses – is more typical of competitive behaviour than of the exercise of market power. On the other hand, the recent string of scams points to widespread existence of corruption, with anecdotal evidence suggesting that the links between the government and the business sector remain strong. India certainly has popular mobilization against corruption, but it is not at all clear that the 'state' has the capacity to manage the economic power of a rising corporate sector.

Conclusions

Our foregoing analysis guided us to argue that the interaction between the corporate sector and the state is an unavoidable feature of capitalism. In the past two to three decades this has bred both impressive business dynamism and even more impressive accumulation of extreme wealth in India which has facilitated to widen inequality despite high economic growth during first decade of present century. There is a real question as to whether an oligarchic market structure and a corruptible

state will lead to the propagation of inequality and create distortions that hurt the growth process. This is not necessary, as illustrated by the US reform experience in the first part of the last century – though the more recent US experience with the financial crisis shows that the effective regulation of capitalism continues to be a major issue. Today's India is inching towards an oligarchy where a small number of corporations, families and the 'state' control the nation's hidden wealth and high value of natural and other public resources (like allocation of Coal Blocks, Bauxite Mines for aluminum production, Iron Ore for steel production, Natural Gas and Petroleum Basins, 2-G/3-G Spectrum allocations all of which formed 'Oligopoly' market structure with both private and public participations). Public money, mostly extracted by the Government from the middle-income households, is subsidizing private profit making ventures which are nothing but "rent-thick" sectors. The culture of "Crony Capitalism" can no longer be the patrimony of an elite class. We think that the rise of India's businesses on the global stage can be consistent with a murky domestic scene. Which path India follows will have a powerful influence on growth, inequality and the nature of the state.

It has been universally accepted by most of the social scientists that Growth in output hardly guarantees growth in equality. In fact, global inequality is worse than at any time since the 19th century. We have observed the latest annual report of Oxfam which entitled as "An economy for the 99 per cent" and states that the bottom 50 per cent of the world's population has just 0.2 per cent of the world's wealth, and since 2015 the leading billionaires, six of whom are from US, together have more wealth, net wealth of $426 billion, than what the bottom 50 per cent of the world's population owns. There are 18 billionaires in Sub-Saharan Africa living alongside the 358 million people living in extreme poverty. In India today 57 billionaires control 70 per cent of its wealth. What is more,

the top 1 per cent has gained more income than the bottom 50 per cent put together during the high economic growth phase of this century - fed by mainly from revenue earned from selling real estates, higher value of consumer durables and gold, when a great economist was in the chair of Prime Minister in India. The 2016 list of Indian billionaires published by the US business magazine *Forbes* reveals that India has a total of 84 billionaires. According to the International Monetary Fund (2014), India's Gini coefficient rose to 0.51 by 2013 from 0.45 in 1990, mainly due to rising inequality between urban and rural areas as well as within rural and within urban areas. As of November 2016, India is the second most unequal economy in the world.

References:

Barro, R. J (2000), Inequality and Growth in a Panel of Countries, *Journal of Economic Growth*, Vol. 5, No. 1, pp. 5-32.

Deininger, K and L. Squire (1998), New ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth, Journal of Development Economics, Vol. 57, No. 2, pp. 259-87.

Forbes (2012): "*The World's Billionaires*", downloaded on April 2012 (http://www.forbes.com/billionaires/list/).

ILO (2013), Global Wage Report – 2012-13: Wages and Equitable Growth, Geneva.

KPMG (2011): *Corruption and Bribery Survey 2011: Impact on Economy and Business Environment,* KPMG.

Kuznets' S (1955): Economic Growth and Income Inequality, *The American Economic Review*, Vol. 45 No. 1, pp. 1-28.

Mody, Ashoka, Anusha Nath and Michael Walton (2011): "Sources of Corporate Profits in India: Business Dynamism or Advantages of Entrenchment?" in Suman Bery, Barry Bosworth and Arvind Panagariya (ed.), *India Policy Forum 2010-11 Volume 7* (New Delhi: Sage).

Piketty, Thomas (2014): *Capital in the Twenty-First Century*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

World Bank (1993): *The East Asian Miracle,* World Bank, Washington DC.

Some Challenges of Monetary Policy Formulation and Operations in India

Partha Pratim Mitra

Economic growth with price and exchange stability have been the challenges of monetary policy formulation in India. There has been considerable debate in the recent times about the appropriate policy mix in the realmof monetary policy to achieve these objectives. The issues became all the more complex in a globalised economy where there is considerable interdependence among countries in the area of production, trade and exchange rates which ultimately have an impact on the domestic economy. We would in this brief essay try to understand the implications for India of monetary policy formulation and operation in an inter-dependent global economy.

To begin with, the role of the Reserve Bank of India (RBI) in a globalizing economy needs to be put in context. Broadly speaking the RBI has been entrusted with (i) Providing credit to the Government (ii) Providing credit to Banks (iii) Providing credit to the commercial sector through Banks (iv) Managing foreign exchange reserves of the country (v) Regulating domestic Money Supply (vi) Managing exchange rate of the rupee and the oversea Balance of Payments. (vii) Price stability of these

Student: 1976-78

objectives are met through policy instruments which inter-alia include (a) Repo rate (Policy rate) (b) Cash Reserve Ratio (CRR) (c) Statutory Liquidity Ratio (SLR) (d) Open Market Operations (OMO) (e) Statutory Regulations for the Banking and Non-Banking financial sectors. These instruments have different implications depending upon the nature of integration of the real and monetary sector in India and also the integration of the Indian economy with the next of the world.

In an era when India was not all that well integrated with the global economy some of the instruments then prevailing such as CRR and SLR were in the nature of directions from the RBI. This was also an era when the role of the state was much more pervasive. As a result the RBI had to accommodate the fiscal requirements of the state in term of managing the borrowing program of the Government through use of ad-hoc treasure bills. In March 1997 a Memorandum of understanding (MOU) was signed between RBI and the Government of India Putting an end to the ad-hoc treasury bills. This MOU implied that a limit was imposed on the monetization of Government deficit which took place as the RBI had to invest in the supply treasury securities of the Government. This implied that the resultant money that such investment created could be utilized by the Government to finance its deficit. This was at a time when the economic reforms of 1991 had already begun and India was moving towards a more open economy with greater global integration. As India was integrating with the rest of world the evolvingmonetary policy framework focused on flexible monetary targeting following the recommendations of the Chakravarty Committee (1985) and the Vaghul Committee (1987) on money market reforms. This process was speeded up with the initiation of financial sector reforms (Narashimham Committee) in the early 1990s. The Process of interest rate deregulation was to a large extent completed by 1997. Similarly the

Selective Credit Controls were phased out by 1994 and the CRRs were also deemphasized. The liquidity management system was conducted largely through OMOs.

Accompanied with these measures along with the termination of automatic monetization of fiscal deficit in 1997 mentioned above, was the introduction of the ways and means advances system in 1997. With the eventual phasing out of the practice of RBI participation in primary auction of Government securities in April 2006 the RBI could conduct monetary policy operations in a market based framework.

Another major operational change was the liquidity adjustment facility (LAF) which was introduced in June 2000. The LAF became the main instrument for modulating short-term liquidity. The LAF is a monetary policy tool which allows banks to borrow money through repurchase agreements or repos. LAF is used to aid banks in adjusting the day to day mismatches in liquidity (functional liquidity deficit/surplus). Liquidity of a more durable nature is managed with CRR and the Market Stabilization Scheme (MSS). As a consequence the short-term repo rate (the rate at which banks borrow funds from the RBI against collateral) and the reverse repo rate (the rate at which banks place their funds with the RBI and receive collateral) become the main monetary policy signals.

In February 2004 the RBI also launched a Market Stabilization Scheme (MSS). Under the MSS the RBI had proposed to the Government of India (GOI) to authorize insurance of existing debt instruments such as Treasury Bills and Dated Securities upto a specific ceiling to be mutually agreed upon between RBI and GOI by way of an MOU. The bills and securities were to be issued under MSS by way of auctions conducted by RBI. These Bills and securities were to be issued both for the purpose of stabilization and sterilization due to flow of capital from abroad.

The LAF, MSS along with CRRs were to be utilized as instruments to modulate the new market based framework in monetary policy formulation and operations. They have their own challenges. Someconcerns have been raised which relate to the transmission mechanism of monetary policy instruments. There is a strong view that a reduction in the policy rate i.e. the lending rate can result in raising lending spreads and thereby causing a contraction instead of an of an expansionary effect on the economy as banks are required to keep a statutory proportion of their deposits in Government securities to meet SLR requirements. Consequent to the rate cut the deposit base of banks get reduced as depositors may not find it attractive enough to keep deposits in banks. SLR requirements and rate cut, therefore result in lower credit to investors bringing about a contradictory effect on the economy. While these issues are part of the older debate what is new is the emergence of the proposition that policy goals cannot be separated from the specifics of the monetary transmission mechanism applicable to a country. The main point that emerges is that the linkage between the policy instrument and the policy targets are affected by the institutional design, market structure, penetration of capital markets, international linkages of the domestic economy with the rest of the world and the global business cycle trends.

Some of the issues which are important to design a monetary policy revolve around short-term interest rate, liquidity management and transmission channels of policy rate decisions and institutional set up to put in place a sound liquidity management frame work.

A six member Monetary Policy Committee has recently been set up by the Government by amending the RBI Act 1934 to provide for a statutory and institutional frame work for maintaining price stability keeping in mind the objectives of growth. The MPC is entrusted with the task of fixing the repo rate (the policy rate) required to contain

inflation within a specified target level.

The liquidity management framework in India stands on the two broad pillars. Pillar 1 contains the assessment of the liquidity demand (Short term which is 4 to 6 weeks) and the independent sources of liquidity in the economy such as demand for currency (which reflects household behavior), demand for excess reserves from the banking system, cash balances of the Central Government with the RBI and the interventions of the RBI in the forex market. The fluctuations in the independent sources of liquidity create volatility which makes short-term forecasting liquidity demand difficult. The RBI's discretionary liquidity management operations which are mostly done through OMOs and changes in CRR and also by fixing limits for repos (both term and overnight) is guided by the LAF deficits/surplus.

Pillar II consists of the broad money growth which reflects the aggregate monetary resources (demand deposits with banking system + other deposits with RBI + Savings deposits of port offices (M1) + Time deposits with the banking system + Net-Bank credit to Government + Bank Credit to the Commercial Sector + Net Foreign exchange assets of the banking sector + Government's currency liabilities to the public – Net Non monetary liabilities of the Banking Sector). The interest rates are related to the broad money aggregates and empirical estimates point to the money demand remaining sensitive to the interest rate.

At the core of the operational frame work for a monetary policy is the extent to which the interest rate channel of monetary transmission is able to work. Empirical studies show that this transmission mechanism is most effective in the money markets segment of the financial market.

The interest — policy and the transmission mechanism are put to test when there is a two-way external capital flow or the stability of the economy is affected due to

inflationary expectations affecting the growth rate. In such situation the ability of the RBI to (i) effectively control the interest rate transmission mechanism (ii) to sterilize/ mange the domestic liquidity impact of net forex market interventions (iii) management of the exchange value of the rupee if an external event warrants the risk of a global recession which can dampen domestic growth prospects and raise financial stability concerns. In this context in an interdependent global economy a major event such as the hike in the US Fed rate expected to take place sometime in future could be one such event where the monetary Policy in India would be tested on the touchstone of stability of forex reserves and the exchange rate of the rupee.

We have in this brief essay only attempted to discuss some of the macro-economic concerns such as growth and price stability and the manner in which monetary policy formulation and operations are conducted to maintain them. There are other important issues such as the regulation of the financial sector, in particular the financial markets and the banking system which would have not been discussed here. These issues would require a separate discussion.

References:

1. Goyal Ashima (2011) : Monetary operating procedures : principles and the Indian process,Working paper IGIDR, Mumbai, October
2. Lahiri Amartya and Patel Urjit (2016) : Challenges of effective Monetary Policy in emerging Economies.,Working paper series, RBI, February
3. Raghuram. G. Rajan (2016) : The Independence of Central Bank At New Delhi, 03/09/2016
4. Mundra S.S (2016) : Financial Stability in a weak global environment.Address delivered at the 7th SEACEN High level Seminar, Mumbai, 22nd September.

5. Reddy Y.V. (1997) : Budget and RBI, New Directions.ASCI, Hyderabad.
6. Reddy Y.V. : India and the global Financial crisis : managing money and Finance. Orient Blackswan, New Delhi, 2009
7. Report of the Committee to review the working of the monetary system. (Dr. S. Chakravarthy Committee, RBI, 1985)
8. Report of the working group on Money Market, (N. Vaghul Committee, RBI, 1987).
9. Report of the working group on operating procedure of monetary policy.RBI, 2011
10. Report of the Expert Committee to revise and strengthen the Monetary Policy Framework, RBI, January 2014

The Role of Persuasion in Altering Consumer Demand for Abating Climate Change

Madhumati Dutta

When one looks at the consumption aspirations of middle class Kolkatans – their love for electronic goods and personal transport, their visits to the air conditioned mall to window shop (if not buy the product), their goal of buying their own new air conditioned flat and the highest ambition of possessing a car, one can understand where India is headed towards – an enormous increase in per capita consumption of products that cause enormous emissions of carbon.

We are waiting for technology and prices to make fossil fuels extinct, to create a world where the sun is king. In such a world, countries like India, with its enormous supplies of sunlight, may have a huge comparative advantage. But in the meantime, while we wait, the presently available technological fixes are not, on their own, enough. A two fold rise in energy efficiency, which is in itself improbable, will still raise the negative environmental impact of economic activity (Rosa and Dietz, 2012; Hubacek, Guan and Barua, 2007). Moreover, it is also being thought that economic incentives and disincentives may not be enough – partly because there

Student: 1978-80

are barriers to price change (such as changes in the price of fossil fuels) and partly because demand may not be so elastic with respect to these measures – in other words, the consumer always has the option to emit more as long as she pays the price. For example, a regulatory-cum-economic fix that would be all encompassing is emission quotas. Just as one imposes quotas on emissions by corporations, so also can one impose a quota on individual consumers or households. The quota would work in the following manner: each citizen is provided a card in which the quota is keyed in, and when a purchase is made, the implied emissions are deducted. If the quota is exceeded, the consumer pays for the excess emissions. While this appears to be an ideal solution, it would be politically and socially impossible to implement in India. In other words, there are social, economic and political barriers to technological, economic or even regulatory solutions.

I am not saying that we do not need these conventional solutions. But they have to be integrated with what I call persuasive policies for the alteration of demand, where 'alteration' constituteseither (a) shifting to substitutes that cause less emissions or (b) decreasing (or stopping the increase of) consumption per se.

It has been seen (for example by Alfredsson in his study (2004) of Swedish households) that adopting greener substitutes does not solve the problem, and one reason for this is the 'rebound effect', which is the increase in the consumption of other products or the greater consumption of the same product, which now has a greener avatar. For example, a shift to CFL or LED lights may make us more complacent about keeping the lights on for longer hours.

Our policies should therefore include the actual reduction of consumption. But is that possible? It may be, if we recognize that consumption decisions are not always personal – they may be caused by the social or even built environment (Rajan, 2006). 'Happiness Studies',

which sometimes go against the basic tenets of economics, indicate that wealth is not an absolute concept – it is measured relatively. If the wealth of one individual goes up, the relative wealth of others goes down, so that it becomes a zero-sum game. On the other hand, if public resources increase, everyone's wealth increases. Hence if the State focuses more on enhancing public resources rather than individual incomes, and it is ensured that this enhancement causes little or less emissions, there would be a net increase in well being as well as lower level of emissions. These studies have also found that after a point, more leisure time rather than *products* enhance well-being. The objective, thus, is not to deny the good life, but to change the *concept* of the good life. We need to question what our 'favourite things' are - whether they are 'raindrops and roses', or 'ownership houses and cars on bank loans'. To give an example – most shopping malls in Kolkata are enclosed and air-conditioned – but Charles Correa's City Centre has an open plan. Does this make it less popular?

Let me discuss a few individual demand alteration policies that are neither technological, nor economic, nor even regulatory – in fact they are largely gently coercive - that we can pursue to achieve the alteration of consumption. These policies need not only address the consumer - they may be directed at the producer but with the consumer in mind, and they should keep in mind carbon emissions during use and disposal, in addition to production of the product.

First, one can discourage the use of the more harmful product and, at the same time, promote/improve the alternative. For example, to discourage the use of low occupancy private transport such as cars or motorbikes and encourage the use of public transport (which causes less emissions per person per mile traversed), bicycles and walking, one can improve the quality and quantity of public transport, and build a transport infrastructure

that encourages multi-modalism and has pedestrian walkways and bicycle paths, and not build flyovers, highways or parking facilities. Similarly, one can facilitate the use of solar energy or windmills – especially in areas not connected to the coal-based electricity grid. However, some of the harmful trends that have been identified for India (Dutta, 2015), such as building *pucca* houses, using electricity for lighting and purchasing home appliances – cannot be reversed. We cannot go back to mud houses, dimly lit with kerosene lamps. In these cases the substitution has to occur *within* a narrower definition of the product.

Second, one can address*access*(to the alternative versus the moreharmful product). For example, a dual policy frame of improving access to LPG (for cooking) in rural areas while simultaneously creating a social monitoring network that disapproves of felling trees for fuelwood would have an enormous impact on carbon emissions. There is significant scope for improving access to the metro or suburban train stations. Bicycle stands with rentable bicycles would encourage the use of this eco-friendly mode of transport. Fuel stations with LPG would help vehicle owners shift from petrol or diesel to LPG. In this context, one may question the policy of increasing access to coal-based electricity, as this is by far the most carbon emitting amongst the several sources of energy.

Third, one can reduce the *need* for the product – in other words, actually reduce the use of the product.For example, the need for ACs can be reduced through the promotion of well-designed houses with good insulation, ventilation, orientation and shape. The need to travel can be reduced with the help of mixed land use planning, or by creating possibilities of working at home and using the internet for communication.

These policies need to be accompanied by an elaborate program of awareness that includes education, information, dissemination and motivation. The

straightforward option is to educate consumers regarding the impact of their consumption on climate change, and appeal to them to recognize their responsibilities. But there is always the danger of free riding due to non-absorption (when the consumer does not understand what has been said) or cognitive dissonance (when the consumer agrees with the logic but does not actually take any action). An alternative method, therefore, might be to point out the co-benefits like better health, lower costs and less time spent on commuting or maintaining the house. Education is best done at a young age, through schools and the media. One can make use of celebrities, advertising, conformity pressures, authority influences and expert opinions. It takes time, but there have been major shifts in societal attitudes in human history, and if the implications are understood well, global warming is a big enough threat to warrant social change. Even if initially the change is slow, it can be expected to snowball over time. A practical instance for awareness creation is on green building and how to do it (and here the recipients would be the producers as well the consumers), whilst a more complex one is explaining the emotional and behavioural associations that go with the possession of goods like cars or motorbikes, and the impact of marketing on these.

A crucial component of the knowledge structure would be labeling, which on its own may have no effect, but would be very useful in accompaniment with greater awareness. The emissions implications may be marked on the product, and if buyers develop the practice of avoiding goods that cause greater harm to the climate, producers will gradually stop producing them.

I end with two final thoughts. First, we cannot talk about changing demand unless we assume that the consumer can prevail upon the producer. But does demand determine supply or the other way around? If the relationship is mutual and each determines the other,

then policy can aim at convincing the buyers; the sellers will finally follow suit. Or, to be doubly sure that they do, there may be a need to regulate them – hence we may require regulations on buildings, transport, appliances and so on, combined with labeling. Often, the user cannot control the energy required once the product or infrastructure (within which the product is used) is built. Here too, the seller has to be addressed directly. Perhaps the best policy would be consider each product individually, evaluate the buyer-seller nexus and tailor policy accordingly.

Second, it is commonly believed that environmental jurisprudence is the State's responsibility – and it is, but the State will not do anything unless its people demand this. The State promotes energy intensive living – air-conditioned buses and metro carriages, air-conditioned airports, hospitals and offices - that are built is such a way that they cannot do without air conditioning. The State encourages the purchase of cars, motorbikes and apartments with easy loans and car friendly infrastructure. The State, with its short run objectives,will have little incentive to take on policies to abate global warming, if these policies are unpopular. Hence action for climate abatement has to start at the very bottom – it has to be a people's movement. And by far the most major need of the day is – simply - *awareness* – if we are entirely aware of the carbon that we do emit and its implications, as well as how we can emit less and what benefits we will get from that – we can get our representatives in the government to do the right thing.

References:

1. Alfredsson, E C (2004), ''Green' Consumption – No Solution for Climate Change', Energy 29, Elsevier, 513 – 524.
2. Dutta, M (2015), 'Consumer Behaviour and Carbon Emissions, Lessons in Policy', Lecture Archives, Nehru Memorial Museum and Library, Delivered November 6, New Delhi.
3. Hubacek, K, D Guan and A Barua (2007), 'Changing Lifestyles and Consumption Patterns in Developing Countries: A Scenario Analysis for China and India', Futures, Vol. 39 (9), 1084 -96.
4. Rajan, S C (2006), 'Climate Change Dilemma: Technology, Social Change or Both? An Examination of Long Term Transport Policy Choices in the US', Energy Policy 34, 664 – 679.
5. Rosa, E A and T Dietz (2012), 'Human Drivers of National Greenhouse-Gas Emissions', Nature Climate Change 2, 581 – 586.

Database of Indian Economy – Some Historical Perspectives

Mrinal Kumar Dasgupta

Introduction:

The requirement of statistical data was felt by the planners, economists and policy makers long ago. In India, during the post independent period when planning commission was framed to formulate the objective of planned economic development, the rigorous process of exploring database of Indian economy was started to examine the usefulness of sample surveys and to increase the scope of those surveys for integrating them with the national official statistical system for collection of data. For the purpose various agencies started to compile database since the 1950's. But very concerted efforts were taking place to publish database during 1970's. A seminar on database of Indian Economy was held from May 19 to 21, 1972 under the auspices of the Indian Econometric Society. In the seminar a large number of areas viz. agriculture, industry exports and imports, savings and investment and national income were covered for compiling data base. The experts who participated in the seminar examined the existing gaps and defects in official statistics and make concrete suggestions for their improvement. In the same year another very important publication was made on Indian official statistical

Student: 1962-64

systems. The book written by M.R. Saluja surveyed the various types of official statistics, their sources, coverage, concepts and definitions and their comparability. The Official Agencies adopted different procedures for collection, compilation and publication of official statistics. In the methodology several gaps and shortcomings were also pointed out. The book actually thus surveyed the various kinds of statistics, the concepts and definitions and the existing procedures and several agencies were involved in the above mentioned procedures for collection, compilation and publication. The short comings and the gaps in the data have been mentioned after meticulous examination.

Review Of The Contents Of The Publications:

The contents of the book by Saluja are divided into twelve chapters. In the first chapter Indian and International statistical systems are included in the database. Methodological studies have been conducted to get reliable and up to date statistics for planning the economic advancement of a country. For the purpose an analytical study has been made on functions of statistical system, types of statistical system, Indian statistical system including the structure of the system at that point of time, statistical organization at the centre and that at the states non-governmental statistical organization, and international statistical systems. In the second chapter of the book population statistics have been taken into consideration. In this study details of the 1961 census and the 1971 census were taken for population projection and database of several vital statistics viz. birth, death, mortality rates etc. was framed. In the next two chapters Agricultural statistics and Industrial statistics respectively were taken into consideration. In agricultural statistics database on various aspects of agro-based information viz. land utilization, periodic estimates of area and yield of different crops, animal husbandry, fishery, forestry and

other miscellaneous statistics related to agriculture have been prepared. Similarly in industrial statistics database on Indian manufacturers, production of selected industries of India, mining, unorganized small sectors and cottage industry were completed. In chapters V and VI two most important items viz. Labour statistics and Trade and Transport statistics were taken into consideration. For labour statistics data for employment, unemployment and underemployment wages and earnings were collected. Then data for technical manpower, trade unions etc. were taken to prepare a broad based database on labour statistics. For Trade statistics data on foreign trade, import and export licensing statistics, coastal and inland trade including rail and river borne trade, balance of payments etc. were compiled. For transport statistics, database were tried to be framed for railways, air transport, road transport, port and shipping transport etc.

In the next two chapters price statistics and index numbers were taken to make availability of data on Wholesale prices, retail prices, farm prices, etc. in case of index numbers selection of items and collection of data are very important. For collection of data we are to depend either on the published sources and obtain periodic reports from leading dealers and manufacturers or others who have with them the required information.

Chapter IX presents a very important subject that is National Accounts. In order to prepare these accounts the details regarding the estimates of national income, savings, capital formation, consumers' expenditures etc. are required. The CSO started preparing various systems of the accounts. These accounts were prepared at the current prices of the point of time. These were published in the name of estimates of National product 1960-61 to 1968-69. Computation of all works related to national income accounts from 1960-61 to 1969-70 was done by CSO.

In the last three chapters of the book the Financial

Statistics, Educational and Housing Statistics, and the setting up of the National Survey Organisation were considered for database of Indian economy.

Methodological Study For Database:

A thorough methodological study was made in the seminars conducted by the Indian Econometric society. We have already mentioned that for compiling database of Indian Economy a seminar on June 1972 was held at Gokhale Institute of Politics and Economics and a volume on the basis of the proceedings of the seminar was published, the editor being profC.R.Rao. The volume named "Database of Indian Economy Vol I" contains all backgrounds and supporting papers together with discussions and recommendations.

Then to review the role of the National Sample Survey and the nature and quality of the data collected in the various rounds of the survey another seminar under the auspices of Indian Econometric Society was held between 9th and 11th June 1973 at the same venue. The proceedings of the seminar titled "Database of Indian Economy Vol II" as published on June, 1975 edited by V.M.Dandekar and P.Venkatramaiah.

In this volume the following five areas have been taken for consideration to compile database:

i. National Income and Expenditure,
ii. Agriculture,
iii. Industry,
iv. Population and Labour Force,
v. Education and Housing.

After independence when planned economic development were envisaged for rapid development to bring social justice, The National Income Committee appointed in 1949 found large gaps in the methodology of collecting data for planning and for estimation of national income. To remove such impediments the Directorate of National Sample Survey was established

in July 1950. Its objectives were to frame a scheme for data collection in an integrated and coordinated manner. However, the National Survey work was under the consideration of the Government of India from time to time. In the process the Government set up an organization called the National Sample Survey Organisation in the department of statistics, cabinet secretariat in terms of recommendation of a committee consisting three members: Shri Sivaraman, Prof. V.M.Dandekar and Prof. Raghuraj Bahadur in 1970. The NSSO was transferred to the ministry of planning in 1973. The states started participating in the NSS programme on matching basis since the Eigth Round (1954-55). Central Statistical Organisation (CSO) after getting recommendations from the NSS programme advisory committee took the charge of framing sample design, schedule of enquiry, tabulation programme etc. All the technical works relating to the sampling designs and other matters namely drafting schedules, processing and tabulation of data, training programmes, report writing etc. were done by Indian Statistical Institute upto May 1972. After that the task was taken up by the Survey Design and Research Division and Data Processing Division of the NSSO.

The NSS used to collect data on demographic particulars of individuals viz. marriage, births, deaths and other allied data including fertility history of married women on regular basis through primary workers known as investigator. Thus the organization for collecting data was represented by the investigator at the lowest level who were supervised by Assistant Superintendent under Assistant Director. At the helm there was a director who was assisted by a deputy director. Thus the socioeconomic wing was formed to conduct an integrated multisubject survey.

The Socio Economic wing which was framed during the beginning of the 1970's started collecting data on

various subjects at that point of time and also planned for a future activities to undertake surveys. These include consumer expenditure, population, births and deaths, employment and unemployment, retail prices, etc. Besides these other important subjects are often considered in a particular round or rounds on ad-hoc basis. As for example, land holdings, household manufacturing, trading and transport enterprises, capital formation, family planning, real estates etc. are covered in the process. Thus the modus operandi of database on these subjects have been discussed in the various rounds of N.S.S. These rounds also exhibit data for specified population groups namely agricultural rural labour, working class and middle class families and weaker sections of the rural population.

The methodology of data computation and their estimates in different round of NSS was done by a large number of economists and statisticians in the initial stage. To name a few for national income and expenditure are G.K.Mathur, Moni Mukherjee, AsokRudra, T.P.Abraham, N.Bhattacharya. For agriculture we may mention the name of R.P.Saha, M.T.R Sharma, S.K.Pillai. For the industry initially S.K.Sanyal, V.B.Savdasia, G.S.Murty and a few others worked for. For population some very good works were done by KumudiniDandekar, N.Rath, S.P.Mishra, S.Balakrishna. Finally A.B.Kamat and K.Kumar did some works on Education and Housing.

Role Of Government In Data Compilation:

Both the Central and State Government require important information for planning and policy formulation. Therefore, it was felt that storming of secondary data would become very important due to fast changing structure of the economy, the greater deregulation of the ecomomy, changes in the tastes and habits of the consumers etc. Realising the importance of secondary data – its usage and source Government of India constructed

a separate ministry called "Minsitry of Statistics and Programme Implementation". The statistical wing of the ministry played a vital role for planning integrated development of the statistical system in the country. This wing further acts from various types of statistical work which help in the following ways:

a) To identify gaps in data availability or duplication of statistical work. In this process coordination of statistical work in respect on Departments of Government of India and the state statistical Bureau is done. The wing also suggests remedial measures as and when required.
b) To maintain norms and standards in the statistical field proper concepts and definitions are required to be taken in a rigorous manner. Further methodology of data collection and data processing should be taken properly.
c) Index of industrial production (11P) every month should be compiled and released. Annual survey of Industries (ASI) should regularly be conducted.
d) For Environment statistics methodology concepts and preparation of National Resource Accounts for India should be developed speedily.
e) All the components of National Income Accounts (annual estimates of national income, gross and net domestic product, final consumption, expenditure, capital formation and capital stocks, savings etc.) should be prepared and published regularly.
f) All India economic census work and follow up sample surveys should be done in regular basis. Also nationwide sample surveys should be conducted on various socio economic aspects viz. employment, consumer expenditure and many other activities on various social sectors including housing, education, health, family welfare and many others.
g) National Sample Organisation and cultural

statistical organization undertake the task of framing database for the follow up surveys on census and survey method.
h) For compilation and release monthly Consumer Price Index Numbers for urban non-manual employees the statistical wing of the relevant ministry acts as a stimulator.

In the whole process of data compilation the Government uses several source agencies. Some of them are Registrar General of India, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Reserve Bank of India, Labour Bureau etc. The major types of data which are used by various sections of population can be grouped as a) population demographic, Migration etc. b) National Income, Savings and Investment, c) Production and Consumption, d) Employment and Prices, e) International Trade, f) Money & Banking, g) Budgetary Transactions.

Census of India is the main source which provides information on Demography. Actually population characteristics of various regions (city, town, village, ward level) and various groups (age, sex, caste, religion etc.) are included in the census. Ministry of statistics and Programme Implementation through National Sample Survey Organisation (NSSO) also provides the population estimates. Population census is conducted every 10 years, where as NSSO provides population data for almost every year.

For National Income Saving and Investment Central Statistical Organisation (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation provides necessary data, through its publication 'National Accounts Statistics'. Every year CSO also provides the gross and Net Domestic Products for all the states.

In the production sector in agricultural field to study the changes in cropping pattern, trend growth, food grains availability etc. information are collected from the publication "Agriculture at a Glance". In the field of

industry Annual Survey of Industries has traditionally been (and still is) one of the most important sources of registered manufacturing sector data. NSSO also provide the other categories of industry which are not covered by ASI. ASI further provides data for disaggregated industry specific details of production investment, employment and cost.

Regarding consumption data CSO and NSSO are the major sources. On a yearly basis CSO provides the household consumption expenditures on major items at the national level, where as at state level those are provided by NSSO. The NSSO data for the major rounds (large sample) is available every 5 years. As it is supplied to the state level with break up with rural and urban region, its importance is felt with the progress of time.

For employment and prices the database is framed from the following sources: i) Census, ii) Employment Exchange, iii) NSSO (the organization collects data through sample surveys based on scientific technique of stratified random sampling both in rural and urban areas), iv) The Director General of Employment and Training (DGET), v) Index number of wholesale prices, vi) Consumer price index for agricultural labours and rural labours, vii) Consumer price index for urban non-manual employees, viii) Consumer price index for industrial workers.

For International Trade the main source of data is Ministry of Commerce. The detailed international trade data by commodity or country on monthly basis are received from the above source.

All data relating to Money and Banking are obtained from Reserve Bank of India (RBI). The available data include interest rates, credit growth, money supply, bank transactions, exchange rates, foreign exchange reserves etc. RBI further provides information for state budgets through its publication "Report on State Finances". But the budgetary data for centre are supplied by the Ministry

of Finance.

The usages of data for the above mentioned sections can be summarized thus : For population statistics some of the important usages of these data are –

a) Interpolation and extrapolation methods are used for computing population for a particular year;
b) Relevant data can be used to arrive at various development indicators for cities, towns, etc.
c) Forecasting population for the future;
d) For obtaining population distribution by social groups, religion, educational, consumption brackets etc. these data are used.

In case of National Income Savings and Investment the data set supplied by CSO and others can be used to understand the National/State/District level economy. Further for the trend analysis and also to predict the economy for the future years with rural/urban split, the CSO data are utilized. Again those are used to analyse the performance of states and districts.

For production and consumption sectors the data sets from ASI, CSO and NSSO can be used (i) to identify the consumption pattern of household on various food and non-food items; (ii) to understand the spending behavior of households on different parameters like consumption class and type of households, place of residence etc; (iii) they are used for developing CPI weights.

The data statistics for employment and unemployment from NSSO, DGET and census are used (i) to analyse the employment in the various sectors of the economy; (ii) to analyse the employment output ratios of various sectors of the economy; (iii) to analyse the wage rate of various sectors of the economy; (iv) to analyse the unemployment rate in the economy; (v) to analyse the age distribution of workers, their education level, sector of the work etc.

In the price sector the Wholesale Price Index (WPI) is used to monitor price movement of over 500 commodities on regular basis. WPI is also used for formulating

monetary policy through the headline inflation number. But the consumer price index (CPI) data are used to monitor the inflation rate at the state levels etc. Secondly, the CPI is used in computing the annual increments in the wage rate after the calculation of inflation.

Data And Development Analysis:

Primarily development analysis concerns with data and then it deals with tools. In case of Indian economy the development analysis deals with household survey data with survey design and it conduct surveys in regular and continuing process. Thus survey data are used in development as well as in policy framework. Further in the development analysis some attention is required to the quality of country data, looking beyond national incomes to demographic, trade, and other measures. For development analysis with such data in LDC's like India econometric estimation is made in stratified samples using ordinary least square (OLS) method. In LDC's often quality data are not obtained, in such cases problem arises in estimation, designing and general measurement issues. But such survey data are not always of lower quality, and then in the general measurement of GDP these data are used. For data collection in a number of LDC's living standard surveys (LSS) have a rotating structure. One of the most impressive achievements of the LSS is its demonstration that microcomputer technology can be used effectively in collecting data for development economics in LDC's. In the last ten to fifteen years there has been a great expansion in the use of survey data in development economics. Some econometric tools are used for estimation and other quantification in development analysis and policies emphasizing the use of survey data. Often some familiar econometric techniques illustrating their uses in the development literature, discussing methods for strengthening the robustness of inference, and trying to identify common pitfalls and difficulties are

used. Further in the analysis of development questions time series techniques are taken into consideration. The time series literature is very large and is rapidly growing. It is therefore, required to use time series technique in case of survey data with proper rigour. Finally, a non-parametric analysis in case of development index for estimating density functions, regression functions and the derivatives of regression functions are taken into consideration although non-parametric analysis typically requires a great deal of data and the survey data may not be compatible to a non-parametric treatment. Now question may arise why development economics should be interested in household survey data. We know that the ultimate objective of economic development is welfare of individuals and thus the data from household surveys are the measure of that goal. In writing of survey data in policy and development Angus Deaton of Princeton University mentioned "Although GDP and GNP per capita are often used as summary measures of welfare in many countries they are derived with the help of household survey data, and even when this is not the case and consumption is derived as a residual, survey data provide a cross check, and in many cases will provide higher quality of data. But even in their best, national income measures can tell us only a very limited amount about distributional issues, about allocation by region, by ethnic group, by poor versus rich, or by rural versus urban. As economic development expands opportunities, we want to know who is benefiting and who (if any one) is losing. Indeed, as Stigler (1954) has documented, the first explorations of household budgets were carried out by social activists in the late eighteenth and early nineteenth century, and their object to inform (and shock) policy makers and to lay the basis for reform. Counting the poor, documenting their living standard (including nutritional standards) and measuring inequality remain important uses of household survey data by development

economists.

Household survey data also yield direct measures of the effects of policy changes, whether these operate through price changes or through changes in the provision of public services. They can, therefore provide the background information for informed discussion of possible changes in policy. In particular quantities produced and consumed provide a local approximation to the derivative of welfare with respect to Price." [1]

Thus we have understood the role of survey data in development economics. Actually survey data frequently tell us who uses the public goods, and how much, something that is frequently of direct concern, even where we do not have estimates of how much the households value the services. Further most household surveys in both developed and developing countries, drew new households for each new survey, so that it is generally not possible to track any given household through successive surveys. For analyzing and estimating the development index rapid data entry programs are taken so that the teams would produce preliminary survey reports take a few months only after learning the last household. Thus in case of development economics database is prepared for using econometrics tools for estimation and forecasting.

Conclusion:

In our analysis we have found database of Indian Economy has been prepared for various fields including agriculture, industry, exports and imports, savings investment, national income and last but not the least development economics. The authors trying to find the sources of data always endeavor to fill the gaps and defects in official statistics and make concrete suggestions for their improvement. Database also includes the information on social sectors viz. education health, level of living etc. and regarding poverty, inequality etc. data

for development analysis using econometric tools estimates and forecasts their trends. In the process of estimation various types of variables as for example explanatory and dependent variables, dummy variables (which are commonly taken as explanatory variables but in intricate cases dummy dependent variables are used. Rigorous econometric tool are applied to solve the specific problems of economic development.

There are many less Developed countries (LDC's) including India which collect surveys data of some sort at sometime, and many LDC's have multiple surveys that are run on a regular and continuing basis, many of which meet the highest international standards of data collection, editing and publishing results. In case of social sectors, however, very good work was done by Operation Research Group (ORG) from mid-sixties to mid nineteens. Some sorts of survey data viz data on location and on environment were collected and compiled for estimation, forecasting and in general for economic development. In their surveys microfindings were done. They collected and retained data on the environment as for example on the size of village, whether it has a school and so on. Such surveys are sometimes carried out on an annual basis. But more usually they are done at intervals, mainly quinquennially. Surveys are done at such intervals because in India the patterns of consumption and levels of living as well as poverty are hardly changed rapidly. For framing database households are chosen at random with a wide range of design. The surveys are typically nationally representative with each representative with each remaining in the field for a year though in some cases they last for a period shorter than a year. Finally, the times are required to be changed in framing database when many indicators for social sector development viz additional health, education, supply of drinking water, agricultural extension etc are provided.

References:

1. Ahluwalia, M.S. (1976) 'Inequality, poverty, and development', *Journal of Development Economics*, 3:307-342.
2. Anand, S. and Ravi Kanbur, S.M. (1993) 'Inequality and development: a critique', J*ournal of Development Economics*, 41:19-44.
3. Angrist, J.D. (1990) 'Lifetime earnings and the Vietnam era draft lottery: evidence from social security administrative records', *American Economic Review*, 80:313-336.
4. Arellano, M. and Bond, S. (1991) 'Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations', *Review of Economic Studies*, 58:277-297.
5. Ashenfelter, O., Deaton, A. and Solon, G. (1986) 'Collecting panel data in developing countries: does it make sense?' *LSMS Working Paper 23*, The World Bank, Washington, D.C.
6. Behrman, J.R. and Deolalikar, A.B. (1988) 'Health and nutrition', Chapter 14 in H. Chenery, and T.N. Srinivasan, eds., *Handbook of Development Economics*, 1:631-711.
7. Benefo, K. and Schultz, T.P. (1993) 'Determinants of fertility and child mortality in Cote d'Ivoire and Ghana', *New Haven*. Yale University, processed (March)
8. Bhalla, S.S. and Roy, P. (1988) 'Mis-specification in farm productivity analysis: the role of land quality', *Oxford Economic Papers*, 40:55-73.
9. Bouis, H.E. (1994) 'The effect of income on demand for food in poor countries: are our databases giving us reliable estimates?' *Journal of Development Economics*.
10. Casley, D.J. and Lury, D.A. (1981) *Data collection in developing countries*, Oxford: Clarendon.
11. Deaton, A.S. (1985) 'Panel data from time series of cross-sections', *Journal of Econometrics*, 30:109-126.
12. Deaton, Angus (1993) 'Data and Econometric tools for development analysis', Princeton University.
13. Mahalanobis, P.C. (1944) 'On large scale sample surveys', *Philosophical Transactions of the Royal Society*, Series B, 231:329-451.
14. Mahalanobis, P.C. (1946) 'Recent experiments in statistical sampling in the Indian Statistical Institute', *Journal of the Royal Statistical Society*, 109:325-370.
15. Saluja, M.R. (1973) 'Indian Official Statistical Systems'
16. Srinivasan, T.N. (1994) 'Database for development analysis: an overview', *Journal of Development Economics*.
17. Stigler, G.J. (1954) 'The early history of empirical studies of consumer behavior', Journal of Political Economy, 42:95-113.
18. *Database of Indian Economy* (1973) Vol I edited by C.R.Rao – Statistical Publication Society
    (1975) Vol II edited by V.M. Dandekar & P. Venkatramaiah – Statistical Publication Society.

The most damaging signal of the failure of governance mechanism is a very low ratio of actual punishments to total number of proven cases of misconduct (call this ratio H). One may agree that politically pampered corrupt acts do not differentiate among nationalities and where there is scope politicians universally indulge in corrupt practices. Democracy does put in some institutional constraints against corruption as opposed to political systems characterized by quick turnover of rulers, thanks to military dictatorship. Yet, our legal system and coalitional politics make sure that we shall have abysmally low value of H.

In our society it is not enough that faces are smeared with black as a consequence of public outcry against corrupt acts because same and self respect are two virtues that have already left us, possibly for good. People have to be punished severely and quickly. It is the high value of H we should care for.

Sugata Marjit (1978-80)
Free Market and Corruption,
Arthaniti Katha, 2010, pp. 36-37

In Support of Democracy

Priyanthi Bagchi

Democracy is "a system of Government in which the people of a state or polity are involved in making decisions about its affairs, typically by voting, to elect representatives to a parliament or similar assembly" as defined by the Oxford English Dictionary.

The decisions that we take freely endow our actions with moral values, for better or for worse. Outside the realm of personal responsibility, there is no good or evil. Personal freedom is a pre-requisite for morality.

Only in a democratic, free market society human beings can preserve their dignity. To defend individual freedom is to protect human dignity. And protecting individual freedom requires respect for private property and the free market. Without these two social institutions, any attempt to build a more humane society is doomed to fail.

Dignity is a defining characteristic attributed to living human beings as such. However Dignity is not a descriptive concept. To say that all human beings have certain biological features common to the species *Homo sapiens*. Rather the concept of dignity is ascriptive one. It expresses and attributes a positive value judgement. I believe it is only when human rights are constitutionally established and effectively implemented democracy can be theoretically and practically justified as a political

Student: 2013-15

means to guarantee human dignity.

Now, although democracy may not always be the cause of initial economic progress, it seems to be one consequence of that progress. The correlation between a democratic government and economic growth is certainly evident. We have the famous Yew's line of reasoning, where we observe rapid growth in much of Africa, Asia and Latin America from 1960 – 1990, during which time these regions were primarily under the rule of totalitarian dictators. We may see correlation between totalitarian rule and economic growth in some situations, but "dictators are rarely so benevolent" and often use the political system to fulfil their own interests, rather than focussing their efforts on the advancement of their kingdom.

I believe, ceteris paribus, all other things held constant, economic growth and democracy perpetuate each other. So, once a strong trend of growth or of democracy is established, I guess the economy is on the right track. A good totalitarian dictator probably won't lead to the road of democracy, but with benevolent policy making he or she could get the economy into a growth spurt, from which through the people and totalitarian government working together it will be easier for the economy to transit to a more democratic system.

Democracy is very much responsible and important over the development of a nation. In a democratic country, the citizens are free to express their views and opinions on decisions taken by the Government and this makes the Government take more responsible decisions and they go with the majority of people. I think democracy by itself can achieve some form of progress in a state governed by dictatorship by treating residents over whom the state claims dominion with equal concern and equal respect – a very egalitarian defence. It is some kind of development to the extent to which, and only to that extent, dignity of the majority is guaranteed.

Democracy enhances the dignity of citizens. This

means that in a democracy, every person irrespective of his caste, creed, colour, gender has an important role to play in the formation of the government. In a Democracy the poor and the least educated enjoy the same rights as the rich and the educated. Hence we can say that Democracy enhances the dignity of the citizens. Recognition of the principle of equality becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally. Democracy in India has strengthened the claims of the disadvantaged and the discriminated castes for equal status and equal opportunity. There are instances still of caste based inequalities and atrocities, but these lack the legal and moral foundations. Perhaps it is the recognition that makes the ordinary citizens value their democratic rights. A public expression of dissatisfaction with democracy shows the success of the democratic project.

The dignity and freedom of the individual is well preserved in a democracy. It is natural that every individual wants respect from their fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect.

Respect and freedom are the basis of democracy. A patriarchal society is that what dominates our country where women still have to struggle for equal treatment.In modern democracies the laws have ensured that women are treated equally in the society. In a non-democratic set up, this is not possible as the principle of individual freedom and dignity is not a legal or a moral force.

In India caste inequalities is another problem that the fibre of democracy faces. Atrocities and discriminations against certain castes still continue in India. The Indian government is taking all steps to set this right. This is possible in a democratic setup, as the laws of the society are against inequality of caste. Many reservation policies are in force in India, to uplift the people of the lower castes.

As people enjoy the benefit of democracy they want to make democracy even better. In a democracy most individuals today believe that their vote makes a difference to the way the Government is run and to their own self interest.

Respect for human dignity implies commitment to creating conditions under which individuals can develop a sense of self-worth and security. True dignity comes with an assurance of one's ability to rise to the challenges of the human situation. Such assurance is unlikely to be fostered in people who have to live with the threat of violence and injustice, with bad governance and instability or with poverty and disease. Eradicating these threats must be the aim of those who recognize the sanctity of human dignity and of those who strive to promote human development. Development as growth, advancement and the realization of potential depends on available resources—and no resource is more potent than people empowered by confidence in their value as human beings.

Human development encompasses all aspects of human existence. It is generally accepted that its scope includes political and social rights as well as economic ones—but the different rights are not always given the same weight. For example, some people still claim that humanitarian aid and economic assistance cannot wait for political and social progress. This insidious idea creates dissonance between complementary requirements. If the people that aid targets are not empowered, it cannot achieve more than a very limited, very short-term alleviation of problems rooted in long-standing social and political ills. After all, human development is not intended to produce impotent objects of charity.

At this time when the world is preoccupied with the menace of terrorism, it is worth considering that people who feel deprived of control over their lives— necessary for a dignified life—are liable to search for fulfilment along the path of violence. Merely providing them with a certain

material sufficiency is not enough to win them over to peace and unity. Their potential for human development has to be realized and their human dignity respected so that they can gain the skills and confidence to build a world strong and prosperous in harmonious diversity.

Democracy promotes dignity and freedom of an individual in the following manner. It recognises the passion of respect and freedom of the people. Earlier, most societies across the world disrespected women. Long struggles by women have made people realise the importance of respect and equal treatment in a democracy. It has helped the disadvantaged and discriminated castes of the society by providing them with equal status and opportunity. Although there may be many instances of caste-based inequalities and atrocities, these lack the moral and legal foundations. It transforms people from the status of being subjects to being citizens that have rights and duties.

The Second Amlan Datta Memorial Lecture, 2016

Democracy, Dignity, and Development

Pranab Bardhan

Beyond the classroom

Let me start by reminiscing about Amlan Datta (Amlan *da* as I used to call him). Amlanda was a teacher of mine in Calcutta University. He taught a course on Russian and Japanese economic development. But my acquaintance and familiarity with Amlan *da* go back several years, long before he became my teacher. For quite some years he was already a close friend and mentor.

I graduated from Hindu School, and went to Presidency College just across the street. In those days in Presidency College, in the circles where I moved around, there was a lot of discussion about politics and many of my friends were leftists. Very soon I found out that they had identified what you may call 'an enemy of the people', somebody they intensely hated. I tried to find out who this person was, and I found out his name was Amlan Datta. It immediately generated interest and curiosity in me. I sometimes have a tendency to go against the current, even though otherwise I often believed in the causes my leftist friends espoused. I wanted to find out what was it that attracted so much (negative) excitement in them. So then I was told there was this book which had recently

---

Student: 1956-58

come out at that time, titled *For Democracy*, and the impression that I got from my leftist friends was that this was a big obstacle on the way to the Great Proletarian Revolution in India. So I immediately went out to a College Street bookstore and bought it. It was a very short book, which took me only a day or two to finish. What surprised me was that I did not find the book particularly exciting, nor did I find anything in the book highly objectionable. So something must be wrong with me, I thought. I re-read it shortly after, and, to me, Amlan Datta came across as a familiar social democrat. But then I realized, and this I have always noticed since then, all over the world leftists, particularly communists, regard social democrats as their arch enemies, perhaps because they used to be rivals in getting the attention of the working classes. Also, there was a lot of criticism in the book of Stalinism. That obviously angered many of the leftists, who in those days were mainly Stalinists. I for one, in spite of all my leftist sympathies, was never very fond of Stalinism.

One of the rites of passage in entering college was to start going to the College Street Coffee House, and Amlan Datta was a regular fixture there. I did not know him, but very soon, somebody introduced me to him. I think he took a liking to me, so we met often. I, merely a recent graduate from high school, and here was this very well known, and sometimes notorious, professor. We talked about politics a little bit, but then very soon I found that both of us were very much interested in literature and history and culture. So we used to discuss quite a bit of that too and we became good friends. I remember one day when I entered the Coffee House I saw Amlan *da* sitting alone in a corner reading a book on philosophy. I asked him how he could concentrate on a serious book with so much noise around. He said it did not bother him, it felt like he was reading a book on the shore of a roaring sea.

At one time he probably realized that this fellow did not know quite a bit of the things that he should know. Not about politics, but more about culture. I grew up in a lower middle-class Bengali family. My father used to buy lots of books. But in my household, there were not too many books on Western classical art or that many long-playing records of Western classical music. So Amlan *da*, I remember one day, suddenly out of the blue, proposed to me that if I had time next Sunday to come to his house around two o'clock in the afternoon. He used to live in Paikpara those days. He had lots of these big books on art with expensive plates of Western classical art. He also had a very good collection of Western classical music. So for the next several months, every Sunday, whenever he was in town, I used to go to Paikpara, spend four to five hours with him, and he used to go very patiently, discussing and explaining page after page of art plates or guiding me through the music on the records. On those Sundays from two o'clock to about six o'clock we would do this, and then we would go out, take the number two double-decker bus to College Street, go to the Coffee House, and meet other friends and then discuss politics. So this was a routine for me long before Amlan Datta became my teacher.

This was also the time when Presidency College used to organize big debates in the physics lecture theatre hall. There were these events in which Amlan Datta would debate with some stalwarts among the communist intellectuals. So with huge fanfare we used to go to the physics lecture theatre: "Today it is Amlan Datta *versus* Hiren Mukherjee." Another day, "Amlan Datta vs Jolly Kaul". Another day, "Amlan Datta *vs* Sadhan Gupta or Mohit Sen", and so on. I remember those occasions; we were very excited, as if we were going to see a football match or a chess tournament. For instance, take the day when it was Amlan Datta vs Hiren Mukherjee. Hiren Mukherjee was a very

passionate, melodramatic orator. He would give his talk, his eloquent passion sweeping us off our feet, and then Amlan *da* would rise, and essentially, with very quiet and cool precision, do what I would call, minute 'logic chopping'. In one argument after another, he would try to show the fallacies and non sequiturs in Mukherjee's speech. At the end of these debates, my communist friends used to get very angry. One of them would say, " *S****a* CIA agent, what more can you expect from him?" To this I would say, "Look, I don't care what you label him or who your brother-in-law is, but tell me what exactly is wrong with his argument?" But nobody would answer me, except to say that the whole thing was faulty, and repeated that he was an evil man, causing problems for the revolution. That, in fact, attracted me more to Amlanda. I remember one day telling him why I was fascinated by the Marxist materialistic interpretation of history. He said he respected Marx a great deal, but there were definite limits to the materialistic interpretation of history. To this day I remember the example he gave me. He said, suppose you are trying to historically explain a revolution. The materialistic interpretation will give you a lot of elements for understanding popular discontent that may have contributed to the revolution, but there is no simple materialistic interpretation of the people sacrificing their own lives for it — they clearly did not materialistically gain from it after their death.

So this went on for some time throughout the whole of my undergraduate days in Presidency College. Then at the university, I became his student. Shortly thereafter Amlan *da* persuaded me to contribute a couple of articles for the magazine he and Abu Syed Ayub used to jointly edit. I should also mention, that apart from Western classical art and classical music, he also introduced me to Chinese food, which, of course, I liked enormously; in those days in Calcutta Chinese food was still not very familiar to middle-class Bengalis.

Then, there was a big gap. I went abroad and lost touch with Amlan *da* for a long time. This was the period when, among many other things, he was, for a time, the pro-vice-chancellor of Calcutta University. I was not in Calcutta at that time, but I heard from many people and also read in newspapers that he had to go through a great deal of persecution, harassment and humiliation from leftist students during that time. Later I found out this did affect Amlanda, in terms of the lingering traces of bitterness that I noticed in him. But I also heard many stories of his personal courage and fortitude during those difficult days.

I picked up the thread with Amlan *da* much later, I think in the 1980s, when he became vice-chancellor of Visva-Bharati. As my parents were there, I used to go to Santiniketan quite regularly, even when I was abroad, so I would see him quite often in the vice-chancellor's house. After he gave up the vice-chancellor's job, for a time he used to live in Santiniketan. I remember those days in the 1980s, almost every evening there would be 'load-shedding'. I remember going to his house in the evening; his maid would finish her work and go away but before going away, she would put out a lantern in front of us. There was no fan, so sweating profusely and attacked by hordes of mosquitoes in the semi-darkness, we used to discuss big issues. It went on for quite some years, until he left Santiniketan. So these are the two phases in my life when I used to see Amlanda quite frequently: one, before he became my teacher, and one long after. All these years, he was a good friend.

India and the three ingredients of democracy

The reason I chose democracy as a subject of my lecture today, is because I wanted to go back to that book that introduced him [Amlan Datta] to me, the book titled *For Democracy*. I believe anybody who really and sincerely believes in the cause of social justice is a leftist, and in

that sense I think Amlanda was a leftist, contrary to the labelling of him by leftists. If you read his books, particularly later books, not just *For Democracy*, he comes out to me as a progressive social democrat, often arguing against crass commercialism and other problems of capitalism. I believe that my communist friends of college days, who used to dismiss 'bourgeois democracy' very cursorily, believing in the false Stalinist propaganda of 'bread versus liberty', had missed something very important. I think one of the several reasons that the Left is in decline in most parts of the world is that leftists did not seriously think through some of the valuable elements in bourgeois democracy and dismissed it too soon.With those introductory remarks, let me go now to the main theme of this piece.

Let me start with what I call the 'conceit of largest democracy'. I have often seen my Indian politician friends, diplomat friends and others, who, whenever they see some foreigners, will never lose an opportunity to tell them, with a touch of smugness, that India is the largest democracy in the world. We have actually a very weak democracy overall. I would say that there are three essential ingredients of democracy. First is the *electoral representativeness*. Many people think that democracy is just having regular elections. That is actually a very small part of a real democracy. There are many dictators in the world who run elections and sometimes get 95 per cent of the votes. More than elections, serious political competition is an essential ingredient of any democracy.

The second ingredient involves some *procedures of accountability* in day-to-day administration under some overarching constitutional rules of the game, and the third ingredient is the respect for basic human rights.

Let me discuss how India shapes up in respect of these three basic ingredients of democracy. First, let us take *elections and political competition*. Indian elections, as we all know, are vigorous, with high participation of the

poor in what can be described as a 'festival' of democracy. In fact, on election day, even the poorest person quite often dresses up in the best clothes he or she has and stands in a long queue in the scorching sun, to be able to vote. This is a festival of democracy which is really very uplifting to watch.

What about political competition? If you look at the data from the most recent national election which occurred in the summer of 2014, many people think it was an unusual election. It was more a presidential-type election, in which a strong leader was widely acclaimed, and after a long time, one party won absolute majority. But even in that national election, there was a great deal of political competition. Thirty-six political parties have at least got one seat in Parliament, the vote share of regional parties still remaining almost half and so on.

However, while competition among political parties is intense, the parties themselves are often not internally democratic. Many party leadership structures are dynastic, like in the Congress party, Mulayam Singh Yadav's party in Uttar Pradesh, Lalu Prasad's party in Bihar, Parkash Singh Badal's party in Punjab, M. Karunanidhi's party in Tamil Nadu and so on. When it's not a dynastic party, the party is often a one-person dictatorship. Whether you take Mamata Banerjee's party in West Bengal, J. Jayalalithaa's party in Tamil Nadu or Mayavati's party in Uttar Pradesh, these are parties functioning in a democracy, but they are internally one-person dictatorships.

A big barrier to competition, also, is the very expensive elections, with murky financing and no effective limits to or the proper auditing of party funds. No political party in India has accepted proper auditing of party funds. It has been estimated that Narendra Modi's party (the Bharatiya Janata Party) spent what amounted to about one billion dollars in the last national election for advertisements in print and electronic media alone. So

there is a huge barrier to political competition in India. By the way, the average wealth of elected politicians keeps rising significantly along with the large corporate donations. When corporate organizations donate, they are not doing any charity; they expect some *quid pro quo*.

Also, the proportion of elected politicians with criminal backgrounds remains substantial. In the last national election, 34 per cent of the members of parliament elected had been accused of various crimes (some of them very serious, like murder and rape). At least, there are two reasons why criminals are successful in politics. Criminals, with command over financial, and more importantly, organizational, resources have a particular advantage in electoral mobilization. The other is, when a criminal politician says. "Vote for me, I will protect you," that's credible. As a result of these criminals' involvement, quite a bit of violence is associated with elections, and in this West Bengal is one of the worst states in the whole country. In fact, a couple of years back I read in the newspaper that whenever an election is announced in West Bengal, in the cottage industry making guns located largely in the Bengal-Bihar border, the gun price goes up. That tells you something dark about our democracy.

So far as *institutions and procedures of accountability* are concerned, first, the rule of law is rather erratic in India. Many politicians and businessmen violate the spirit and the letter of the law often with impunity. There is a prevailing culture of impunity, particularly for the thugs belonging to the ruling party. Obsolete and pernicious colonial laws and penal codes are routinely abused by the authorities to suppress dissent. A country where people are arrested for raising slogans in a campus against a hanging decision of a court, or for circulating cartoons drawn satirizing a leader, is not quite democratic, however popular the elected ruling politicians may be. These assaults on democracy are continuing day after day in India.

Secondly, courts are understaffed and clogged, and occasionally corrupt, particularly at the lower levels. Police and bureaucracy are mostly subservient to the ruling party politicians, particularly on account of political manipulation of the mechanisms of transfers and promotions. Of course, there are some independent checks on the executive by the higher courts, the comptroller and auditor general, the Central Vigilance Commission, the Election Commission and others. Media are active and technically 'free', but the influence of corporate ownership, which is increasing, particularly in the electronic media, and of public and private advertisements, is substantial and potentially pernicious. (In recent weeks some parts of the electronic media have even played a role in leading lynch mobs against alleged anti-nationals.)

Thirdly, take *basic human rights*, particularly basic individual human rights. First, liberal values with respect to individual rights are not deeply embedded in Indian democracy, as we have seen in recent years. People go on electing leaders who do not even pretend to subscribe to liberal values. An atmosphere of hate, intimidation and vigilante violence has been easily fostered by some political parties. Second, and this is not often noticed, when we talk about rights, it's not often individual rights but the rights of a particular group that more easily catch the public imagination. An individual's freedom of expression (in speech, books, films, art and so on) is often violated atrociously, if there is even a remote sense that it might potentially offend some group sensibility. It was a great shame for Indian democracy when the artist, M.F. Husain, was hounded out of western India by right-wing extremists and the writer, Taslima Nasreen, from eastern India in which the Left was complicit. Hooligans and fanatics of different communities dictate what is acceptable and what is not. Of course, in remote corners of the country, whether in Kashmir, the Northeast or in

the jungles of central India, the violations of basic human rights are much more atrocious, and these continue to be overlooked by the mainstream people and media.So overall in terms of *depth*, democracy is rather shallow in India.

Having spoken about the depth of democracy in India let me now speak about the *breadth* of Indian democracy. There has been a great deal of widening of democracy in India in the last three decades - spreading out awareness and participation to hitherto subordinate social groups, backward castes, women, Dalits and adivasis, and others. Democratically elected leaders from these groups brought some measure of dignity and self-esteem to their groups after centuries of humiliation, even when some of these leaders were personally corrupt. This is the dignity I am referring to in the title of the talk ["Democracy, dignity and development"]. From this point of view, the case of Mayavati, the first Dalit chief minister of UP, to me, is extremely important. Whenever the name Mayavati comes up (less so now as she did not do well in the last election), upper caste people would of course have lots of stories: how, when Mayavati was the chief minister, she littered the countryside with giant statues of herself clutching a vanity bag. You will also hear stories about how she used to extravagantly celebrate her birthdays with a huge multi-layered, big, almost a room-sized cake. She would cut the cake and people would garland her with big, thick strings of thousand rupee notes. We are all familiar with those stories. What we do not hear as often, and this to me is extremely important, is something completely different. In UP villages, for centuries, if not more, Dalitwomen used to be regularly raped by upper caste landed people, particularly Rajputs and Thakurs. When the victim or her family went to complain to the police, the police for many decades would not even register the case; forget about bringing the perpetrators to trial. In Mayavati's regime, such rape cases were

registered by the police and at least there was a first information report. It looks a small matter but to me that's a big step in advancing dignity of the Dalits. Although Mayavati was extremely corrupt, she brought some measure of dignity to a group which has been humiliated for centuries.

However, the widening of democracy has, in some cases, affected the nature and quality of governance. It is now a common practice, for example, for a low-caste chief minister to proceed, immediately upon assuming office, to transfer away top civil servants belonging to upper castes, however qualified, and get pliant bureaucrats from his or her own caste. Some of the new social groups coming to power are even nonchalant. When stories of corruption abound, they suggest that all these years, upper classes and castes had looted the State, now it is 'our turn'. If in the process they trample upon some individual rights or some procedural aspects of democratic administration, the institutions that are supposed to kick in to restrain them are relatively weak. To me, this is part of a fundamental tension of Indian democracy, *a tension between the participatory aspects of democracy and the procedural aspects of democracy*.

Although there has been a lot of improvement in the participatory aspects of democracy, especially in terms of its widening, it has happened sometimes at the expense of the procedural aspects of democracy. Some people are not worried by this. They regard it as part of the initial, necessary turmoil of democratic movement and group self-assertion. The writer, V. S. Naipaul, who has been fascinated by the "million mutinies" in contemporary India, says: "When people start moving, the first loyalty, the first identity, is always a rather small one... When the oppressed have the power to assert themselves, they will behave badly. It will need a couple of generations of security and knowledge of institutions and the knowledge that you can trust institutions - it will take at least a couple

of generations before people in that situation begin to behave well." I wish I could share in this optimistic belief in democratic teleology. The breakdowns in democratic governance and management structures are not easy to repair and there are irreversibilities in institutional decay. Besides, in India's multi-layered social structure, by the time one self-aware group settles down, and learns to play by the institutional rules, other newly assertive groups will come up and defy those rules, often in the name of group equity. Beyond the tension mentioned, the really puzzling question of Indian democracy is this: *Why have poverty, disease and illiteracy persisted for so long in a country where the poor vote assertively in large numbers?*

Now, I do not think there is any satisfactory answer to this, but one can speculate. One reason may be that when elections come, there are many salient issues. Poverty is only one of them. Here, the dignity issue comes back again. Let me give an example. Suppose you are an upper-caste political leader and in one of your speeches, you inadvertently made a statement which could be possibly interpreted as disparaging the Dalits or low-caste people. There will be an enormous uproar and in fact if you are standing in elections, you better worry about your electoral chances if your speech can possibly be interpreted as slighting a lower caste group. That is a big change in India, and it is a welcome step. However, at the same time, suppose, you, this upper-caste leader, are very careful in your speech, so that you do not disparage anybody's dignity. But it is your policy neglect which is responsible for bad public health and sanitation as a result of which the children of these Dalits die by the thousands every year, because of contaminated drinking water and bad sanitation. However, that is not an electoral issue. Nobody in India loses an election because public sanitation is bad, because children die by the thousands in the constituency on account of avoidable waterborne diseases. That is not on the electoral agenda in India. So

here, dignity often trumps governance.

There is however a south India-north India difference here. This dignity movement, 'self-respect movement', started in south India much earlier, in the 1920s. In the beginning, dignity was the top issue. But after some time common people in south India could see that dignity is not enough. They realized they needed schools, roads, public health measures. So gradually these poor people started demanding many of the basic public services. In a way, this has not happened yet in much of north India. In Bihar, UP, Madhya Pradesh, the dignity issue is still dominant. However, I am hopeful from looking at the south Indian case; change will also come in north India when people will say 'dignity is not enough'. You have to give us clean drinking water, schools, roads, and so on. Looking at the National Election Studies data of north India, there is now some faint evidence of a turnaround in popular attention to the issues of governance when they choose politicians in their voting decision. However, the peculiar status of health issues in the electoral agenda persists. As I already mentioned, if the politician does not do anything about common public sanitation, or public health issues, nobody loses an election. There is very little demand from the electorate on public health and sanitation matters.

How democracy can help or hinder development

On the general issue of democracy and development, while many liberals believe in a positive relation between the two, increasingly with the phenomenal success of China, there are some who believe in what is now sometimes called the 'Beijing Consensus': that at early stages of industrialization, authoritarianism is helpful. Even in India we hanker after 56-inch-chested strong leaders. But a moment's reflection tells you that authoritarianism is neither necessary nor sufficient for development. It is not necessary because we know there

are countries which have developed reasonably well without authoritarianism. Forget about the rich Western countries or Japan. Take some developing countries that have done well with democracy for a long time. They did not need authoritarianism. If you start with small countries, Costa Rica in Latin America is a major success story of democratic development for a long period. Similarly, in Africa, the country of Botswana gives us a successful story of democracy and development. Among large countries, India is an example of democracy with sustained economic growth in recent decades. That authoritarianism is not sufficient is obvious from cases of stagnant authoritarian countries in Africa and Latin America. There are also examples of countries where democracy exists but where there has been not much progress in development. Thus democracy is also neither necessary nor sufficient for development.

Let me now talk about the pros and cons of the rather complex relationship between democracy and development. Let's take some pros first, namely democracy helping in development. Democracy enriches individual autonomy and freedom, participation and deliberation, which some would regard as an important part of development itself. In fact, if you read Amartya Sen's book *Development as Freedom*, there he identifies such freedom with development. So in this view democracy itself is a part of development. You may, however, look at democracy more in an instrumental way, so may want to find out, does democracy help or hinder development?

Democracy is, of course, slow, but its deliberative and electoral processes manage social conflicts better and lend some stabilizing legitimacy to policy decisions. Here, the major contrast is with China. In post-liberation China, for a long time, what helped to bring the country together was socialism. That's long gone for many decades now. I have gone to China many times and observed that 'socialism' is no longer the social glue. The glue today

that increasingly the Chinese leaders are trying to use is 'nationalism', trying to portray China as a great power and to portray the pride associated with the fast economic growth that China has achieved in the last three decades. I remember in 2008, after the big financial crisis in the world, I was in Beijing and talking to many of my Chinese friends and they were worried. I asked them why they were so worried. One of them told me that all these years, Chinese annual growth rates had been very high, often double-digit. Now, because of the global financial crisis, the growth rate was going to come down. They were worried that this was going to undermine the legitimacy of the regime, and there might be social unrest. I joked with them, saying that if in India the growth rate even falls to zero, nothing big will happen because our political regime derives legitimacy not from the growth rate, but from democratic pluralism. That is what makes us alarmed today when this democratic-pluralist idea of India - as visualized by Rabindranath Tagore, Nehru, and others, and as embodied in the Constitution - is being undermined in India. If you read newspapers, every day you can see how it is being undermined. So, in a sense, it is an assault on the basic source of political legitimacy in India.

Even when it comes to social conflicts, we are among the world's most heterogeneous countries, yet a great deal of social conflicts are handled with some degree of success through a pluralistic political culture (though there have been important exceptions). The Chinese, on the other hand, are part of a much more homogeneous country. They are mostly Han Chinese except in Tibet and Xinjiang where the Tibetans and the Uighurs are in a tense relation with the Han Chinese. The Chinese government is managing those conflicts very badly. When they regard the slightest dissent in China as sedition or as 'anti-national', they only exacerbate conflicts. This is a lesson our Hindu majoritarian ruling party needs to learn.

Narendra Modi's hollow homilies on our Constitution being a 'holy book' are not enough.

Democracy also usually avoids colossal mistakes (like those in Mao Zedong's China - the Great Leap Forward with the associated disastrous famine, the Cultural Revolution and so on). When mistakes are made, corrections and the healing process are also somewhat less difficult in a democracy.

Democracy also tends to curb the excesses of capitalism and thus render development more sustainable, for example, by encouraging social and environmental movements as watchdogs against environmental despoliation. If we just compare cases, again with China, let me give two examples. We all know that, in West Bengal and elsewhere in India, land acquisition has been a big political issue. There have been agitations, changes of government and so on. The Chinese government has been acquiring land in a much more dramatic, high-handed and arbitrary way for many decades. Although there have been localized protests, these are nothing compared to the kind of protests in India. In fact, a Chinese friend told me, in China, if the government decides to bulldoze your house, they will sometimes not even tell you. One day, you wake up in the morning - and this is in Beijing - and look at the front of your house. In the night, somebody has put a big white Chinese character on the wall, and that one character means 'raze' or 'bulldoze'. In other words, your house has been marked for being bulldozed. That is the only information you are getting; you better get out soon. Now just contrast that with the amount of political agitation that goes on against land acquisition in India. So democracy substantially curbs some of the excesses of capitalism. China is much more of a wild, frontier capitalism today than India is. Even more striking than peremptory land acquisitions are the data on coal mine fatalities or accidents. Coal mine fatalities in China are 15 times more numerous than in

India. In India, working conditions in the mines are quite bad; many accidents happen and people unnecessarily die because of a lack of safety precautions. However, this is nothing compared to the Chinese case; safety standards are routinely violated through a collusion between the local Communist Party officials and local businesses.So these are pros for democracy.

Now, let us look at the cons or the negatives of democracy from the development point of view.

Accountability processes to the general public are seriously undermined in a democracy by the influence of money, both in funding elections and in lobbying, protecting and promoting the interests of the wealthy and powerful, sometimes thus entrenching an oligarchy.

Without political centralization, political competition under democracy often encourages competitive populism or short-termism in India. To an economist, populism essentially means short-termism and absence of foresightful or long-horizon planning. For example, come election time, Indian politicians, often promise free electricity and water, which can wreck the prospects of long-term investments in them, or bank loan waivers for farmers, which can wreck the banking system. I recently read about a detailed study, of electricity distribution in Uttar Pradesh. The researcher shows that electricity theft in UP has an electoral cycle. During election years, electricity theft increases substantially through collusion among the people involved with official connivance. We also know that in many cases, for example in south India, colour televisions, mixer-grinders (this is a J. Jayalalithaa speciality) and so on are distributed by south Indian politicians and, of course, in many parts in India, free alcohol and cash are distributed before elections. Many scarce resources are thus frittered away in short-run subsidies and handouts, which hurt the cause of long-run pro-poor investments (like in roads, irrigation, drinking water and electricity).

Finally, I will discuss the issue of local democracy. I have already said that the national-level democracy in India is rather shallow in depth, but there has been a great deal of widening. But our local-level democracy is much weaker than at the national or the provincial level. By local I mean district level, block level, village level. At the district level we have *zilla parishads*, in the block level we have panchayat samitis and at the village level we have *gram panchayats*. We had constitutional amendments, the 73rd and the 74th, to promote local democracy. If you ask me, looking at India as a whole, decentralization has not yet succeeded in any significant way. Major exceptions are some municipalities and panchayats in Kerala. Take the municipal governments. The richest city in India is Mumbai, the financial capital. However, the major decisions in running the city are not taken by an elected municipal government. Not by the elected mayor. They are taken by a commissioner, a bureaucrat appointed from the state government above. So when there is so little effective local democracy in the city of Mumbai, what is there to say of villages? Quite often, these local village administrations are captured by local elites and more often by provincial political hierarchies. Even in better governed states like Tamil Nadu, political parties dominate from above the local agenda. More often than not in India, provincial-level politicians hijack that local agenda. Hence there is limited devolution of funds and functions from the provincial government and limited administrative and auditing capacity at the ground level.

This brings me back to Amlan Datta's ideas on decentralization and local cooperation. In fact, Amlan Datta started his book *For Democracy* by looking rationally at the pitfalls of Stalinism and arguing for human rights and the accountability procedures of democracy. Those of you who want to pursue the evolution of the thought process of Amlan Datta, one interesting thing to me is that here is a person who started as a rationalist follower

of M.N. Roy. As you know, there was a great deal of mutual admiration between M.N. Roy and Jawaharlal Nehru. But there was not much mutual admiration between Roy and Gandhiji. Amlan Datta, who started as a disciple of the rationalist M.N. Roy, in the latter part of his life came much nearer to Gandhi's ideas, as you can see from his later books, especially the Bengali books - I particularly remember one book, a collection of essays called *Bikalpa Samajer Sandhane* (in search of an alternative society). These are thoughtful essays about his vision, looking to the future.

Amlan Datta is not happy with the present India, not happy with capitalism, not happy with the kind of democracy that India has. He is looking for an alternative. He is going back to Rabindranath Tagore and Mahatma Gandhi, to decentralized development and rural reconstruction. In those evenings of load-shedding in Santiniketan in the 1980s, when we sat together for discussion, I spent many evenings discussing some of these local democracy issues. By that time, my thought process also had evolved since the days of my early acquaintance with Amlanda. I had lots of differences of opinion with him. However, Amlan *da* being Amlanda, he would show great respect for differences of opinion.

So we used to argue quite a lot. I often used to tell him that his ideas of decentralized development drawn from Rabindranath and Gandhi, to me, looked very utopian. In fact, if you read Tagore, he talks rather wistfully about decentralized development, rural reconstruction and cooperatives. Long before his book in Bengali titled *Russia-r Chithi*, where he discusses the examples from Soviet Russia, around the 1920s he wrote extensively on the need for cooperatives and autonomous rural development. Both Gandhi and Tagore spoke of changing values: people are selfish and greedy and have to be exhorted to be self-sacrificing and cooperative.

To an economist, this selflessness, change in ethical

values, if it can be done, is fine and encouraging. But, for a long time, we have to accept that not all people will be selfless. In such a situation, what is to be done? That is where economists propose that even in an imperfect society or an imperfect world how we can manipulate incentives and organizational imperatives to get some things done.

There are now a large number of empirical studies on these matters, what works and what does not. I myself, with a team of researchers, have been working on decentralized development in West Bengal. With another team of researchers I have tried to look at when cooperation works and when it does not in water allocation and dispute resolution among farmers. For this purpose in Tamil Nadu, we surveyed 48 irrigation communities. In West Bengal, for the last 15 to 20 years, we are going back to the same set of about 90 villages to understand these issues of decentralized development, cooperation and rural reconstruction.

We are yet very far from definitive conclusions, and I plead with the younger people to carry on this kind of research and, if possible, involve themselves in activist social work on issues, which were very much in the minds of Tagore, Gandhi, Pannalal Dasgupta (who founded the Tagore Society for Rural Development in Birbhum) and Amlan Datta.

That would be the biggest tribute we can pay to the memory of Amlan Datta, my teacher, mentor and above all, friend.

The lecture was delivered on Friday February 19, 2016, at 6PM at the Vivekananda Hall, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Kolkata 700029.

Acknowledgements: Sri Aciransu Acharya (Batch,1997- 1999) and The Telegraph, Kolkata, dated, 4, 5, and 7 April, 2016.

Our Publications:

- *Perceptions West Bengal*, 2002
- *Thinking Economics Changes in Thinking*, 2003
- *Economics: the New Space*, 2005
- *Market as Development*, 2006
- *Independence 60, Retrospect & Prospect*, 2007
- *50 Years of Kantakal: Economics Department*, 2009
- *Arthaniti Katha*, 2010
- *West Bengal Economy*, 2012
- *Ubacha* , 2013
- *Arthaniti Katha: Hundred Years*, 2017

শেষের কথা: মুখবন্ধের পরিবর্তে

জানা গেল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ শতবর্ষ পেরিয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম সাল ১৮৫৭। এখন বয়স ১৬০ বছর। বর্তমান ভারতে অনেকের কাছে সে ছিল 'আধুনিক নালন্দা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ বই, *Hundred Years of the University of Calcutta,* University of Calcutta, 1957-এর তথ্য অনুসারে, লর্ড মিন্টোর নামে প্রথম অর্থনীতির অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়, ১৯০৯ সালে। প্রথম মিন্টো প্রফেসর, অধ্যাপক মানোহার লাল। সে সময় অর্থনীতি বিভাগের পৃথক সত্তা ছিল না। ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, বাণিজ্য বিভাগ আর অর্থনীতির একত্র অবস্থান। অর্থনীতির নিজস্ব বিভাগ ঠিক কবে থেকে, এ নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। কারও মতে, তা ১৯১৪ সালে, কারও মতে সে পৃথক পথচলা, ১৯১৭ হতে। অর্থাৎ শতবর্ষ অতিক্রান্ত আমাদের এ অর্থনীতি বিভাগ। এটা নিশ্চয় আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ, এক নিজস্ব বিভাগ হয়ে, ১৯৫৮ সালে চলে আসে বর্তমানের কাঁটাকল প্রাঙ্গণে। AACUED-এর পক্ষ হতে, ২০০৮ সালে, কাঁটাকল ক্যাম্পাসের পঞ্চাশ বছর পূর্তি পালন করি। এখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শতবর্ষ উৎসব।

কাঁটাকলের অর্থনীতি বিভাগের ৫০ বছরে, আমাদের এক প্রাক্তনী লিখেছিলেন, 'পঞ্চাশে কাঁটাকল হয়নি তো বৃদ্ধ, এখনো আগের মত অতীব প্রসিদ্ধ।' শেষে লিখলেন, 'পঞ্চাশ মোটে হল, আরও কত পঞ্চাশ, কাটিয়েই কাঁটাকল গড়ে নেবে ইতিহাস'। এখন শতবর্ষ পেরিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ, নতুন নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে পথ চলবে, এমন প্রার্থনা আমাদের সকলের।

বিগত ৭ এপ্রিল ২০০২ আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম আজকের এই Alumni Association of Calcutta University Economics Department। সংক্ষেপে AACUED। আলাদা আলাদা দল না হয়ে পুরনো সব বছরের পড়ুয়াদের এক ছাদের তলায় আনার সাংগঠনিক প্রচেষ্টা। এর পর চলে গেছে পনেরো বছর। কোনও কোনও বছর আমরা এক সাথে হতে পেরেছি। কখনও কখনও তা হয়নি। তবু সকলে এক সাথে হওয়ার বাসনা, আবার দেখা পাওয়ার

ইচ্ছা। এক প্রাক্তন বলেছিলেন, 'যারা কাঁটাকলে অর্থনীতি পঠন-পাঠনে আসে, বেরিয়ে যায়, তাঁদের নিয়ে সবাই মিলে, দৃশ্য-অদৃশ্য আত্মীয় সমাজ তৈরি হয়', 'কাঁটাকলের অর্থনীতি বিভাগের সাথে যোগ আছে জানলেই মনে হয় যৌথ পরিবার। আত্মীয়ের মত যোগ আছে দেখি। পুনর্মিলন তো সত্যি আত্মীয় সমাজের সাথে মিলিত হওয়া'। আনন্দ করা। পুনর্মিলনে 'অতীত আর বর্তমান এখানে এক হয়ে যায়'।

অন্য দিকে, এখন ব্যক্তি জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে, নানা নিরানন্দের অসংখ্য উপকরণ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বৈষম্য, ভেদাভেদ রাজনীতি, জাতি দাঙ্গা, ধর্ম উন্মাদনা, পুরুষ-নারী বিরোধ, গ্রাম শহর বিভেদ, যুদ্ধ, কি না ঘটে চলেছে, অহরহ আমাদের এই ছোট্ট জীবন কালের ভিতর। বহুত্ববাদ, সহমর্মিতা, সহানুভূতির পাশাপাশি, অহরহ বহে চলেছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সংঘর্ষময়, বিষময় আচার-ব্যবহারের স্রোত। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের এলোমেলো হাওয়ায়, চিত্ত আর বিত্তের লড়াইয়ে মানবজীবনের উজ্জ্বল সমস্ত সম্ভাবনা বিষন্ন, বিমর্ষতায় মোড়া। এর সঙ্গে আবার কখনও যুক্ত হয়, আকস্মিক, অভাবনীয় কিছু প্রকৃতি বিপর্যয়। পরিবেশ পরিমণ্ডলের অস্তিত্বের ঘোর সংকট। সমস্ত ছন্নছাড়া। তবু যারা থাকেন, তাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতেই হয়, কোনও অনাগত স্বর্ণযুগের পথ চেয়ে। যদিও জানা, ভাললাগা-ভালবাসার সেই আলো, বাঁচিয়ে রাখা এক দুষ্কর কর্ম। আর সেই দুঃসাহসিক কর্মে আমাদের AACUED-এর সভ্য সভ্যারা একদিন ব্রতী হয়েছিল স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনায়। অন্য এক প্রাক্তনের কথায় এ হল 'নিজেদের কথাগুলো সবার মাঝে ছড়িয়ে দেবার আন্তরিক প্রয়াস।'

আমরা কতখানি সার্থক, আর তার চেয়ে কতখানি বেশি ব্যর্থ তা অনুভব করা, বিচার করার দায়, আমাদেরই। কিন্তু, কেবল বিচার বিশ্লেষণের ভিতর থেমে থাকলে, এ দায় হতে মুক্ত হওয়া যায় না। আগামী দিনে আমরা কতখানি ব্যর্থতা অতিক্রম করলাম, আগামী প্রজন্মের জন্য এ পৃথিবীকে কতটা বেশি 'বাসযোগ্য' করে যেতে পারলাম, সেটাই বড় কথা। এ নয় শুধু 'স্রোতে ভেসে যাওয়া'।

অতীতের এক স্মারক সংখ্যায় আমরা লিখেছিলাম, আমাদের অর্থনীতি বিভাগের ইতিহাস নিয়ে, তার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়ে, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে তেমন কোনও ভাল লিখিত তথ্য নেই। কেমব্রিজের কলেজ নিয়ে, ট্রিনিটির কলেজ রেকর্ড নিয়ে অসাধারণ কিছু তথ্যপূর্ণ বই চোখে পরে। দিল্লী স্কুলের

অর্থনীতি বিভাগ নিয়েও বই আছে। আমাদের এখনও তেমন কিছু লেখা হয়ে ওঠেনি। অনাগত কারও দিকে চেয়ে থাকা সেই অপূর্ণ কাজ পূরণের ভরসায়। আমাদের অর্থনীতি বিভাগকে অলঙ্কৃত করে, ভালবাসায় ভরিয়ে, গর্বিত করার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া চাই আমাদের সকলেরই।

বর্তমান স্মারক গ্রন্থ উৎসর্গ করলাম আমাদের সেই সব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে যাঁরা নানাভাবে আমাদের অন্তরের মানব সম্পদকে আরও সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন, আমাদের পথ চলাকে সহজ করেছেন।আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই সেই সব শিক্ষিক-শিক্ষিকা ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের যাঁরা আমাদের মধ্যে আজ আর নেই।

পুরনো দিনগুলিতে আমাদের এই স্মারক গ্রন্থ সম্পাদনায় ও প্রকাশনায় যুক্ত ছিলেন, শ্রী শুভেন্দু দাশগুপ্ত, শ্রী অরূপরতন মুখোপাধ্যায়, শ্রী রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রী ঋত্বিক মিত্র। এছাড়াও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, নানাভাবে যুক্ত ছিলেন, শ্রীমতী মহালয়া চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী সেনগুপ্ত, শ্রীমতী অর্পিতা ভট্টাচার্য, শ্রীমতী শর্মিলা ব্যানার্জী, শ্রীমতী মলি মিত্র এবং আরও অনেকেই। AACUED সংগঠনের সভাপতি ও অন্য অনেকে বিভিন্নভাবে যুক্ত ছিলেন, যেমন, শ্রী সন্তোষ দাশগুপ্ত, শ্রী অরূপ মল্লিক, শ্রী নিলয় ঘোষ ও শ্রী বাসুদেব সেন এবং বর্তমানে সভাপতি শ্রী ত্রিনাথ সিনহা। শ্রী রতন খাসনবিশ, শ্রীমতী সারা রায়, শ্রীমতী মৃত্তিকা ভট্টাচার্য, শ্রী প্রবাল দে, শ্রী ডি এন ঘোষ ও আরও অনেকেই বিভিন্নভাবে সাহায্য করে চলেন। AACUED-এর আজীবন সদস্য-সদস্যারা ও অন্য বার্ষিক মেম্বাররা অর্থ দিয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করে চলেছেন। এছাড়া, নানা ব্যস্ততার মধ্যেও, বিভিন্ন সময় অনেক প্রাক্তন-প্রাক্তনী তাঁদের গবেষণা ও উপলব্ধজাত ফসল আমাদের এই স্মারক গ্রন্থে প্রকাশ করে, এই বইয়ের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। এঁদের মধ্যে বিশেষত উল্লেখ করতে হয়— শ্রী অমিয়কুমার বাগচী, শ্রী অসীম দাশগুপ্ত, শ্রী রতন খাসনবিশ, শ্রী কল্যাণ রায়, শ্রী তরুণ সান্যাল, শ্রী আলোক রায়, শ্রী বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুগত মার্জিত, শ্রী অভিরূপ সরকার, শ্রী অচিন চক্রবর্তী, শ্রী রজত আচার্য, শ্রী দীপঙ্কর দাশগুপ্ত, শ্রী অনুপ সিনহা, শ্রী মধুসূদন ঘোষ, শ্রী সৌম্যেন্দ্র শিকদার, শ্রীমতী মধুমতি দত্ত ও এমন আরও অনেকেই। এঁদের সকলের কাছেই আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞ। অতীতে নানা সময়ে নানাভাবে অনেকেই যুক্ত ছিলেন, বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা হয়ে উঠল না। কিন্তু তাঁদের সকলের কাছেই আমরা ঋণী।

বর্তমান সংখ্যায় যারা লেখা দিলেন, যিনি প্রচ্ছদ এঁকে দিলেন, যাঁরা বইটি মুদ্রণে সাহায্য করলেন, বিশেষত শ্রী অনুপম গুপ্ত, শ্রী অমিত দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সুদক্ষিণা গুপ্ত, শ্রী অমল দাস, শ্রীমতী মৌসুমী মান্না ও শ্রীমান অনুভব দাস, এঁদের সকলেরই নাম উল্লেখ বিশেষ কর্তব্য। তাঁদের সকলের সাহায্য ছাড়া এই বই প্রকাশ পেত না। যা কিছু সার্থকতা, এঁদের সহযোগিতাকেই। তবে বর্তমান স্মারক গ্রন্থের সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির দায় কেবল মাত্র বর্তমান সম্পাদকের। অন্য কাউকে সে ভুল-ভ্রান্তির অংশীদার করা যায় না।

শেষ করার আগে আরও দু একটা কথা না বললেই চলে না। আমাদের AACUED-এর নিজস্ব বেতনভুক কর্মী নেই, এক স্থানে বসার নির্দিষ্ট জায়গা নেই। যেটুকু সফলতা তা ভালবাসা ও স্বেচ্ছাশ্রমজাত। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন, অর্থনীতি বিভাগ, আইডিএসকে, হেরম্বচন্দ্র কলেজ, বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, কৃপাভবন, আমাদের আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে, এই সব প্রতিষ্ঠানের কাছে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এছাড়াও আমাদের সভ্য— শ্রী মৃণাল দাশগুপ্ত, শ্রী উজ্জ্বল চৌধুরী তাদের আবাসনে আমাদের বৈঠকে সাহায্য করেছেন। এঁদের আলাদাভাবে ধন্যবাদ দেওয়া সৌজন্যমূলক হবে না। কারণ এঁরা আমাদেরই পরিবারভুক্ত।

লেখা শেখ করার আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এক কবিতা মনে আসছে,

‘কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যা-রবি।
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি।’(কর্তব্য গ্রহণ, *কণিকা*, ১৮৯৯)

AACUED-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, তাঁর স্বপ্নের উত্তরাধিকার খুঁজে ফিরেছেন। জানি, সে যথার্থ উত্তরাধিকারী আমি নই, তবু সাধ্যমত প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল রাখার চেষ্টা করা গেছে। এখন বাঁশি অন্য কোনও সুযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতে তুলে দেওয়ার সময়। তাতেই সার্থকতা। ভরসা রাখি আগামী সেই সুনেতৃত্বের প্রতি। আমাদের সকলের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল প্রার্থনা সেই নেতৃত্ববৃন্দের পথ চেয়ে। তাঁদের সাফল্য ও কল্যাণ কামনা করে আমার কথা শেষ করি। সকলে ভাল থাকবেন। ইতি,

উত্তম ভট্টাচার্য (১৯৭৫-৭৭), *সম্পাদক*।

রবিবার, ৯ই এপ্রিল, ২০১৭/ ২৬শে চৈত্র, ১৪২৩।
অর্থনীতি বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাঁটাকল, কলকাতা-৭০০০৫০।

From The Past Records

(Hundred Years of The University of Calcutta, 1957)

Minto Professors of Economics at the University of Calcutta.

Professor Manoharlal	1909 -1912.
Professor C. J. Hamilton	1914-1919
Professor Pramathanat Banerjee	1920-1935
Professor Jitendranath Niyogi	1935-1940

University Professor of Economics:

Professor Satischandra Ray	1926-1932
Professor Jitendranath Niyogi	1940-1947.
Professor Dwarkanath Gosh	1949
Professor Jitendranath Niyogi	1950

Distinction of University Professor, Department of Economics:

Professor Jehangir C Coyajee	1928
Professor Bijoykumar Sarkar	1949.
	(pp. 429, 433-434)

The University Act, Act No. II of 1857, was passed by the Legislative Council and received the Governor- General's assent on 24 January 1857. The preamble stated the objectives of the Act — "better encouragement of Her Majesty's subjects of all classes and denomination… in the pursuit of a regular and liberal course of education..." (p.58)

"Devaprasad Sarvadikary's two terms of office from 1914 to 1918 covered the most critical years of the post-graduate departments of the University, the University itself , the country and the world at large. On 4 August 1914, burst upon the world the First World War…

In 1914, Manu Subedar was appointed an assistant professor of Economics."(p.249-250)

Post-Graduate teaching then (in 1917) was conducted by three agencies in Calcutta *viz.*, the University, the Presidency College and te Scottish Church College... The Presidency College enjoyed affiliation in English, Mathematics, History, Political Economy and Political Philosophy(p. 225).

At the meeting of the Senate held on 17 March, 1917, Asutosh Mookerjee moved: (1) That the Senate do take into consideration the report of the post-graduate committee appointed by the Government of India. (2) That the Senate do record its approval of the two principles enunciated in paragraph 25 of the report. That two principles were fundamental.... The main purposes of the report were: (1) enunciation of the policy, (2) the creation of a suitable organization for supervision. Duplication of work was to be avoided. Specialization was to be fostered. Academic work, Asutosh maintained, should be under academic control. (p. 251).

The post-graduate department as we know it today (1924), i.e., conducting post-graduate teaching in Arts, Science, Commerce and Technology centralized in Calcutta under the control of the University was then only seven years old. It was doing valuable work for the advancement of learning (Pramathanath Banerjee, p. 320).

In the Department of Economics and Commerce Professor J. P. Niyogi published his Co-operative Movements in Bengal and a number of important papers during this period (1935-56)… Economic Reconstruction of India, by Khagendranath Sen; the State in Labour Disputes, by Satyendranath Sen… India's Five Year Plans, by Dhiresh Bhattacharya. (p. 387)

(Acknowledgement: Sri Kamalendu Dhar)

Gems from The Past Publications

সেকাল সম্বন্ধে আমার কোনও নস্টালজিয়া নেই। সেকাল স্বর্ণযুগ ছিল না। সেকালের অর্থনীতি বিভাগের তুলনায় এ কালের অর্থনীতি বিভাগ নিঃসন্দেহে নানা বিষয়ে উন্নততর। শুধু অর্থনীতি নয়, দেশে অর্থনৈতিক অবস্থারও নানা পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটেছে। কিন্তু সেকালে দল-মত নির্বিশেষে আমাদের মনে ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতবর্ষের যে স্বপ্ন-রূপ ছিল সে স্বপ্ন নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের মধ্যে আজ যাঁরা জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত (নিজ গুণে বা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায়) তাঁরাও নিশ্চয় (অন্তত মনে মনে) এ কথা স্বীকার করবেন। ব্যাপক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে, আমরা সবাই পরাজিত। যে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আমরা ব্যর্থ হয়েছি সেই চ্যালেঞ্জের বোঝা আরও জটিল হয়ে, আরও ভারী হয়ে এ কালের কচি-কাঁচার বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অর্থনীতি এখন অনেক sophisticated হয়েছে। কিন্তু সেই পুরনো অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধানের পথ এখনও দূর অস্ত।

অজিত সেনগুপ্ত

অর্থনীতি বিভাগে সেকাল ও একাল, পুনর্মিলন, ১৯৭৭

আমি অর্থশাস্ত্রকে কোনও দিনই বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলে ভাবতে পারিনি। বিশুদ্ধ বিজ্ঞানধর্মী একটি কাজের উদাহরণ দিলেই আমার অস্বস্তির কারণ স্পষ্ট হবে। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হল Gerard Debreu-এর Theory of Value। General equilibrium theory-র ওপর এত elegant বই আর কেউ লিখে উঠতে পারেননি। কিন্তু বইটির মূলে যে assumption-গুলো আছে সেগুলো শুধু অবিশ্বাস্য নয়, সেগুলোকে আক্ষরিক অর্থে ব্যাখ্যা করতে গেলে মানবতার পক্ষে বিপজ্জনকও বটে। এই model-এর স্থিতাবস্থা পেতে গেলে সমস্ত ভবিষ্যৎ economic agent-দের জানা আছে এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরতে হবে। যে অনিশ্চয়তা আছে তা হল actuarial অনিশ্চয়তা, যাকে ভিত্তি করে অনিশ্চয়তা রোধ করতে ইনসিওরেন্স করা যায়। তাছাড়া এই model অনুসারে কেউ যদি সমস্ত ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে নিজেকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে চায়, তাকে সেই স্বেচ্ছাদাসত্বের 'স্বাধীনতা' এবং তার উল্টো পিঠে তার মালিককে দাসক্রয়ের 'স্বাধীনতা' দিতে হবে।...

শুধু তত্ত্ব দিয়ে সমাজবিজ্ঞান হয় না। গ্রামের ও শহরের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, পিচঢালা রাস্তায় ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গরমে রিকশাওয়ালার রিকশা টানার প্রাণনাশী প্রচেষ্টার পাশাপাশি কি করে এই দেশে তিন কোটি টাকা দামের মোটরগাড়ি কেনায় রাজনৈতিক সায় মিলতে পারে, তা হৃদয়ঙ্গম করার জন্যেও চোখ, কান, মন এবং হৃদয়কে খোলা রাখতে হবে। শুধু হৃদয়ের প্রশস্ততা কোনও যুক্তিপিনদ্ধ শাস্ত্রের চর্চার পক্ষে যথেষ্ট নয়। কিন্তু শুধু মনন দিয়ে শাস্ত্রচর্চা করতে গেলে হাজার হাজার যুদ্ধসম্ভার বানানোর বিজ্ঞানী তৈরি হবে, যারা হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপ, ভিয়েতনামে Agent Orange দিয়ে হাজার হাজার হেক্টার চাষের জমি ও অরণ্য ধ্বংসে সায় দিয়ে যাবেন, কালাহাণ্ডি ও ইথিয়োপিয়ার দুর্ভিক্ষ শুধু দুর্ভাগ্যজনক আপতিক ঘটনা বলে ভাববেন। ভারতের হতদরিদ্র চাষীমজুরের স্বেদ ও প্রাণের বিনিময়ে কি শুধু এই ধরনের হৃদয়হীন স্তাবক অর্থশাস্ত্রের চর্চা হবে?

অমিয়কুমার বাগচী

অর্থশাস্ত্র পঠনপাঠনের তিরিশ বছর, অর্থনীতি ভাবনা ভাবনায় পরিবর্তন, ২০০৩, পৃ. ৫৭. ৬০।

Often I proudly declare from the rooftop that my batch of 1957 entrants was the first to entre *Kantakal*. It was in our second year as an MA. Student, we were told to shift to the new campus (*in the year 1958-ed)*. Ours was novel experience, because no other department had a building of its own. We had our own canteen, lounge and a lawn, and besides each teacher had a room of his own. It was such a departure from the experience in the main building where the teachers had to be loud enough to be heard and had to compete with the cars moving, trams hooting, the dogs barking and a cheerful but noisy crowd on the College Street.

The ground floor of the main building was taken up by sopping establishments. In contrast, we did not know what to do with so much space in the new building. This was a luxury by the standards of Calcutta University, but little did we realize that this splendid isolation in a spacious building also isolated us from other related disciplines, an made interaction with them extremely difficult....

The leading light among the teachers in those days was Dr Satyendranath Sen. It was for him that money could be raised and the building could be constructed at Kantakal. It can be said that but for his energies there would be no Kantakal today. (From Biplab Dasgupta, 'The Early days of Kantakol', in *Perceptions West Bengal*, AACUED 2002, p. 208, 210)